সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে

(চতুর্থ খণ্ড)

নিগূঢ়ানন্দ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৩৬৮

প্রকাশক

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮ এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রিন্টার্স

১৩৮ বিধান সরণী

কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

শুভানুধ্যায়ী—

গৌরপ্রসাদ নাগকে

এই লেখকের :

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে যাঁরা অনুসন্ধান ক'রে বেড়ান তাঁরা জানেন যে, এ জগৎটাই একটা রহস্যে ভরা। সাধারণ বিচার বুদ্ধিতে, বাস্তব বিচার বুদ্ধিতে, তথাকথিত তর্কশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী কিংবা বস্তুবিজ্ঞানের নিরিখে কেউ যদি ভারতীয় অধ্যাত্ম তত্ত্বের মুল্যায়ন করতে চান তাহলে তিনি বিরাট রকমের একটা ভুল করেন, তাঁর মুল্যায়ন ওয়েস্টপেপার বক্সে ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতই। পণ্ডিত ব্যক্তিরা শাস্ত্রগ্রন্থ যতই কণ্ঠস্থ করুন না কেন, তথাকথিত ভাষ্যকারদের যত ভাষ্যই পড়ুন না কেন, যাথার্থের ঘরে যে তাঁরা শুধু শূন্যই অর্জন করেছেন, সে বিষয়ে অন্তত: বর্তমান লেখকের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। এক্ষেত্রে মূর্খও যা, পণ্ডিতের ভূমিকাও তাই। বরং মূর্খেরা ভাল, কারণ তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে লোককে বোঝাবার চেষ্টা করেন না। পণ্ডিতেরা বোঝাবার চেষ্টা ক'রে অপরকে আরও বিভ্রান্ত করেন। আবার মহাপুরুষ পণ্ডিতেরা নিজেরা সত্যের স্বরূপ অনুধাবন ক'রে যে জ্ঞান অর্জন করেছেন লিখিত আকারে প্রকাশ পেলে তাও প্রায় অর্থহীন হয়ে থাকে, কারণ উপলব্ধ সত্যের স্বরূপ পাঠক যদি বুঝতে না পারে তাহলে তাঁদের প্রতিটি শব্দ সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রীক বা হিব্রু হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মতত্ত্বের বিষয় সম্পূর্ণই অন্তর্জগতের ব্যাপার। নিজের অন্তরের অভ্যন্তর খোঁজ না করলে কোন মানুষই এর সঠিক নিশানা পাবেন না। এই জন্যই প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেছিলেন: 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেকে জান। মানুষের এই ছোট্ট দেহের বাঁধনের ভেতর যে কী এক আশ্চর্য জগৎ রয়েছে, অনন্ত অসীম রয়েছে, নিজের ভিতরে ডুব দিয়ে তা অনুসন্ধান ক'রে প্রত্যক্ষ পরিচয় না পেলে তার স্বরূপ বোঝা দুঃসাধ্য। পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা তার সামান্যতম হদিস পেয়েছেন মাত্র। সেই জন্যই Pascal বলেছিলেন,

'The heart has its reason of which reason knows nothing.' ফ্রয়েড স্বপ্ন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনের রহস্যময় নানা স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। আজকালকার শিল্পসাহিত্যে সেই রহস্যময় মানসিক স্তরের প্রভাব সুস্পষ্ট। সেই জন্যই পাঠকেরা দিশেহারা, সাধুসন্তদের গুহ্য বাক্যের মত আধুনিক শিল্পসাহিত্যও দুর্বোধ্য। আধুনিক শিল্পসাহিত্য বুঝতে গেলে যেমন শিল্পীর মনের খবর রাখতে হয় কিংবা তাঁর মনের সমগোত্র হতে হয়, ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রেও তেমনি। ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার মূল্যায়ন করতে হলে তেমনই সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মনের খবর রাখতে হবে, কিংবা তাঁদের উন্নত মনের সমগোত্রীয় হতে হবে। তবে মন বলে কথাটাই বা বলি কেন? পশ্চিমী চিন্তাবিদেরা, দার্শনিকেরা, মনের সামান্য একটু পরিচয় পেয়েই দিশেহারা। কিন্তু ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা যাঁরা করেছেন, তাঁরা মনকে কোন আমলই দেন নি। তাঁদের লক্ষ্য মন নয়, তাকে হত্যা ক'রে আত্মার স্বক্ষেত্রে চলে যাওয়া, তবেই সত্যকে জানা যাবে। সুতরাং ভারতীয় সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মনের খবর জেনে কি হবে? তাঁদের কাজ-কারবার যে মনেরও অতীত জগতের! তাঁদের অধ্যাত্ম ক্ষেত্র অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ জানতে হলে আত্মার মধ্যেই প্রবেশ করতে হবে। এবং আত্মস্বরূপ উপলব্ধিতে মন যখন কর্মক্ষমতাহীন, তখন এই মনের সাহায্যে ঋষিদের বোঝা যাবে কি ক'রে? বোঝবার একমাত্র উপায় আত্মার স্বক্ষেত্রে বিচরণ করা। এবং এই জন্যই ভারতীয় দর্শনের মুল কথা: 'আত্মানং বিদ্ধি।'

তবুও এবিষয়ে লেখবার তো চেষ্টা হয়েছে। যখনই লেখবার চেষ্টা করা হয়েছে তখনই মনের খেলা শুরু হয়েছে। যে মন নিজেই সত্যের হদিস পায়নি সে সত্যের খবর অন্তরের কাছে সে পৌঁছে দেবে কি ভাবে? সেই জন্য অধ্যাত্ম বাক্য যা লিখিত বা বক্তব্যের আকারে বাইরে আসে তাতে আত্মার রহস্যময় সংকেত এতই জটিল যে, তার অর্থ উদ্ধার করা যায় না। সেই জন্য অধ্যাত্ম সত্য জানার

একমাত্র উপায় হল অধ্যাত্ম সাধনা। তর্ক বিতর্ক নয়, নিজের অভ্যন্তরে ডুব দিয়ে তাকে অনুভব করাটাই বড় কথা।

অনেক কিছুই আমাদের কাছে শব্দের বাঁধুনিতে অত্যন্ত সহজ বলে মনে হয়। কিন্তু যদি তার যথার্থ অর্থ উদ্ধার করতে চাই তাহলেই খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। একজন বাংলার অধ্যাপক বিশেষ ক'রে শাক্তসাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। রামপ্রসাদ সেনের এই গানটির অর্থ করুন তো : 'এবার কালী তোমায় খাব।' অধ্যাপকপ্রবরের মুখে তখন কোন কথা থাকেনি। তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন কথা কয়টির শব্দার্থ তো কিছুই নয়। কিন্তু যথার্থ অর্থ তখন অতলান্ত ও অকুল সমুদ্রের মত পরিমাপহীন বিস্তৃতিতে তাঁর কাছে ভরে উঠেছে। আমি জানি যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে তন্ত্র-সাধনা করেন নি তাঁরা এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না।

অনুরূপভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলুন তো এই লাইনটির অর্থ কি : "এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে, তারই মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই" ? তিনিও এর কোন জবাব দিতে পারেন নি। কলকাতার একটি বিশেষ বিদূষী মহিলা সমিতিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলাম রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কথা : 'কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়'। এক রবীন্দ্রসাহিত্যবিশেষজ্ঞা মহিলা বলেছিলেন, 'এ হল জীবনের সীমানা অতিক্রম ক'রে মরণের জগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সংশয়ের কথা।' কিন্তু আমি বলেছিলাম, না, ব্যাপারটা অহংকারের বাঁধন অতিক্রম করার কথা। তিনি বলেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্র ভাষ্যকারদের মতে এতো মৃত্যুরই কথা!

জিজ্ঞাসা করেছিলাম : মৃত্যু জিনিসটা কি, বলুন তো ?

তিনি সম্ভবতঃ মনে মনে বলেছিলেন, দেহে প্রাণশক্তির সম্পূর্ণ কর্মহীনতা।

আরও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মৃত্যুকে মানুষ ভয় পায় কেন ?

—হারিয়ে যাবে বলে। কি হবে জানে না বলে, অজানার ভয়ে ?

—অজানার ভয় কেন ?

—আমার কি হবে না জানলে ভয় তো করবেই।

—এই আমি কে ?

—আমি।

—'আমি' মানে কে ? যে দেহটাকে আমি নিজের বলে ভাবি সেই 'আমি' তো ?

—হ্যাঁ।

বলেছিলাম : এই আমি বোধটাই অহংকার, মিথ্যে অহংয়ের ভাব। যে মন সীমিত অহংকার নিয়ে বসে আছে—সেই মানসিক মুক্তি হারাবার ভয়। এই মনের সীমানাটুকুই হল রবীন্দ্রনাথের 'দুয়ার'। সেইটুকু ছেড়ে যেতেই ভয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই দুয়ারটুকু সহজে ছেড়ে দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। তিনিই ছাড়তে পারেন যিনি আত্মার স্বরূপ জানেন। বড় বড় সাধককেও এই মনের সীমানা ছেড়ে যেতে বহুদিন সংশয়ে কাটাতে হয়। মেঘের ফাঁকে সূর্যের আলোর মত মনের ফাঁকে ফাঁকে সাধক যখন আত্মার আলো দেখতে পান, তাঁর নয়নাভিরাম রূপ অবলোকন করতে পারেন, তখনই তিনি মনের সংস্কারের বাঁধনে পিছুটান অনুভব না ক'রে আত্মার টানের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারেন। অজানা একমাত্র পরমাত্মা। সাধারণ মানুষ যে মৃত্যুর অব্যবহিত পরের অধ্যায়কে অজানা বলে চিন্তা করেন, তা মোটেও অজানা নয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি তার স্বরূপ জানতে পারেন। অবশ্য মোহান্ধ আত্মাকে এর যথার্থ চরিত্র বুঝতে অনেকদিন অপেক্ষা করতেও হতে পারে। কিন্তু দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধক নিজের মনের আলোতেই মুক্তিপূর্ব অংশের স্থূল বিদেহী অবস্থার স্বরূপ দেখতে পান। স্থূল দেহের মৃত্যু, স্থূল দেহেরই মৃত্যু, সংস্কার রূপে যে অহংকার স্বতন্ত্র সত্তা সৃষ্টি করেছে, তার মৃত্যু নয়। পরমাত্মার উপর

একটি জীবদেহে থাকে ছটি আবরণ, স্থূলকোষ, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। স্থূল দেহের মৃত্যু হলেও কর্মফল অনুযায়ী মানুষ বা জীব এই অন্যান্য কোষের যে-কোন কোষে সূক্ষ্মরূপে থাকতে পারে। পরমাত্মাতে বিলীন না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু মানে একটি দেহ থেকে মুক্তি, সকল দেহ থেকে নয়। স্বচ্ছদৃষ্টি সাধক স্থূল দেহের উপরের সূক্ষ্মদেহগুলিকেও দেখতে পান। স্থূল দেহের যেমন স্থূলভূমি মৃত্তিকা, সূক্ষ্ম দেহের জন্যও তেমনি সূক্ষ্ম ভূমি আছে। এই ভূমিগুলি সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে গঠিত।

মহিলা : সবাই সে ভূমি বা দেহখানি দেখতে পায় না কেন ?

—দেখতে না পাওয়ার কারণ দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা। খালি চোখে রোগের বীজাণু দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যেমন দেখা যায়, তেমনি স্থূল চোখের উর্ধ্বে যিনি সূক্ষ্ম চোখের অধিকারী হয়েছেন, তাঁর কাছে জীবাত্মার ছটি দেহের কোনটাই অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট নয়।

মহিলা : সেই চোখ অর্জন করা যায় কি ক'রে ?

—সাধনার দ্বারা।

—কি ধরনের সাধনা।

—অধ্যাত্ম সাধনা।

—অধ্যাত্ম সাধনার তো নানা ধারা আছে ?

—প্রত্যেকটি ধারাই এক সত্যে পৌঁছে দেয়। তবে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, সব সাধনারই মূলে রয়েছে যোগ।

—ভক্তির ধারাতেও ?

—নিশ্চয়ই ? তাইতো গীতায় বলা হয়েছে, ভক্তিযোগ। যোগ ছাড়া অধ্যাত্ম সত্য জানার অন্য কোন পথ নেই।

—আপনি তো তন্ত্র সাধনার উপর বই লিখছেন ?

—তন্ত্র সাধনাও যোগ সাধনাই। পতঞ্জলীর যোগ সাধনার ধারা থেকে এ হয় তো একটু ভিন্ন। কিন্তু মূলতঃ যোগ সাধনা।

যোগ সাধনার দ্বারা দেহের মধ্যেকার অনন্ত স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। কলা ও কৌশল হয়তো একটু পৃথক। কিন্তু ফল লাভ ও অভিজ্ঞতা একই।

—কিন্তু আপনার নানা গ্রন্থে এমন সব বর্ণনা পাই যা পতঞ্জলীর যোগশাস্ত্রের বর্ণনানুগ নয়।

—পতঞ্জলী তো প্রথম দিকের যোগশাস্ত্রকার। পরবর্তী কালে এর আরও উন্নতি ঘটেছে।

—আপনি এ সাধনার ধারার কথা জানলেন কি ক'রে?

কি ক'রে জানলাম, সেটাই তো প্রশ্ন, সেটা তো আমার কাছেও একটা বিস্ময় স্বরূপ। এবং সেই অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের কাহিনীই তো আমি 'সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে' গ্রন্থে লিখছি।

আমি যদি নিজের মনে এর হিসেব করতে বসে যাই তাহলে বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে শুধু অভিভূতই হই। এবং তখন একটিমাত্র কথাই শুধু আমার মনে হয়, অহেতুক করুণা, মহাপুরুষদের অহেতুক করুণা। সেই জন্যই দুধচটির পায়দলের পথে আমি অমন অলৌকিক সাধকের সন্ধান পেয়েছিলাম, যাঁর কথা সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে প্রথম খণ্ডে লিখেছি। সোকরিগোলির পাহাড়ে দেখা দ্বিতীয় সাধকটিও এমনই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধক, যাঁর কথা আমি বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছি। তবে আমাকে এ জগৎ সন্ধানে সবচেয়ে বেশী ব্যাকুল ক'রে তুলেছিল কালীঘাটের সেই সাধকটি, যিনি আমাকে স্পর্শ ক'রে অলৌকিক অভিজ্ঞতা দিয়েছিলেন। এঁর কথা বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছি। এদের কাউকেই খুঁজে আর কখনও পাব কিনা জানি না! তবে যেমন অযাচিত করুণাতে দেখা দিয়েছিলেন তেমনি আবার যদি কখনও আসেন তাহলে ভিন্ন কথা। তবে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে যেসব সাধক রয়েছেন তাঁরাও আমার এ পথের দিশারী। এঁদের ক্ষমতাও অলৌকিক, যেমন বালীর ননীগোপাল ভট্টাচার্য, গুপ্তিপাড়ার নিত্যানন্দ মহারাজ ও হাওড়া বাকসাড়ার

সরোজকুমার লাহিড়ী। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এঁদের সান্নিধ্যে এসে দেখতে পারেন। তবে একথাও ঠিক, একদিন দু'দিন দেখলে সাধক চেনা যায় না। সাধক চেনার জন্যও কসরৎ করতে হয়। সাধক চেনার জন্যও নিজের চোখকে তৈরি করতে হয়।

সে কথা যাক, মূলে আসা যাক। কালীঘাটের সেই সাধকটি আমাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে আসনে বসে অশ্বিনীমুদ্রা ক'রে তলপেটের মাংসপেশীকে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাতে গিয়ে অকস্মাৎ যেন আমার দেহের নিম্নাঞ্চলে একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল। দেহের নিম্নাঞ্চলের একটা বিশেষ অঞ্চলে অর্থাৎ মূলাধারে যেন আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গিরণ হয়েছিল। নাকে একটা অদ্ভুত ঘ্রাণ অনুভব করেছিলাম। পা দুটো যেন বলির পাঁঠার মত ভয়ে ভয়ে কাঁপছিল। আমার মনে হয়েছিল, শুধু আমার দেহের ঐ বিশেষ অঞ্চলটুকুই নয়, আমার চতুর্দিকের পৃথিবীও ঐ ভাবে গলে গেছে। যিনি আমাকে এই অলৌকিক ক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, মনে হয়েছিল তিনিও যেন গলে গেছেন। এর পরেই দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছিল, আমি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম।

স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, এর পরই আমি এ-পথ পরিত্যাগে প্রয়াসী হয়েছিলাম, কারণ সাধারণ বিচারে, সাধারণ দৃষ্টিতে এপথ ভয়াবহ। কিন্তু সেই উদ্বেগ সেই ভয় আমার মধ্যে তো ছিলই না বরং তারপর থেকে অদ্ভুত এক কৌতুহল বোধ করেছিলাম, কেন যেন বার বার আমার মনে হচ্ছিল দেহের মধ্যেই বিরাট এক রহস্য ঘুমিয়ে আছে। তার একটা অদ্ভুত গন্ধ। একবার যে সে গন্ধ পেয়েছে, তার আর নিষ্কৃতি নেই। হরিণ যেমন নিজের নাভির গন্ধে পাগল হয়ে ছুটে বেড়ায় তাকেও তেমনি ছুটে বেড়াতে হবে। আমিও ছুটে বেড়াচ্ছিলাম, অবশ্য বাইরে নয় নিজের মনের মধ্যেই, কারণ সাধুসন্তের খোঁজে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াবার মত আমার তখন অর্থসঙ্গতি ছিল না। নানা কারণেই

সে সময় প্রচণ্ড আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম—যে আর্থিক অসঙ্গতির সীমারেখা কাটিয়ে আজও বাইরে আসতে পারিনি। শুধুমাত্র একবার অপরিসীম দুঃসাহস ক'রে কাশ্মীর উপত্যকাতে গিয়েছিলাম।

মনের মধ্যে ছটফট করছি। মনে হয় বাইরে ছুটে যাই, দেশ বিদেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাই, খুঁজি। কিন্তু শেকলে বাঁধা হাতির মত সীমিত বৃত্তে অর্থাৎ মনের মধ্যেই চঞ্চলতা সার হয়েছে, বাইরে যেতে পারিনি। এরই মধ্যে একবার দুঃসাহস ক'রে ফেলেছিলাম কাশ্মীরে যাবার। আমার এক অধ্যাপক বন্ধু, ব্যাচেলর, সে এসে একদিন বলল, চল্, একবার কাশ্মীর ঘুরে আসি।

বললাম, টাকা নেই।

সে বলল, না থাকে পরে দিবি। আপাততঃ আমি দিয়ে দিচ্ছি।

সময়টা ছিল পুজোর আগে। সুতরাং টিকিটের সমস্যা দেখা দিল। কিন্তু আমার বন্ধুটি দমবার পাত্র নয়। এসপ্লানেড কাউণ্টারে ঘুষ দিয়ে দেরাদুন এক্সপ্রেসে সিট সংগ্রহ ক'রে ফিরল। পাঠানকোট মেলেনি তো, তাতে কি! লাকসার থেকে গাড়ি চেঞ্জ করে সে পাঠানকোট যাবে। সুযোগ পেয়ে আমিও ছাড়লাম না। যাওয়াই ঠিক করলাম। বন্ধুটির উদ্দেশ্য ছিল ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর। আমার লক্ষ্য ছিল যদি বিস্তৃত আকাশের নিচে কোথাও অকস্মাৎ কোন সাধুসন্ত পেয়ে যাই! কাশ্মীর যদিও বর্তমানে মুসলমানপ্রধান। একসময়ে তো হিন্দুসংস্কৃতিরই পাদপীঠ ছিল! তাছাড়া আজও কাশ্মীরের ক্ষীর ভবানী, মার্তণ্ড মন্দির ও অমরনাথ হিন্দুতীর্থের ঐতিহ্য বহন ক'রে চলেছে। সেখানে হয়তো ভাগ্যে থাকলে তীর্থপুণ্যপ্রয়াসী কোন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধুসন্ন্যাসীর দেখা এবং করুণা দুটোই পেতে পারি।

শেষপর্যন্ত রওনাই হলাম। পরিকল্পনা হল, হরিদ্বার যাব প্রথম। দুদিন সেখানে থাকব। আমার বন্ধুটি হরিদ্বার দেখেনি।

সে দুদিনে হরিদ্বার দেখে নেবে। তারপর লাকসার এসে দুদিন পরে পাঠানকোট ধরব। সিট রিজার্ভেশনে না পেলেও একরাত্রি না হয় কষ্ট করে দাঁড়িয়েই যাব। পৃথিবীর স্বর্গকে হাতে পেতে চলেছি, না হয় একটু গুনাগারি দিলামই।

মহালয়ার শুভলগ্নেই বেরুলাম। রাত নটা নাগাদ দুন্ এক্স-প্রেসে চাপলাম। থ্রি টায়ার বগ্‌গীতে সিট জুটেছিল। নিচের বেঞ্চ ও মাঝখানের বেঞ্চ আমার ও আমার বন্ধু জিতেনের। এটাকে আমি সৌভাগ্য বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কারণ, মাঝের বেঞ্চটা যদি আমি নেই, তাহলে আমার বন্ধুটি রাত জাগায় অপারগ হলেও, সে শুয়ে পড়লেও আমি তার শিয়রে স্বস্তিতে বসে ট্রেনের জানালার বাইরে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারব। ট্রেনের গতি আমার কাছে অর্থহীন মনে হয় যদি জানালার ধারে বসে তার দুই পাশে পশ্চাৎ পলায়মান প্রকৃতিকে দেখতে না পাই।

যাত্রা রাত্রিতে। তার উপর অন্ধকার। যদিও অন্ধকার তখন ক্রমশই তার পক্ষ গুটাতে থাকবে, তবে দু'চার দিনের মধ্যে তেমন নয়। ফলে রাত্রির গাড়িতে জানালার ধারে বসা না বসা অর্থহীন মনে হতে পারত। তবে আমার কাছে গতির মুখে জানালা হল দিন-রাত্রি উভয় অংশেই সমান। আমি সূর্যের আলোয়, চাঁদের জ্যোৎস্নায় ও অন্ধকারের আচ্ছাদনে গাড়ির জানালার ধার থেকে পৃথিবীকে সব অবস্থাতেই উপভোগ করতে পারি।

বিহার থেকেও একবার আমি একই লক্ষ্যে হরিদ্বার অভিমুখে বেরিয়েছিলাম। যাত্রা করেছিলাম কাটিহার থেকে। কাশী এসে দুদিন থেকে হরিদ্বারের গাড়ি ধরি। সেবার বেরিয়েছিলাম দিনের বেলায়। 'সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে' প্রথম পর্ব লেখার সময় বেরিয়ে-ছিলাম কলকাতা থেকেই, রাতে দুন্ এক্‌সপ্রেসে। এবারও সেই রাতের যাত্রা। সেই প্রথমবার বিহার থেকে হরিদ্বার যাত্রার স্মৃতিটুকু মনে আসতে লাগল।

পথিপার্শ্বে অপরাহ্ণের রাঙা রৌদ্রে বিহারের রুক্ষ মাটিতে

সেদিনের দৃশ্য ছিল আলাদা। সেদিন মনে কোন ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসা ছিল না। তখন চোখে ছিল রোমান্টিক স্বপ্ন। সুতরাং পথিপার্শ্বে অপরাহ্নের রাঙা রোদে বিহারের রুক্ষ মাটিকেও সেদিন অপরূপ মনে হয়েছিল। সেদিন হরিদ্বার ছিল নিতান্ত অপরিচিত। কিন্তু আজ সে পরিচয়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ। সেদিন আর এদিনের চিন্তার মধ্যে আজ অনেকটা ব্যবধান। সেদিন অজানা চিন্তার হাতছানি আমাকে রোমাঞ্চিত করেছিল। আজ অভিলষিত কোন সাধু সন্তের দেখা পাব কিনা সেই চিন্তা। দ্বিতীয়বার হরিদ্বারে বাঙালী বাবা নামে এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধকের দেখা পেয়েছিলাম। কনখলে দেখা পেয়েছিলাম নাথপন্থি এক সাধকের। তিনিও যথেষ্ট ক্ষমতাশালী। এঁরা আমার অধ্যাত্মজীবনের পিপাসাকে চঞ্চল করে তুলেছিলেন। চুধচটির পথের সেই রহস্যময় সাধু আমার জীবনের ভিতটাই যেন নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর আরও অনেকের দেখা পেয়েছি। উত্তরোত্তর অধ্যাত্মজীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং কৌতূহল দুইই বেড়েই চলেছে। কিন্তু এ কৌতূহলের কোন চরিতার্থতা লাভ করা যায়নি। সেই চরিতার্থতা যদি তৃতীয় বারের অভিযাত্রায় অর্জন করা যায় এই রকম একটা আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। মানসনেত্রে হরিদ্বারের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট স্মরণ ক'রে তাতে আমি অভিলষিত সাধু সন্তদের বসিয়ে বসিয়ে আমার অধ্যাত্ম অনুসন্ধিৎসার জবাব খুঁজছিলুম। অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করে অসংখ্য প্রশ্ন জেগে উঠেছিল আমার এবং তারই পাশে পাশে কল্পিত সাধু সন্তদের বসিয়ে আমি আমার অধ্যাত্ম প্রশ্নের জবাব পাবার চেষ্টা করছিলুম। এইভাবে কত রাত যে হয়ে গিয়েছিল কে জানে! একসময় নিদ্রার নিবিড় আকর্ষণ আর অতিক্রম না করতে পেরে শেষপর্যন্ত শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলুম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন ভোর। বাইরে অরণ্যের ছড়াছড়ি। ঢেউ খেলানো পাহাড়। পাহাড়ের খাদে গভীর অরণ্য। পাহাড়ের

দেহ শ্যামল ! হাজারিবাগের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলেছে। ছোট ছোট দু-একটা টানেলের মধ্য দিয়ে অদ্ভুত শব্দ ক'রে গাড়ি পার হয়ে গেল। আগে যদি হত, আমার মধ্যে এ-দৃশ্য স্বপ্ন সৃষ্টি করত। কিন্তু আজ যেন কেনই শুধু উদ্বেগ সৃষ্টি হতে লাগল। যে উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়েছি তা সার্থক হবে তো ? এই চিন্তাই কেন যেন আমাকে ব্যাকুল ক'রে তুলতে লালল।

কখনও কখনও পথিপার্শ্বকে অতিক্রম ক'রে আমার চিন্তা কোন্ এক নিঃসীম অনন্তের মধ্যে গিয়ে যে আছড়ে পড়তে লাগল—নিজেই তার হদিস করতে পারলুম না।

ঘুমের জড়তা তখন আর ছিল না বটে তবে নিদ্রাশেষের একটা গ্লানি দেহের মধ্যে ছিল। ভাবলাম হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে শুচি হয়ে বসাই ভাল। প্রকৃতির বিপুল অঞ্চল সামনে। এই বিপুল প্রকৃতিই একদিন আর্য-ঋষিদের চিন্তাতে মহান অধ্যাত্ম সত্যের দ্বারোদঘাটন করেছিল। শুচিশুভ্র মনের পবিত্রতা নিয়েই তাঁরা প্রাচীন ভারতের অরণ্যকে তাকিয়ে দেখেছিলেন বলেই বুঝি প্রকৃতিও অকৃপণ দানে তাঁদের অন্তর অধ্যাত্ম আলোয় ভরে দিয়েছিল। তাই জন্ম নিয়েছিল বেদের সূক্ষ্ম কল্পনা। অরণ্যের গভীরেই জন্ম হয়ে ছিল আরণ্যকের। এই অরণ্য পরিবেশেই নির্জন অবসরে নিজেকে জানতে গিয়ে আর্যঋষিরা রচনা করেছিলেন উপনিষৎ। সুতরাং শুচিশুভ্র হবার জন্য বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম।

হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এলাম অল্পকিছু পরেই। হাজারিবাগের অরণ্য তখন দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি বোধহয় একটু লেটে যাচ্ছে। কারণ যত ভোরে হাজারিবাগের উপর দিয়ে গাড়ি যাবার কথা তত ভোরে যাচ্ছে না। দুদিক ভালই দেখা যাচ্ছে। গাড়ি বোধ হয় সময়ের ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নেবার জন্য একটু বেশি রকম জোরে ছুটে চলেছে। তাই পথিপার্শ্বের দৃশ্যগুলি নয়নমুগ্ধকর হলেও একটু অবসর নিয়ে তার রূপ দেখতে পারছি না। দ্রুত চলমান সিনেমার পর্দার মত দৃশ্য দৃশ্যান্তর চোখের উপর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

তার সেই দ্রুত সঞ্চরণশীল ধাবমানতার মধ্যে কোন গম্ভীর অধ্যাত্ম-চিন্তাকে স্থাপন ক'রে তৃপ্তিকর কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

তখনও হাজারিবাগের উপরেই আছি। কোডার্মা ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে গয়ার দিকে। সাতটা নাগাদ এ-গাড়ির গয়া গিয়ে পৌঁছুবার কথা। অনেকেই সেখানে ব্রেকফাস্ট নেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আমি অপেক্ষা করছি, গয়ার, শুধু মাত্র গয়ার। মনের গোপনে একটি আকাঙ্ক্ষা আমার তখন ক্রমেই জমাট বেঁধে ঘন হয়ে উঠছে। গয়া হিন্দুদের পারলৌকিক তর্পণ ক্রিয়ার অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ মুক্তিক্ষেত্র। এখানে পিণ্ডদান করলে জীবাত্মার বন্ধন মুক্ত হয়ে ব্যক্তির সংস্কার শাশ্বত প্রশান্ত সত্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, অর্থাৎ জীবাত্মা মুক্তিলাভ করে বা মোক্ষলাভ করে। হিন্দু সাধনক্ষেত্র হিসেবে গয়ার মূল্য তাই অপরিসীম। তার পৌরাণিক কাহিনীও বিশ্বাসের প্রাচুর্যে পূর্ণ।

গয়াসুরের নামেই গয়াক্ষেত্রের নামকরণ। গয়াসুর ছিলেন বিষ্ণুর পরম ভক্ত। বিষ্ণুর করুণা লাভের জন্য দুস্তর তপস্যায় রত হয়েছিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে এই বর দিয়েছিলেন যে, তার দেহ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও যোগীপুরুষদেব চাইতেও শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্রতম হবে। ফলে তার শুদ্ধ দেহ দর্শন ক'রে পাপী তাপী সকলেই মুক্তি লাভ করতে লাগল। এতে বিষণ্ণ চিত্তে যম গিয়ে ধরলেন বিষ্ণুকে। প্রত্যেকেই যদি মুক্তিলাভ করেন তাহলে তিনি আধিপত্য রাখবেন কার উপর ?

ওদিকে স্বর্গলোকে দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধিতে দেবতারাও শঙ্কান্বিত হলেন। সুতরাং দেবতারা সকলে গিয়ে ধরলেন গয়াসুরকে, তোমার দেহ আমাদের দান কর। কিন্তু সে প্রস্তাবে গয়াসুর রাজি নন। সুতরাং দেবতারা সকলে মিলে তাকে ধরে তার বুকের উপর একটি বড় পাথর চাপা দিয়ে দিলেন। কিন্তু তবুও গয়াসুরকে কিছুতেই নিস্তেজ করা গেল না। তখন স্বয়ং ভগবান শ্রীবিষ্ণু বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ ক'রে সেই পাথরের উপর শ্রীপাদপদ্মের এক পদের ভার অর্পণ

করলেন। ভগবানের পাদস্পর্শে অসুরের দিব্যজ্ঞান হল। তিনি বিশ্বম্ভরের স্তুতি আরম্ভ করলেন। সে স্তবে তুষ্ট হয়ে ভগবান পুনরায় গয়াসুরকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। দিবজ্ঞান লাভ করে অসুর ততক্ষণ বুঝে ফেলেছে যে শরীর অনিত্য। তাই মানবের হিত কামনায় অক্ষয় কীর্তি স্থাপনের জন্য সে এই বর প্রার্থনা করল: হে প্রভো, আপনি যদি প্রকৃতই আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে এইবর প্রদান করুন যে, আমার নামানুসারে এই স্থান গয়াক্ষেত্র নামে পরিচিত হবে। যে পর্যন্ত চন্দ্র সূর্য ও পৃথিবী থাকবে সে পর্যন্ত যেন দেবগণ আমার বুকের উপর বিদ্যমান থাকেন। গয়াক্ষেত্র যেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হয়।

ভক্তবাঞ্ছা ভগবান গয়াসুরের প্রার্থনা পূরণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গয়া পরিণত হল মানুষের মুক্তিক্ষেত্র হিসেবে। আজও অগণিত হিন্দু পিতৃপুরুষের আত্মার মুক্তি কামনায় গয়াক্ষেত্রে এসে পিণ্ড দান করে থাকেন।

এই মুক্তিক্ষেত্রে গয়া থেকেই বর্তমান যুগের মহামানব যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উদ্ভব, যিনি ধর্মের গ্লানি দূর করার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—যত মত তত পথ। সর্বান্তঃকরণে যা অনুষ্ঠান করবে তা থেকেই শ্রীভগবানকে লাভ করবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃদেব ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এই গয়াতীর্থ থেকেই স্বপ্নে জানতে পারেন যে, ভগবান স্বয়ং পুত্ররূপে তাঁর গৃহে আসছেন। এই স্বপ্ন দর্শনের পরই তাঁর সহধর্মিণী গর্ভ ধারণ করেন। ফলে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন তিনিই ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সুতরাং গয়া থেকেই বর্তমান যুগের মুক্তিদাতা মহামানবের সৃষ্টি।

মানুষের মুক্তিক্ষেত্র গয়া শুধুমাত্র মানুষের সদ্গতিলাভেরই স্থান নয়, এই তীর্থক্ষেত্রের মাটিতে মানবসমাজেরও মুক্তির মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। বন্ধনমুক্তির এক বৈজ্ঞানিক সত্য এখানেই আবিষ্কার

করেছেন পূর্বভারতের এক মহান ক্ষত্রিয় সন্তান রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ।

গয়া মন্দির থেকে সাত মাইল দূরে যে স্থানে বসে তিনি মুক্তির এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন তার নাম উরুবিল্ব। এই পবিত্র স্থানে সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর জ্ঞানের মূল কথা: (১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণও আছে (৩) দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে এবং (৪) দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সত্য পথের সন্ধান জানতে হবে।

আকাঙ্ক্ষা থেকেই দুঃখ কষ্টের উৎপত্তি। আকাঙ্ক্ষার বিলোপ সাধন করলে দুঃখকষ্ট আর থাকবে না। এই আকাঙ্ক্ষা বিলোপের জন্য তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, যেমন, (১) সৎচিন্তা, (২) সৎবাক্য, (৩) সৎপ্রচেষ্টা (৪) সৎসংকল্প, (৫) সৎব্যবহার, (৬) সৎজীবন, (৭) সম্যক সমাধি ও (৮) সম্যক দৃষ্টি।

নৈরঞ্জনা নদীর ধারে উরুবিল্ব নামক স্থানে এক বৃক্ষনিম্নে বসে গৌতম বুদ্ধ মুক্তিলাভের জন্য এই যে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা শুধু আকাঙ্ক্ষার নিষ্পত্তিই নয় পরম শান্তি লাভেরও উপায়। গয়াক্ষেত্রের মত মানুষের পরম মুক্তিলাভের ক্ষেত্র বলে গৌতমবুদ্ধের এই সাধনস্থানও গয়া নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এর নাম বুদ্ধগয়া। বৃক্ষ নিম্নে সাধনায় রত হবার সময় গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম।
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু॥
অপ্রাপ্য বোধিং—বহুকল্প দুর্লভাম।
নৈবাসনৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥ অর্থাৎ

"এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হোক, ত্বক অস্থি মাংস লয় প্রাপ্ত হোক, বহু কল্পেও দুর্লভ বোধি প্রাপ্ত না হয়ে এই আসন থেকে শরীর নিপতিত হবে না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়েছিল।

মানবাত্মার মুক্তিকল্পে গৌতমবুদ্ধ পূর্ণতা লাভ করেছিলেন এই গয়াক্ষেত্রে। বুদ্ধগয়াতে পরিনির্বাণ, গয়াতে মহামুক্তি।

গৌতমবুদ্ধ ঐতিহাসিক কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তাঁর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু গয়াসুরের কাহিনীর উপাদান প্রাগৈতিহাসিক, যদিও ইতিহাসবেত্তাদের মতে এ সম্পর্কিত গল্পের অবতারণা গৌতমবুদ্ধেরও অনেক পরে, গুপ্তযুগে। গুপ্তযুগে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে নাকি ভারতে হিন্দুধর্মের পৌরাণিক কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছিল বা একটি দুর্বল উপাদান থেকে রক্তমাংসের সজীব কলেবর লাভ করেছিল। ফলে বস্তুবাদী বিশ্লেষকরা এ ধরনের কাহিনীতে বিশ্বাস করেন না। গৌতমবুদ্ধের ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে স্বীকার করলেও বিরাট সংখ্যক আধুনিক মানস তাঁর সাধনার সারসত্তা সম্পর্কে সন্দেহপরায়ণ। এসব কথা তাঁদের মতে পৃথিবীর বাস্তব সমস্যা থেকে পলায়মান মানসিকতার, এক ধরনের রোগাক্রান্ত চিন্তাপ্রসূত।

কিন্তু আধুনিক মানস কি ভাবে, বা না ভাবে, তা নিয়ে আমার চিত্তে কোন ভাবান্তর নেই। সর্পরহস্যের সূত্র খুঁজতে গিয়ে আমি সৌভাগ্যক্রমে এমন সব ভারতীয় অধ্যাত্ম পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি যে, এখন ভারতীয় হিন্দুধর্মের মধ্যে কোন কিছু অবিশ্বাস্য আছে এমন কল্পনা করতেও বাধে। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার ধারা বিজ্ঞানের নিরিখে বিচার করা সম্ভব নয়। বস্তুবিজ্ঞানের মাধ্যমে এর মূল্যায়ন করা সম্ভবও নয়। ভারতবর্ষ যে একদিন বস্তুবিজ্ঞানে উন্নতি করেনি তা নয়। বরং যথেষ্টই উন্নতি করেছিল। আর্যভট্টের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারণা, বরাহ-মিহিরের ধারণা, ব্রহ্মগুপ্তের ধারণা আজও বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবেই গৃহীত। দিল্লীর লৌহস্তম্ভের কারিগরি দক্ষতা পনের'শ বছরেও কালের নির্মম আক্রমণ উপেক্ষা ক'রে অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সিন্ধু উপত্যকার স্থাপত্য নিদর্শন থেকে দক্ষিণ ভারতের গোপুরম পর্যন্ত ভারতীয় স্থাপত্যকলা বৈজ্ঞানিক দক্ষতায়

মিশরের পিরামিডের চাইতে কম বিস্ময়কর নয়। কনাদই তো ভারতের আণবিক তত্ত্বের স্রষ্টা। সত্যের আপেক্ষিক চরিত্রের ব্যাখ্যা আইনস্টাইনের অনেক আগেই জৈনরা ক'রে গেছেন। এই ভারতই বিশ্বকে শূন্যের প্রতীক চিহ্ন দিয়েছে, দিয়েছে দশমিক চিন্তাধারা। সুতরাং বস্তুবিজ্ঞানে ভারতবর্ষ তো পিছিয়ে ছিলই না, বরং যথেষ্ট উন্নতই ছিল। তথাপি একদিন ভারতবর্ষ বস্তুচর্চা বাদ দিয়ে অন্তরচর্চায় ডুবে গেল কেন? কেন দিল্লীর লৌহস্তম্ভ নির্মাণের কারিগরি দক্ষতা পৌরাণিক কাহিনীর জগতে নেমে এল? পৌরাণিক কাহিনীগুলি যদি ভিত্তিহীন গাঁজাখুঁরি গল্পই হয়, তাহলে ভারতীয় মানসের এই অধঃপতনের কারণ কি?

বস্তুবাদীদের বিশ্বাস আগে কোনদিন হলে আমি হয়তো বিশ্বাস করতুম, কিন্তু আজ সে ধরনের চিন্তা আমার কাছে অসম্ভব। 'সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে' প্রথম খণ্ডে যে লেখক হিমালয়ে গভীর খাদে পাহাড়ে থেকে সাধককে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছে, সোকরিগোলির পাহাড়ে 'সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে' দ্বিতীয় খণ্ডে যে লেখক সাধকের দেহের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী জাগরিতা কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিকে অবলোকন করেছে, দেখেছে আরও সব আশ্চর্য সাধুসন্ত, তার পক্ষে এখন বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্যের মধ্যে ব্যবধান টানা অসম্ভব। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভিধানে যেমন 'অসম্ভব' বলে কোন শব্দ ছিল না, বর্তমান লেখকের অভিধানেও তেমনি 'অবিশ্বাস্য' নামক শব্দটি অনুপস্থিত। সুতরাং গয়া নামক শব্দ আমার মধ্যে যে ঝঙ্কার তুলেছিল—তার আবেদন অস্বীকার করা ছিল আমার সাধ্যের অতীত। গয়ার পুরাণ কাহিনীর সত্যতা আমার কাছে জলজ্যান্ত ঘটনা। গয়া যথার্থই আমার কাছে মুক্তিক্ষেত্র। এই মুক্তিক্ষেত্রে যখন দেবতাত্মারা সততই সঞ্চরণশীল তখন সেখান থেকে কি অকস্মাৎ কোন করুণার বাণী লেখকের জন্যও উচ্চারিত হতে পারে না! সেখান থেকে কি গৌতম বুদ্ধের মত কোন সাধক তাঁর দিব্য মূর্তিতে লেখকের সামনে আবির্ভূত হতে পারেন না? সর্পরহস্যের যে বিরাট রহস্যময়তা তাকে বিস্ময়াভিভূত করেছে,

দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে চলেছে, সে রহস্যের সুষ্ঠু সমাধান করতে কোন মহাপুরুষ কি গয়াক্ষেত্র থেকেই তার কাছে চলে আসতে পারেন না? এই অনন্য আকাঙ্ক্ষার তাড়নাতেই ক্রমহ্রাসমান দূরত্বে গয়ার অবশ্যম্ভাবী আবির্ভাবের দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

কিছুটা অতিরিক্ত শ্রমের গুণাগারি দিয়ে গাড়িটা শেষপর্যন্ত সময়ের ক্ষতিটুকু বোধ হয় পুষিয়েই নিয়েছিল। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের সীমানার মধ্যেই গাড়ি ইন্ করল গয়া স্টেশনে। গয়া-স্টেশনে জৌলুস কিছু নেই। এখানকার দরিদ্র অধিবাসীদের সঙ্গে চেহারায় অনেকটাই মিল আছে। সেই অনাধুনিক স্টেশনেই দেখলাম অনেক চা-পিয়াসী যাত্রী নেমে পড়েছে ব্রেকফাস্ট সংগ্রহের আশায়। আমার অকৃতদার অধ্যাপক বন্ধু জিতেন একটু ঘুম-কাতুরে লোক। রাত্রিতে শয্যা নেয় সকাল সকাল, কিন্তু ঘুম থেকে ওঠে দেরিতে দেরিতে। শয্যা নেওয়া ও শয্যা ত্যাগ করার শাশ্বত স্বাস্থ্য-বাণীর সে মূর্তিমান প্রতিবাদ। গয়া স্টেশনে ইন্ করার পূর্ব মুহূর্ত অবধি আমার পাশে শুয়ে শুয়েই তার নাক ডাকছিল। ভেবে-ছিলাম এ গর্জন আরো কিছুকাল অবধি চলবে। সেই ভেবে তার নিদ্রাক্রান্ত শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করি নি। একা এক মনে জানালা দিয়ে গয়া স্টেশনে চত্বরের দিকে আমার অভিলষিতের আকাঙ্ক্ষায় তাকিয়ে ছিলুম। কিন্তু চায়ের একটা সূক্ষ্মগন্ধের কাছে জিতেন যে যে এত দুর্বল আমি তা জানতুম না। 'চাই গরম চায়ে'-এর ঈষদুষ্ণ উত্তাপে বোধহয় তার নিদ্রার নিবিড়তা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি; হঠাৎ পাশে আমার কাঁধের উপর কার গরম নিঃশ্বাস অনুভব করতে ফিরে তাকিয়ে দেখি, জিতেন। আমি কিছু বলবার আগেই সে গলা হাঁকিয়ে উঠল, 'এই চায়ে।' কখন সে উঠে বসেছিল আমি টেরও পাইনি। আমায় বলল:—গয়া এসে গেছে! আমায় ডাকিস নি?

—তোর নিদ্রা ভঙ্গ করতে চাইনি।

হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সে বলল: আরে বাবা সাতটা

যে বেঁজে গেছে! গয়ায় চা না খেলে আরও আধঘণ্টা যে উপোষ করে কাটাতে হত—'এই চায়ে' আবার সে হাঁক দিল।

আমার দৃষ্টি তখনও চায়ের দিকে ছিল না। আমি খুঁজছিলাম আমার অভিলষিত জিনিস। প্ল্যাটফর্মে কিছু নগ্নগাত্র প্রায় উলঙ্গ সন্ন্যাসী ছিল। তাদের অনেকেরই গাড়ির প্রতি আগ্রহ নেই। দু'একজন যাদের ছিল তারা সাধারণ কামরা তাক ক'রে সেই দিকে এগিয়ে গেল। এ ধরনের সাধু-সন্ন্যাসী ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। এদের মধ্যে কোন অলৌকিক কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। সাধুর বেশ এদের কাছে ভিক্ষার একটা সহজ কৌশল মাত্র।

অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধু-সন্তদের মুখের মধ্যে একটা দীপ্তিই আলাদা। তাঁদের চোখে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। দেখলে বোঝা যায়, কিছু একটা আছে। যেমন দেখেছিলাম কনখলের নাথপন্থি সন্ন্যাসীর চোখে। তাঁর লোলচর্মের জরাজীর্ণতাকে পুষিয়ে দিয়েছিল চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি। যেন দুই চোখে দুটো সূর্য জ্বলছে, এমন ভাব। সেদিকে তাকালে ঝল্‌সে যেতে হবে এমন আশঙ্কা হয়।

কিন্তু এ-সব ভবঘুরেদের চোখে মুখে তেমন কোন আভাস নেই। অতিরিক্ত গঞ্জিকা সেবনে এদের দেহ শীর্ণ বটে তবে আত্মার কোন প্রতিফলন নেই। যাকে বলে 'আবির্ভাব' তেমনি এক আবি-ভাবের প্রত্যাশায় কাতর চোখে আমি স্টেশনের দিকে তাকিয়ে ছিলুম

এসব দিকে আমার বন্ধু জিতেনের কোন আগ্রহ নেই। তাকে বিড়ি সিগারেট চা, সুখাদ্য ইত্যাদি যেমন আকর্ষণ করে সাধুসন্ত তেমন করে না। তার মনের ক্ষুধার চাইতে দেহের ক্ষুধা অনেক বড়। অতীন্দ্রিয়ের প্রতি আমার আগ্রহকে সে বিদ্রূপ করে। সে লোকায়ত দর্শনে বিশ্বাস করে, চার্বাক তত্ত্বে বিশ্বাস করে, বস্তুগত অস্তিত্বের বাইরে আর কিছু আছে বলে মনে করে না।

আমি যতক্ষণ জানালার ফাঁকে একজন সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় কাতর হয়ে তাকিয়েছিলুম সে ততক্ষণে চা-ওয়ালার সঙ্গে

তার কথাবার্তা শেষ করে দু'কাপ চা এবং কিছু গরম সিঙাড়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল।

গাড়ির ভেতরে সেই প্রাতরাশের উপাদান সংগ্রহ ক'রে ততক্ষণে তার চোখে যেন বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠেছে। যেন পানিপথ বা কোন ওয়াটারলু জয় ক'রে ফেলেছে সে। আমার জিম্মায় চা আর গরম সিঙাড়া রেখে সে গেল বাথরুমের দিকে, চোখে মুখে একটু জলের ছিটে দিয়ে আসতে।

হাতের কাছে চায়ের গন্ধ, সিঙাড়ার গন্ধ, তবু আমি যেন পাচ্ছি না। অথচ এই গন্ধই জিতেনের নিবিড় নিদ্রা মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতেই জিতেন এসে হাজির: যাক্, সিঙাড়াটা এখনও গরমই আছে। তুই কিরে! এখনও আরম্ভ করিসনি? বলে আর অপেক্ষা না ক'রে আমার জিম্মা থেকে তার হিস্সেটুকু নিয়ে সদগতি করতে আরম্ভ ক'রে দিল। অগত্যা আমাকেও অংশ নিতে হল। কিন্তু আমার মন চায়ের ভাঁড় আর ঠোঙার সিঙাড়ায় আবদ্ধ না থেকে বার বার আকুল দৃষ্টিতে স্টেশনের প্লাটফর্মটির দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য! অজস্র লোকেরই তো আনা-গোনা চলছে, শুধু মনের মত সেই ব্যক্তিটিরই দেখা পাচ্ছি না যাঁকে দেখা মাত্রই মন বলে উঠতে পারে—'আবির্ভাব'।

চা-শেষ হল। সিঙাড়াও শেষ হল। জিতেন দামা সিগারেট ধরালো। স্টেশনে অপেক্ষমান লোকেরা ইতিমধ্যে খুঁজে খুঁজে গাড়িতে যে যার জায়গা ক'রে নিয়েছে। আর সামান্য একটু সময়। এর পরই গাড়ি ছেড়ে দেবে। আমার সত্যি বড় যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল। এখন সাধুসন্তেরা বোধহয় মুক্তির নেশায় ঘুরে বেড়ায় না—তাই গয়াতে তাঁদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। মুক্তির দূত বলতে এখানে রয়েছে শুধু পাণ্ডারাই যারা শুনেছি নিরীহ অমৃত পিয়াসী পিণ্ডদাতাদের পাকড়াও ক'রে নিয়ে গিয়ে গয়াসুরের বুকের উপর শ্রীশ্রী ভগবানের পদচিহ্নের কাছে জবাহ করে। মুক্তির দুয়ারের

চাবিকাঠি যদি এদের হাতে থাকত তাহলে আমি বরং নরকের দিকেই পা বাড়াতুম স্বর্গের দিকে কদাচ নয়। কিন্তু আমি যে স্বর্গের যথার্থ যাঁরা হদিস জানেন এমন লোককেও দেখেছি। তাইতো স্বর্গের প্রতি এমন দুর্নিবার কৌতুহল। কিন্তু স্বর্গ-পথের দিশারী তেমন ব্যক্তি কই? হয়তো তাঁরা জনারণ্যে ঘুরে বেড়ান না। গাড়ি ক'রে তাদের চলবার প্রয়োজন নেই। দরকার হলেই আকাশ-চারী হতে পারেন। সুতরাং তাদের যদি পেতে হয়……

মনের মধ্যেই চিন্তাধারার শেষটুকু টেনে আনবারও সুযোগ পেলাম না—আমার হৃৎপিণ্ড যেন অকস্মাৎ এক হাতুড়ির আঘাতে চমকে উঠল—এ কে!

হতাশ হয়ে যখন গাড়ির অভ্যন্তরে দৃষ্টি ফেরাতে যাব তখনই দেখি এক দিব্যকান্তি গেরুয়াধারী। সারা দেহ থেকে যেন জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মাথায়ও গৈরিক উষ্ণীষ। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি আমাদের কম্পার্টমেন্টের দিকেই আসছেন। আমার হৃৎপিণ্ড উন্মাদ নৃত্যে লাফাতে লাগল যেন। মনে হল, আমার আকুল প্রার্থনা পূরণ করতেই ওঁর আবির্ভাব হচ্ছে। নইলে আমাদের কম্পার্টমেন্টের দিকেই তিনি আসবেন কেন?

সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছিল একজন চেলা। তিনি আমাদের কম্পার্ট-মেন্টেই উঠলেন। আমার বার্থে সামনের দুটো সিট খালি ছিল। হয়তো হাওড়া স্টেশনের দুই নিশীথ যাত্রী পথিমধ্যেই কোথাও নেমে গেছে। এবার নব আগন্তুক এই দুই যাত্রী।

দেখলাম আমাদের কম্পার্টমেন্টের T. T. C. যথেষ্ট সমীহ ক'রে তাঁকে কম্পার্টমেন্টে উঠালেন। তিনি গুরুগম্ভীরভাবে এসে আমাদের সামনের সিটে বসলেন। চেলাটিও পাশে নিজের সিট গ্রহণ করলেন।

সাধুকে দেখে জিতেনের কি প্রতিক্রিয়া হল জানি না—সে অহেতুক আর একটি সিগারেট ধরালো। কিন্তু আমার দৃষ্টি বার বার ঘুরে ফিরে সেই সন্ন্যাসীটির মুখের উপর আছড়ে পড়তে লাগল।

নিটোল স্বাস্থ্য। গৃহী হলে বলতাম—শরীরে তেল চুইয়ে পড়ছে। কিন্তু যেহেতু তিনি সন্ন্যাসী সুতরাং একে আমি জ্যোতি বলেই ধরে নিলাম। সন্ন্যাসীপ্রবরের যেন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আশে পাশে যে আমরা ভিন্নধরনের যাত্রী আছি এটা যেন তাঁর দৃষ্টি-গোচরই হচ্ছে না। তাঁর গম্ভীর ভাবকে গৃহী হলে বলতাম অহংকারপুষ্ট। কিন্তু যেহেতু তিনি সন্ন্যাসী সেইজন্য তাঁর এ ভাবকে আমার আন্তর অবগাহন বলে মনে হল। মনে হল, নিজের ভেতরের জাগ্রত পরম সত্তার মধ্যে তিনি ডুবে আছেন, সেই জন্য বাইরের দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই।

সন্ন্যাসী গম্ভীর, কথা বলছেন না, আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম—'সাধুসন্তরা তো অন্তর্যামী হন। ইনি কি বুঝতে পারছেন না আমার মনের আকুলতার কথা? আমার অকাঙ্ক্ষার স্পন্দনে তাঁর মধ্যে কি বিন্দুমাত্রও সাড়া জাগছে না?

তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন না, কিন্তু আমি তাঁকে বার বার দেখছি। যতই দেখছি ততই মনে হচ্ছে এঁর ভেতরে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত। সেই মহাশক্তির জাগরণেই এমন দিব্যকান্তি হয়েছে সন্ন্যাসীর। সেই রহস্যময় শক্তি সম্পর্কে দুটো কথাও কি শুনতে পাব না সন্ন্যাসীপ্রবরের?

কিন্তু আমার মনের আকুল স্পন্দনের ঢেউ সন্ন্যাসীর নিঃসঙ্গ সমুদ্রসদৃশ বিরাট চিত্তে কোন সাড়া জাগাতে পারল না বোধ হয়। আমার দিকে ফিরে তাকাবার মত বিন্দুমাত্র মানসিকতা দেখালেন না তিনি।

ততক্ষণে গাড়ি চলতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। আমি হতাশ হয়ে আবার বাইরে তাকালুম। প্রকৃতি এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পটভূমির সঙ্গে ব্যবধান ক্রমশই বড় হচ্ছে। কেন যেন ধীরে ধীরে ইতিহাসের স্বাদ ফুটে উঠেছে। কিসের ইতিহাস কোন্ ইতিহাস তা জানি না—, শুধুই কেমন ইতিহাস ইতিহাস গন্ধ। সেই ইতিহাসের গন্ধে জড়িয়ে থাকা মাঠ ঘাট গাছগাছালি

বাইরে যেন দ্রুত সরে যাচ্ছে। এই পলায়মান পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কোথায় যেন একটা অনতিক্রম্য আকর্ষণ আছে।

সন্ন্যাসীপ্রবরের প্রবল উপেক্ষার আঘাত সইতে না পেরে আবার বোধহয় বাইরের হাতেই নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিচ্ছিলাম, অকস্মাৎ গাড়ির ভেতরে কান এবং দৃষ্টি দুইই ফিরে এল। হঠাৎ শুনি, সেই সন্ন্যাসীপ্রবর চেলাটির সঙ্গে কথা বলছেন। সর্পরহস্যের আকর্ষণে বিভ্রান্ত হৃদয় আমার—সর্বত্রই খুঁজে বেড়াচ্ছে তার যথার্থ উত্তর। সন্ন্যাসীর কণ্ঠ শুনে মুহূর্তের মধ্যে—সেই জন্য সেখানে মন ও চোখকে ঠেলে দিলাম—যদি আমার সর্প-জিজ্ঞাসার কোন ইঙ্গিত পাই ? কিন্তু ।

এখন face is not the index of mind. Morningও সারাদিনের অবহাওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ দেয় না। নইলে কি ভেবেছিলাম, নয়তো কি ! ভেবেছিলাম সন্ন্যাসীপ্রবর অধ্যাত্ম জগতের কোন হদিস দিচ্ছেন শিষ্যকে। কিন্তু তার বদলে একি ! শুনলাম শিষ্যটি বলছেন—'আপনার Institution-এর জন্য কতটাকা দেবেন বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ?

সন্ন্যাসী : এখনও কমিট করেননি। মনে হয় ভালই পাওয়া যাবে।

: স্বামীজী, বর্তমান হেডস্যারকে কেমন মনে হয় ?

: Bogus.

: কেন ? বেশ তো ধর্মভীরুলোক। শাস্ত্রসম্পর্কে ভাল জ্ঞান আছে।

: ধর্ম দিয়ে কি হবে ? শাস্ত্র দিয়ে কি হবে ? আমার চাই কড়া abministration, ফিজিকস, কেমিস্ট্রি।

চমকে উঠলাম, সান্ন্যাসীর মুখে একি কথা !

শিষ্যটি বলল, স্বামী প্রেমানন্দজী ওকে বেশ একটু ইয়ে···

সন্ন্যাসী : নামেই প্রেমানন্দ, লোকটা যে কি বুঝতে পারি না।

: আর একদিন আমাদের কুলকুণ্ডলিনী সম্পর্কে বলছিলেন।

দুই কান নিবিড় ক'রে ধরলাম ওঁদের দিকে।

সন্ন্যাসী : কুলকুণ্ডলিনী ! ব্যাটা কুলকুণ্ডলিনীর বোঝে কি ? ওতো একটা vague term. উড্‌রফ সাহেবের বই পড়ে ওর মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে।

সেকি কথা ! আমি যেন আকাশ থেকে পড়বার উপক্রম হলাম। কুলকুণ্ডলিনীকে vague term বলে, এ তাহলে কেমনতর সন্ন্যাসী ? তাহলে এঁদের এই দীপ্তি কিসের ! মদ্যাসক্ত ব্যক্তিদের দেহে Alcoholic fat একটা নকল উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে। সন্ন্যাসীপ্রবরের এ দেহের চাকচিক্য কি তাহলে ভোগাসক্ত ব্যক্তির ভোগের প্রভাবে ? শুনেছি মঠমন্দিরের স্বামীজীরা এখন খানাপিনার ব্যাপারে বেশ রাজকায় ঠাট বজায় রাখেন। অনেকের নাকি মাছ মাংস মুরগির ঠ্যাংও চলে। তাহলে কি··· ?

এতবড় আঘাত জীবনে যেন আমি আর পাইনি। তাহলে এ ব্যক্তি গেরুয়া পরেছেন কেন ? আমি স্বচক্ষে যে অলৌলিক ক্ষমতা-সম্পন্ন বহু সাধু-সন্ন্যাসী দেখেছি, আর ইনি দেখেন নি ! অধ্যাত্মতার খোলস পরে মানুষকে প্রতারণা ক'রে যাচ্ছেন এঁরা ? কুলকুণ্ডলিনী নেই, কে বললে একথা ! তাহলে সোকরিগোলির পাহাড়ে সেই নির্জন মন্দিরে আমি কি দেখেছিলাম—যে কথা আমার বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছি আমি !

যত আগ্রহভরে স্বামীজী-সন্ন্যাসীটির দিকে তাকিয়েছিলাম আমি ততোধিক ঘৃণায় তাঁর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। আবার প্রবহমান প্রকৃতির মধ্যে ডুববার চেষ্টা করলাম।

গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। দু' একটা ভাঙা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোন এক প্রাচীন জায়গায় আসছি। গাড়ির গতিও একটু কমে আসছে। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সাড়ে আটটা। গয়া থেকে বেশ দৌড়েছে গাড়িটা। এক সময় গাড়িটা থমকে দাঁড়াল। স্টেশন-প্লেটে নাম পড়ে দেখি সাসারাম। সঙ্গে সঙ্গে ছোটবেলায় পড়া ইতিহাসের একটি পাতা যেন স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল : 'শের

শাহ'। এই সাসারামের জায়গীরদারের পুত্র ছিলেন তিনি। আপন দক্ষতা ও চরিত্রবলে তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় তাঁর অবদান এক অনবদ্য উদাহরণ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। এই সাসারামেই শেরের জন্ম। এই সাসারামেই তাঁর অন্তিম শয়ন। এইখানেই রয়েছে শেরের সমাধি। তাঁর সমাধিসৌধ ভারত-ইতিহাসে স্থাপত্যকলার এক অপূর্ব নজির। স্থাপত্যকলার কলাকৌশল সম্পর্কে আমার তেমন কোন জ্ঞান নেই, তবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞদের অভিমত এই যে, এই সমাধিসৌধের শিল্পকলা নাকি শেরের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। আমার কৌতূহলী মন সেই অবধি সৌধের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

জিতেন অধ্যাপক বটে তবে রাষ্ট্রনীতির, যে রাষ্ট্রনীতি আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক স্থপতিদের কল্যাণে অন্তত আমার কাছে ঘৃণার বস্তু। রাজনৈতিক তত্ত্ব বা দর্শন শুধু একটা কথার কথা। বাস্তব ক্ষেত্রে রাজনীতি হল কতকগুলি প্রতারকের হাতে লোক ঠকানোর একটা অজুহাত মাত্র। সুতরাং সে বিষয়ে আমার তেমন কৌতূহল নেই। অপরপক্ষে রাজনীতি যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের কাছে ইতিহাস অপরিহার্য জ্ঞাতব্য বিষয় হলেও জিতেনের আবার ইতিহাস সম্পর্কে তেমন আগ্রহ নেই। কিন্তু সাসারাম ভারত-ইতিহাসে এমন একটি নাম যা মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের একটা ছায়া সবার মনেই রচনা করে রেখেছে। সুতরাং জিতেনের মনেও একটা কৌতুহল নাড়াচাড়া দিয়ে উঠেছে দেখলাম। সে বলল : আরে ! নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে !

আমি বাইরে থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললাম : শেরশাহ।

জিতেন বলল : হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানেই কোথাও···

জিতেনের মনের মধ্যে স্মৃতির সূত্র ধরে সে ছবিটা যখন উঁকি দিয়েছে, আমি ততক্ষণ সেই জিনিসটাই খুঁজছি—শেরের সমাধি। সেকেন্দ্রা যেমন আকবরের অস্থি ধারণ ক'রে আছে, সাসারামও তেমনি রয়েছে শেরের অস্থি ধারণ ক'রে।

সাসারাম স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল দু'এক মিনিট মাত্র। তারপর

আবার চলতে আরম্ভ ক'রে দিল। স্টেশন ছেড়ে গাড়ি বাইরে বেরুতেই শেরের সমাধির গম্বুজ নজরে পড়ল। তারপর সবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল। জিতেন বলল, ঐ সেই—

বললাম, হ্যাঁ, শেরের সমাধি।

কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে যে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখব তা হল না। গাড়ির গতির মুখে ঘূর্ণাবর্তের টানে ঘুরপাক খাওয়া জিনিসের মত শেরের সমাধি পেছনে চলে গেল।

একজন অধ্যাত্মপুরুষের মুখে শুনেছি, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই এই রকম এক ঘূর্ণাবর্তের ঘূর্ণনে ঘুরে চলেছে! যেখান থেকে উৎপত্তি হচ্ছে একটা বৃত্তাকার মণ্ডল পরিক্রমা ক'রে সৃষ্টি সেখানে এসেই লয় প্রাপ্ত হচ্ছে। তারপর এক সময় বুদ্বুদের মতন যেমন তা ফুটে উঠেছিল তেমনি আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার সংস্কারের অভিঘাতে বৃত্তাকার বিশ্বের সৃষ্টি হচ্ছে। বৃত্তাকার বলেই ভারতীয় শাস্ত্রে একে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়েছে অর্থাৎ অণ্ডাকৃতি। বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞানও সে রকমই মনে করে। সেইজন্য আইনস্টাইন ব্রহ্মাণ্ডকে বৃত্তাকার অনুমান করেছিলেন। এক নিস্তরঙ্গ স্থির থেকে উৎপত্তি, তারপর বৃত্তাকার পথে পূর্ণতার দিকে পরিক্রমা। অর্ধবৃত্ত অর্থাৎ Radius-এর শেষ প্রান্তে এসে তার তুলনামূলক স্থিরতা, অর্থাৎ বস্তুজগতের সৃষ্টি। তারপর তার ঊর্ধ্বগতি। যেমন, বস্তু থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদি। শেষপর্যন্ত যে অব্যক্ত দৈব থেকে তার উৎপত্তি সেখানেই তার লয়। সৃষ্টির এই বৃত্তাকার পরিমণ্ডল যে-শক্তির প্রভাবে হয়—তাকে বলে বৃত্তকা শক্তি। এই বৃত্তকা শক্তিই কুলকুণ্ডলিনী। কুল মানে শক্তি। বস্তুজগৎকে সে কুণ্ডলায়িত হয়ে অর্থাৎ বৃত্তাকারে ধরে রাখে বলেই তার নাম কুলকুণ্ডলিনী। সর্বত্রই এই কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজমান। তাঁর স্বরূপ জানলে মানুষের মোহমুক্তি ঘটে, আত্মজ্ঞান জন্মে। ইতিহাসের সঙ্গে কোথায় সেই বৃত্তাকার শক্তির একটা সম্পর্ক আছে বলে ইতিহাসকে আমার এত ভাল লাগে। ইতিহাসের মধ্যে সবাই যে

বস্তুজগতের গন্ধ পায়, আমি তা পাই না। ইতিহাস আমার কাছে অধ্যাত্ম-জগতের একটা সিঁড়ির মত কাজ করে।

জিতেনের কৌতূহল সাসারামে বেশিক্ষণ থাকল না। তার স্ফুলিঙ্গের মত উত্থিত কৌতূহল স্ফুলিঙ্গেরই মত ক্ষণস্থায়ী হল। যেন "স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ, উড়িয়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল এই তারই আনন্দ।"

কিন্তু আমি ইতিহাসের সূত্র ধরে মনকে বাইরের দিকে ঠেলে দিয়ে আকাশ পাতাল নানা কিছু ভাবতে লাগলাম।

গতির মধ্যে পারিপার্শ্বিকের একটা বিরাট আকর্ষণ আছে। কবিকে তা টানে, অকবিকেও। আমার কাছে তার আকর্ষণ অনস্বীকার্য। দেখছি, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি সর্বত্র শস্যের সমারোহ। কোথাও সবুজ, কোথাও ফসলের গুচ্ছ, কোথাও বা পক্ক শস্যের দানা। গাড়ি চলেছে, ঘর বাড়ি পেছনে পড়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট স্টেশন আসছে কিন্তু গাড়ি থামছে না। অবশেষে নানা ছোট স্টেশনকে অবজ্ঞা করলেও একটি ছোট স্টেশনকে গাড়িটি উপেক্ষা করল না। স্টেশনের নাম বাবুয়া রোড। প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ গাড়ি সেখানে এসে থামল। সামান্য একটু দম নেবে বোধহয়, তারপর আবার ঘণ্টা খানিকের জন্য অবিরাম দৌড়ুতে থাকবে। সেই দম নেবার জন্য বাইশ তেইশ মিনিটের বিশ্রাম এখানে।

যারা বস্তু-জগতের মানুষ তারা সবাই দেখলাম এখানে এসে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। অনেককেই দেখলাম স্টেশনের জানালার ধারে এসে দাঁড়ানো বাবুর্চিদের খাবারের অর্ডার দিচ্ছে, ভেজিটেরিয়ান, নন-ভেজিটেরিয়ান যার যেমনি। আমাদের তরফে বাস্তব জগতের এই প্রয়োজনের কাজটা জিতেনই সেরে নিল। আমি স্টেশনের দিকেই তাকিয়ে থাকলাম। রেল-স্টেশনের কেমন যেন চিরকালীন একটা আকর্ষণ আছে। এখানে দাঁড়ালেই মনের মধ্যে কেমন যেন একটা সাড়া পাই আমি। গাড়ি না চললেও এখানে যেন কেমন একটা গতি আছে।

বাবুয়া রোডে গাড়ি যতটুকু বিশ্রাম নেবার অবসর পেয়েছিল সেই সুযোগে অনেক যাত্রীকেই দেখলাম আহার-পর্ব সেরে নিল। জিতেনের পেড়াপীড়িতে আমাকেও ও কাজটুকু সেরে নিতে হল। এরপর ? জিতেন এবং অনেকেই জানি গাড়ির ঝাকুনির তালে তালে ঝিমুবে, কেউ বা পার্থিব ব্যাপারে অযথা বাক্য ব্যয় ক'রে সময় কাটাবে। গাড়িতে চলার মধ্যে যে বাইরের দিকে তাকিয়ে গতির আনন্দ উপভোগ, অনেকেই তা করবে না। কিন্তু আমার আকর্ষণ গাড়িতে চাপলে বাইরের দিকেই বেশি সুতরাং খাওয়া-দাওয়া শেষে জানালার ধারে বসে আবার আমি সেই বাইরের দিকেই তাকালুম। গাড়ির মধ্যে বসে বাইরের বিপুল বিশ্বের দিকে তাকালে সত্যিই রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনটুকু মনে পড়ে : বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

মাঠঘাট পেরিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। ঘড়ির কাঁটাও অলস হয়ে বসে নেই। সময় এগুচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি গিয়ে পৌছুবে কাশী। আবার আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করলাম। কাশী, ভারতীয় অধ্যাত্মতার একটি পরম ক্ষেত্র। বিশ্বেশ্বরের কাশী, অর্থাৎ শিবের কাশী। অধ্যাত্ম সাধনায় নাকি শিবের মূল্য অপরিসীম, একজন তন্ত্রসাধক আমাকে একবার এই কথা বলেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন ? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, এখন তা বলব না। একদিন তুমি নিজেই তা জানবে

এখনও আমি অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে শিবের এই তাৎপয বুঝতে পারিনি। তবে সেই থেকে আমার মনে কাশী এক বিশেষ মহিমায় চিহ্নিত হয়ে আছে। সামনেই কাশী, একথাটা জানার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কারণেই বোধ হয় আমার মনের মধ্যে আবার একটি সাড়া পড়ে গেল। উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় আগত কাশীর দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি।

গাড়ি এসে কাশী স্টেশনে থামল বেলা সারে এগারটায়। আমাদের বার্থের সেই স্বামীজী কাশীতে নেমে গেলেন। এই সংক্ষিপ্ত

সময়টুকুর জন্য তিনি যে কেন এসে রিজার্ভড কামরায় উঠেছিলেন বুঝতে পারলাম না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে চলতে তাঁর সঙ্কোচ বোধ হয়, এইজন্য? তা যদি হয়, তাহলে কোন অর্থেই এ গৈরিক বসন তো তাঁর অঙ্গে শোভা পায় না! গৈরিক বসন ত্যাগ ও সংযমের প্রতীক। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এক শিষ্যের কাছে আমি শুনেছিলাম যে, গৈরিক বসন পরিধান করা সব চেয়ে কঠিন কাজ। সংযমের সামান্য অভাব যাদের আছে তাদের পক্ষে গৈরিক বসন পরিধান মহাপাপ। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, যিনি গৈরিক বসন পরবেন, তাঁর কাছে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। তাঁর কাছে আরাম বলে কোন জিনিস নেই। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মসত্তায় তিনি লীন হয়ে থাকেন। কিন্তু যে স্বামীজী আমাদের কামড়ায় উঠেছিলেন, যতটুকু সময় তিনি ছিলেন, ততটুকু সময়ের মধ্যে তাঁর মুখে একবারও অধ্যাত্মজীবনের কথা শুনিনি। কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর অহংকার প্রকাশ পাচ্ছিল। একজন মিশনের স্বামাজী একবার আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁরা অধ্যাত্ম সাধনার চাইতে সমাজসেবাকে বেশী মুল্য দেন। তা যদি হয়, তা হলে স্বামীজীর মধ্যে এই ক্ষণকালের যাত্রার মধ্যে এই ধরনের আরাম উপভোগের মানসিকতা কেন? রিজার্ভড কামরায় না উঠে তিনি তো সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গেও এই পথটুকু আসতে পারতেন! ভারতবর্ষের মিশনগুলোর মধ্যে ক্যাথলিক চার্চের একটি পার্থিব সংগঠন প্রণালী কাজ করছে বোধহয়। তবে এখনও খ্রীষ্টান মিশনারীদের মধ্যে অমায়িক ব্যবহার ও নির্ভেজাল মানবসেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভারতীয় মিশনারীদের মধ্যে তার অভাব অত্যন্ত প্রকট।

মিশনের স্বামীজীরা ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার যথার্থ ধারক নন একথাই আবার মনে হলো। অধ্যাত্ম করুণার এক কণাও যদি তাঁরা পেতেন তা হলে বোধহয় ভারতীয় অধ্যাত্মতা পৃথিবীকে আজ জয় করে ফেলত। আসলে ভারতের যথার্থ অধ্যাত্ম পুরুষদের সাক্ষাৎ কদাচিৎ ভাগ্যে জোটে। তাঁরা কখন যে কি ভাবে ঘুরে বেড়ান

বোঝা দায়। কেউ বা নগ্ন গাত্রে হিমালয়ের গিরিগুহায় ধ্যান নিমিলিত নেত্রে একক ভাবে যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিচ্ছেন, কেউ বা ডাস্টবিনে নোংরা খুঁটে খাওয়া পাগল হিসাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ রয়েছেন আমাদেরই মধ্যে ফুলবাবু সেজে। এঁরা সকরুণায় সাক্ষাৎ না দিলে এঁদের দেখা পাওয়া ভার।

আমার ঠাকুর্দার মুখে এই কাশীতেই বিরাট এক অধ্যাত্ম পুরুষের গল্প শুনেছিলাম। তিনি প্রচারে প্রচারে প্রবাদপুরুষ তৈলঙ্গস্বামী হননি বটে—কিন্তু তাঁর ক্ষমতাও সেই জীবন্ত শিব অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না।

আমারই মত আমার ঠাকুরদারও ছিল সাধুসন্ত খোঁজার বাতিক। কিন্তু আমার মত কুলকুণ্ডলিনীর খোঁজেই তিনি ঘুরে বেড়াতেন কিনা জানি না, তবে তিনি ঘুরতেন। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে তিনি নাকি সুপণ্ডিত ছিলেন। বেদ বেদান্ত, ষড়দর্শন, বৌদ্ধশাস্ত্র, জৈনশাস্ত্র, নানা শাস্ত্রে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। একটু অহংকারও হয়তো ছিল। সাধুসন্ত দেখলেই তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতেন। বহু তথাকথিত ধর্মগুরু নাকি ঠাকুর্দার পাণ্ডিত্যের কাছে হার মেনেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই বিদ্যার অহংকার সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যায় এই কাশীতে এসে।

তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে একদিন বসে ছিলেন। একজন ভিখারী গোছের লোক এসে তাঁর সামনে দাঁড়ায়। ঠাকুর্দা বিরক্ত হন। তাকে হাঁকিয়ে দেবার জন্য ঝাজিয়ে উঠতে যাবেন, এমন সময় সেই ভিখারীর কথা শুনে চমকে উঠেন তিনি: তুই তো খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি, তাই নারে?

ঠাকুর্দা অবাক হয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকান।

লোকটি বলে, তুইতো অনেক জানিস, আমার এই প্রশ্নের জবাব দে তো?

ঠাকুর্দা লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

লোকটি জিজ্ঞাসা করে: রামপ্রসাদের গানের এই লাইনটির অর্থ কর দিকি: 'এবার কালী তোমায় খাব?'

ঠাকুর্দা অনেক জানেন। কিন্তু এ গানটির অর্থ কখনও ভেবে দেখেননি। তিনি বোকা বনে গেলেন। সত্যিই এ লাইনটির মাথা মুণ্ডু তাঁর কাছে কিছুই বোধগম্য নয়। তিনি চুপ করে থাকেন।

লোকটি আবার প্রশ্ন করে, তোদের রবিঠাকুরকে তো তুই খুব ভালই বুঝিস। তাঁর একটি গানেরই অর্থ কর দিকিন :—

"এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে সে শতদল পদ্ম রাজে
তারই মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই' ?

এই জ্যোতি সমুদ্র কি ? কোথায় দেখা যায় ? কিভাবে দেখা যায় ? এর মধ্যেকার শতদল পদ্মই বা কি ?

ঠাকুর্দা বেদান্ত উপনিষৎ ষড়্দর্শন সব জানেন। কাণ্ট, হেগেল, নিটশে, সোফেনহাওয়ার সব মুখে মুখে বলে দিতে পারেন। কিন্তু ঘরের কাছের এত সহজ প্রশ্নের যথার্থ অর্থ কখনও অনুধাবন ক'রে দেখেন নি। ফলে তিনি কোন জবাব দিতে পরেননি। লোকটি হো হো ক'রে হেসে উঠে, তাহলে ? তাহলে যে বড় পাণ্ডিত্যের বড়াই করিস ?

লোকটি হন্‌হন্‌, ক'রে হেঁটে চলে যায়। ঠাকুর্দা যে তাঁকে ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন, সে অবসরটুকু পান না। কিন্তু সেই দিন থেকেই ঠাকুর্দার বিদ্যার অহংকার ভেঙে যায়। তিনি বুঝতে পারেন যে, অধ্যাত্ম সত্যের সন্ধান পুঁথিপত্র ঘেঁটে পাওয়া যাবে না। এর জবাব পেতে হবে সাধনার দ্বারা। তারপরই তিনি উপযুক্ত গুরু খুঁজে পাবার জন্য ভারতবর্ষ তোলপাড় করে ঘুরতে থাকেন। অনেক সাধুসন্ত তিনি দেখেন। কিন্তু তাঁরা যথার্থ সাধু কিনা তা যাচাই করে দেখার জন্য লোকটি ঠাকুর্দাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁদের কাছে সেই প্রশ্নের জবাব পেতে চান। তিনি মনে মনে স্থির করেছিলেন যে, যিনি এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারবেন তাঁকেই তিনি গুরু বলে বরণ করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার—অনেক গেরুয়া, অনেক রক্তাম্বর, অনেক দিগম্বরই তাঁকে এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারেননি। এর ফলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। সামান্য একটা

ভিখারী গোছের লোক তাঁর জীবনের ভিত্‌টাই যেন নাড়িয়ে দিয়ে গেল !

তিনি প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। প্রশ্নকর্তা সেই লোকটি ছাড়া আর কেউ এ প্রশ্নের জবাব জানে বলে তাঁর মনে হল না। তিনি কায়মনোবাক্যে সেই লোকটিরই সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে লাগলেন, আর সহস্রবার রমাপ্রসাদ সেনের গানগুলি বিশ্লেষণ ক'রে বোঝবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অত্যন্ত সহজ কয়েকটি কথার এমন কঠিন মানে যে কি ক'রে হয় ভেবে ভেবে অবাক হলেন। ঠাকুর্দা এরপর থেকে কোন পুঁথিপত্র পড়তেন না।

হতাশ হয়ে তিনি যখন সব আশা ছেড়ে দিচ্ছিলেন তখন অদ্ভুত আর একটি লোকের দেখা পেলেন তিনি। লোকটি ফুলবাবু, অনির্বাণ ধূমপায়ী। ঠাকুর্দা এ দুয়েরই ঘোরতর বিরোধী। স্টীমারে করে গোয়ালন্দ থেকে দেশে ফেরার পথে সেই লোকটির সঙ্গে তাঁর দেখা। লোকটি ঠাকুর্দার চারপাশে ঘুর্‌ঘুর্‌ করছিল। এতে ঠাকুর্দা ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। ঠাকুর্দা একটু রূঢ়ভাষী ছিলেন। সেই রূঢ় ভাষায় লোকটিকে কিছু বলতে যাবেন এমন সময় ভদ্রলোকের কথা শুনে চমকে উঠলেন। ভদ্রলোক তাঁকে নামধরে সম্বোধন করছেন, দামোদর বাবু, সামান্য একটা প্রশ্নের এখনও কোন হদিস করতে পারলেন না ?

ঠাকুর্দা যারপরনাই অবাক হলেন। কে লোকটি ! জীবনে তাঁকে কখনও দেখেছেন বলে তো মনে হয় না ; সে তাঁর নাম জানল কি ক'রে ? আর তিনি যে তাঁর প্রশ্নের জবাবে সারা ভারত হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এ কথাই বা তিনি বুঝলেন কি ক'রে . ঠাকুর্দা এবার ভাল ক'রে লোকটিকে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, লোকটি যে ভালমন্দ আহার ক'রে দিব্যকান্তি তা নয়। তাঁর দেহে অ্যালকোহালক গ্লেজ বা সুখাদ্য ভোজনজাত দীপ্তি নেই। আসলে এ হল এক ধরনের জ্যোতি। চোখদুটি অত্যন্ত গভীর লোকটির। কাপ্তান বাবুদের মত পার্থিব কামনাবাসনাদুষ্ট

নয়। কি বলবেন ভাবতে না পেরে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

লোকটির মুখে অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। সে ধীরে ধীরে এসে ঠাকুর্দার পাশে বসল : পার্বতী একবার গণেশ ও কার্তিককে বিশ্ব পরিক্রমায় প্রতিযোগিতা করতে বলেছিলেন, জানেন তো?

ঠাকুর্দা বলেছিলেন, হ্যাঁ, এরকম একটা গল্প আছে।

—কার্তিক তো ময়ূরে ক'রে বিদ্যুৎবেগে সমগ্র বিশ্ব পরিক্রমা করতে বেরুলেন। কিন্তু গণেশ যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন। পার্বতী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গেলে না। গণেশ হাসতে হাসতে পার্বতীকে একবার পরিক্রমা ক'রে বললেন : এই তো আমার বিশ্ব পরিক্রমা হল। কার্তিক ইতিমধ্যে বিশ্ব পরিক্রমা ক'রে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে দেখে গণেশ অত্যন্ত সহজেই কাজটি সেরে ফেলেছে। আসলে ব্যাপার কি জানেন? আপনি অযথাই কার্তিকের মত শ্রম ক'রে বেড়াচ্ছেন। যা খুঁজছেন তা অত্যন্ত কাছেই আছে। এ প্রশ্নের জবাব পুঁথিপত্রে নেই, পাহাড়ে পর্বতেও নেই, রয়েছে আপনার নিজেরই ভেতর। অন্তরের দিকে তাকান, এ প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।

ঠাকুর্দার তখন চৈতন্য হয়েছে, তিনি লোকটিকে কাতর অনুরোধে ধরে পড়লেন : দয়া করে আপনি আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলুন।

লোকটি বলল : ৺কালী কে বলুন তো?

ঠাকুর্দা বললেন : আগে মনে হত জানি। এখন মনে হয় এসব কোন প্রশ্নের জবাবই আমি জানি না। দয়া ক'রে আমাকে বলুন।

লোকটি বলল : ৺কালী হলেন কুলকুণ্ডলিনী। মানুষের দেহের মধ্যে মেরুদণ্ডে অবস্থিত যে ষটচক্র আছে, সেই ষটচক্রের নিম্নস্থ চক্র মূলাধারে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে সাড়ে তিন প্যাচে জড়িয়ে থাকেন। তিনি সহস্রার থেকে অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মণ থেকে অব্যক্ত কারণে ব্যক্ত হয়ে নিচে নেমে এসেছেন। তিনিই শক্তি। মূলাধারে এসে নিষ্ক্রিয়

হয়ে রয়েছেন। তিনিই প্রকৃতি, তিনিই মায়া। তিনি বৃত্তকা-শক্তিরূপে বিশ্বকে ধারণ ক'রে আছেন, জগৎকে মায়াবদ্ধ করেছেন। সর্বত্র সবার মধ্যেই তিনি আছেন। জগতে তিনি রয়েছেন বহিঃশক্তি হিসেবে। বহিঃপ্রকাশিত সেই কুণ্ডলিনীকে হত্যা না করলে জীবের কোন মুক্তি নেই, উদ্ধার নেই। তাঁকে হত্যা করতে হলে প্রথম তাকে জাগরিত করতে হবে। বায়ুর ঘর্ষণে তাঁকে মুলাধার থেকে জাগরিত করলে সেই কুণ্ডলিনীশক্তি উর্ধ্বগামী হন। তিনি তখন একে একে ছটি চক্র ভেদ করে উর্ধ্বমুখে সহস্রারে গিয়ে লয় প্রাপ্ত হন। এই এক একটা চক্র জগতের এক একটা চেতনা। সব চেতনাই মায়া দ্বারা প্রভাবিত। এমনকি দেবতারাও। সমস্ত চক্র ভেদ ক'রে কুণ্ডলিনী যখন সহস্রারে পরম পুরুষে অর্থাৎ তাঁর নির্গুণ উৎসে গিয়ে লয় হন তখন মায়ার রাজ্যের অবসান হয়। সহস্রারের পরম পুরুষই নির্গুণ ব্রহ্মণ, পরমাত্মণ। শক্তি বা মায়া সেই পরমাত্মণে নিজের অস্তিত্ব হারান। কুণ্ডলিনীর পরমাত্মণে আত্মস্থ হওয়া মানেই তাঁকে খেয়ে ফেলা। সাধক দেহাভ্যন্তরের মুলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীকে জাগরিত ক'রে ষট্‌চক্র ভেদ ক'রে সহস্রারে নিয়ে গিয়ে পরম মুক্তি লাভ করেন। সুতরাং ৺কালীকে না খেয়ে ফেললে অর্থাৎ আত্মস্থ না করলে মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। এই জন্যই রামপ্রসাদ সেন ঐ ধরনের গান রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথও পূর্বজন্মে সাধক ছিলেন, পরম যোগী ছিলেন! জন্মান্তরে সেই যোগের সংস্কার তাঁর মধ্যে ছিল। যোগী যখন ষট্‌চক্র ভেদ করেন, তখন অনাহত চক্রে এসেই যথার্থ জ্যোতি দেখতে পান। সেই জ্যোতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে। এই জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যেই তার কেন্দ্র বিরাজমান; সাধক সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ ক'রে সেই কেন্দ্রের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ এই জ্যোতিসমুদ্রেরই কথা বলেছেন। এই জ্যোতি সমুদ্রে অবগাহন করতে পারলে সাধক পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। পরম স্নিগ্ধতাই শতদল কেন্দ্র ক্ষরিত মধু।

কিন্তু বাইরের উপদেশ আর কথায় এর স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে না। ব্যক্তিগত জীবনে এজন্য সাধনা প্রয়োজন।

ঠাকুর্দা তখন নিজের মধ্যে নেই। তিনি ভদ্রলোকের পা দুটি জড়িয়ে ধরে ডুক্‌রে উঠলেন, আমাকে করুণা করুন।

ভদ্রলোক শুধু হেসে বললেন, 'আমি আপনার গুরু নই।

ঠাকুর্দা চেপে ধরলেন, আপনিই আমার গুরু।

—না।

—কেন?

—আপনার গুরু আপনার জন্য পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে আছেন।

—তাঁকে কোথায় পাব?

ভদ্রলোক হেসে বললেন: জমিতে বীজ ফেলতে হলে কৃষকই খুঁজে খুঁজে উপযুক্ত জমি দেখে বীজ ছাড়ান। জমি কৃষকের কাছে যায় না। সুতরাং গুরুর জন্য পাগলের মত ঘুরতে হবে না। তিনিই যথাসময়ে আপনার কাছে এসে হাজির হবেন। ঘরে ফিরে যান।

শুনেছি, কিছুদিন পরেই ঠাকুর্দার গুরু নাকি আমাদের ঘরে এসেছিলেন। যথারীতি তাঁকে দীক্ষাও দিয়েছিলেন। এরপর থেকে ঠাকুর্দা নিজের মধ্যে এতটাই আত্মস্থ হয়ে গিয়েছিলেন যে, লোকের সঙ্গে আর বেশী কথাবার্তাও বলতেন না। অর্থাৎ সত্যজ্ঞান লাভ ক'রে তিনি মৌন অবলম্বন করেছিলেন। বুঝেছিলেন যে, বক্‌বকানী ফোঁস্‌ফোঁসানী সবই সত্যের তুলনায় অর্থহীন। সত্যজ্ঞান লাভ ক'রে যিনি মৌন অবলম্বন করেন শাস্ত্রে তাঁকেই মুনি বলে। ঠাকুর্দা হয়তো সেই মুনিই হয়েছিলেন।

কাশী স্টেশনে ঠাকুরর্দার সেই গল্পটি মনে পড়তে মনে হল, হরিদ্বার না গিয়ে 'এখানে নামলেই হত। আমি সেই ঠাকুর্দার উত্তরপুরুষ। কাশীতে কি কোন অলৌকিক পুরুষের সাক্ষাৎ আমার ভাগ্যেও হতে পারে না। যে প্রশ্নের জবাবের জন্য আমি আকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তার জবাব এখানেও আমার ভাগ্যে জুটে যেতে

ারে না! কিন্তু টিকিট কাটা হয়ে গেছে হরিদ্বারের, সুতরাং কাশীতে ামা চলবে না।

কিছুক্ষণ কাশী স্টেশনে দাঁড়াবার পর গাড়ি আবার ছাড়ল। একটি ীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার নিজের মন থেকে বাইরের দিকে তাকা-াম আমি। কাশী থেকে গাড়ির লক্ষ্য এবার লক্ষ্ণৌ। সারা দিনের াত্রা তার শেষ হবে লক্ষ্ণৌতে। তারপর সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ার নৈশ অভিসার। ভোরবেলা লাক্‌সার, তারপর বেলা সাতটায় :রিদ্বার!

কাশী চোখের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেছে। আমি বাইরে তাকিয়ে াছি। নিঝ্‌ঝুম দুপুর ঝরে পড়ছে মাঠের বুকে। সাময়িক এই ীক্ষরোদের খেলা এখনই কমলা রঙে ম্লান হয়ে পড়বে। কারণ রৎ থেকেই বেলা গড়াতে আরম্ভ করে, দিনের দৈর্ঘ্য ছোট হয়।

বাইরে তাকিয়ে আছি। গাড়ি ছুটে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে। ীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে যাত্রীদের নিরাপদ গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে হবে তাকে। দুধারে মাঠ সরে যাচ্ছে, দেখছি। হঠাৎ দূরে কিছুসংখ্যক প্রাচীন ইমারৎকে ঘূর্ণাবর্তে ভেসে উঠতে দেখলাম। প্রাচীন কিছু ইমারৎ যেন পাক খেয়ে খেয়ে সরে যাচ্ছে। ইতিহাসের প্রতি চিরকালই আমার বিশেষ একটা অনুরাগ। ইতিহাস বস্তুজগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত হলেও আমার কাছে তা প্রায়শই অধ্যাত্ম জীবনের সোপান হিসাবে কাজ করে। ইতিহাসের প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে আমি এমন একটা গন্ধ পাই যা আমাকে অতীন্দ্রিয় দুয়ারের হাতছানি দেয়।

ধীরে ধীরে মাঠ ঘুরপাক খাছে। গাছের আড়ালে পুরানো ইতিহাসের স্মৃতিগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটি পরিচিত ইমারৎ দেখে যেন আমি চমকে উঠলাম—একি! এ যে আতালা দেবীর মসজিদের মত মনে হচ্ছে? এই তাহলে জৌনপুর! ভারত ইতিহাসের পাতায় যে স্থান এই মসজিদের জন্য স্মৃতির প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছে! এরকম কয়েকটি বিশেষ স্থান তো ভারত-

বর্ষে আছেই—যেমন মহেন-জো-দড়োর ভগ্ন শহর, সাঁচীর স্তূপ, সারনাথ, ভারহুত, অমরাবতী, ফিরোজ কোটলার অশোকস্তম্ভ, মীনাক্ষী মন্দিরের চূড়া, কোণারকের রথচক্র ইত্যাদি। সাসারামে শেরের সমাধি, আগ্রার তাজমহল, ফতেপুরসিক্রির বুলান্দ দরওয়াজা এবং দিল্লীর লালকেল্লাও এমনিতর স্থাপত্য কীর্তির জন্যই ইতিহাসের প্রথম সারিতে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে।

আস্তে আস্তে গাড়ি এসে একটি স্টেশনে দাঁড়াল। জৌনপুর স্টেশন। স্টেশনে আধুনিকতার ছাপ। পেছনে রয়েছে তার ইতিহাস। এ ইতিহাসের বুকের উপর দিয়ে চলেও মানুষ এর খবর রাখে না। কিন্তু মনুষ্য অভিনীত অতীত রঙ্গমঞ্চ আমার মনে কিসের যেন একটা অব্যক্ত সাড়া তৈরি করে—যে সাড়া থেকে এই পৃথিবী, বিশ্বজগৎ, মানুষ, জীবজগৎ, সবারই অস্তিত্বের সার্থকতা সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন জাগে।

গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। আবার সে চলেছে। সূর্য বোধহয় কিছুটা হেলে পড়েছে পশ্চিম দিকে। ফুটে উঠেছে ম্লান রোদ্দুর। এই ম্লান রোদ্দুর আর নীরব নিশীথিনীর স্নিগ্ধ জোৎস্না দুই-ই আমার কাছে অতীন্দ্রিয় শিহরণে ভরা। দুইয়ের মধ্যেই কেমন যেন অনেক অব্যক্ত রহস্য নড়ে চড়ে উঠে আমার মধ্যে যুগ যুগান্তের নানা প্রশ্নের ঝড় তুলে। আমি যেন ব্যাখ্যাতীত কোন এক বিস্ময়ের জগতে হারিয়ে যাই।

বিকেলের ছায়া পড়েছে। গাড়ি পার হয়ে গেল ফৈজাবাদ স্টেশন। এখন বরাবর চলেছে লক্ষ্ণৌ স্টেশনের দিকে। সন্ধ্যা নাগাদ গাড়ি গিয়ে পৌছুবে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে। সেখানে দীর্ঘ বিরতি। তারপর রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে তার শেষ যাত্রা শুরু।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। অপরাহ্নের ম্লান রোদ্দুর ছায়া ছায়া হচ্ছে। এই ছায়ার আবরণের মধ্য দিয়েই গাড়ি পার হল ফৈজাবাদ স্টেশন।

সন্ধ্যা ক্রমশই গাঢ় হচ্ছে। গাড়ি এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্ণৌ স্টেশন খুব কাছে এখন। আমার মনে কোন ক্লান্তি নেই। জিতেন ইতিমধ্যে অনেকক্ষণ ঝিমিয়ে নিয়েছে। তার একঘেয়েমির ক্লান্তি অপনোদন করতে কয়েক প্যাকেট সিগারেট আত্মবলি দিয়েছে। লক্ষ্ণৌ-এর গন্ধ পেয়েই সে যেন অনেকটা সজীব হয়ে উঠল। আমায় বলল, লক্ষ্ণৌতেই রাতের খাবারটা সেরে নিতে হবে।

আমার দৃষ্টি তখন বাইরে। কোন রকমে কথাটা কানে এল। সংক্ষেপে জবার দিলুম : হুঃ।

জিতেন বলল, বাইরে বেরুলে তুই এমন চুপ মেরে যাস কেন রে?

কিছু বললুম না। জিতেন তো জানে না যে আমি মনে মনে কত কথা বলে চলেছি!

অন্ধকার নেমে এসেছে, দূরে অনেকগুলো আলোর ঝল্‌মলানি। বুঝলাম লক্ষ্ণৌ স্টেশন কাছে এগিয়ে আসছে। আলোগুলো দেখতে দেখতে বড় হয়ে জ্বলে উঠল। দূর থেকে যাকে নক্ষত্রমণ্ডলী বলে মনে হয়েছিল কাছ থেকে তাকে স্টেশনের আলো বলে ধরা গেল।

গাড়ির গতি কমতে কমতে এক সময় সে থেমে গেল। লক্ষ্ণৌ স্টেশন। ঝক্‌ঝকে তকতকে স্টেশন। ওভার ব্রীজ ছাড়িয়ে ওপারে শহর। ইউ. পির সর্বাপেক্ষা পরিস্কার শহর হয়তো। ট্রেন এখানে বেশ কিছুক্ষণ থামবে। জিতেন ক্লান্তি দূর করতে দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে। আমায় বলল, নেমে একটু পায়চারি করে নিবি নাকি?

আমি বললুম, না, তুই যা।

সে বলল, দেখি, এখানে খাবারেরও ব্যবস্থা করতে হবে। জিতেন নেমে গেল।

দেখলাম শুধু জিতেন নয় অনেকেই নেমেছে। অনেকেই পায়চারি করছে। যারা নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে পারে না —তাদের কাছে একটানা দীর্ঘ যাত্রা ক্লান্তিকর বোধ হবেই। এবং যারা কল্পনাবিলাসকে তেমন আমল দেয় না তারা বাস্তববুদ্ধি দ্বারা

পরিচালিত। এইসব বাস্তববুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিরা জানে যে, লক্ষ্ণৌতে খাবার ব্যাপারে অবজ্ঞা করলে পরে কপালে অনেক দুর্ভোগ হতে পারে। ফলে রথদেখা ও কলাবেচা তারা এক সঙ্গেই করে নিল, পায়চারিও করল, খাবারের ব্যবস্থাও করল।

সবাই যখন ব্যস্ত আমি তখন তাকিয়ে থাকলুম বাইরের দিকে এই লক্ষ্ণৌ শহরে নানা নবাবী ঘরোয়ানার কাহিনী আছে। লক্ষ্ণৌর চাঁদনী চকে নানা রোমান্টিক কাহিনী। কিন্তু আমার যেন সেসব কিছুই মনে এল না। সব কিছু ছাপিয়ে একটি করুণ রাগিণী মর্মে ধ্বনিত হতে লাগল—অতুলপ্রসাদ সেন। নানা অধ্যাত্ম করুণ সঙ্গীত তিনি এই লক্ষ্ণৌ শহরে বসেই রচনা করেছিলেন, অধ্যাত্ম-পিপাসুদের মনে যে সঙ্গীত আজও নানা অতীন্দ্রিয় ভাব সৃষ্টি করে এখানেই তাঁর সেই বিখ্যাত গান রচিত হয়েছিল :

করি তুই আপন আপন
হারালো যা ছিল আপন,
এবার তোর ভরা আপন বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।"

সেই আপন বোধ, অহংবোধ নষ্ট করার জন্যই মানুষের অধ্যাত্ম সাধনা। যে সাধনার সামান্য একটা ইঙ্গিত আমার ঠাকুর্দাকে উন্মাদ করে তুলেছিল, আমাকেও বিভ্রান্ত করেছে, যে জন্যে বাইরে বেরিয়েছি আমি, আবার যদি তেমন কোন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই—যেমন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম একবার দুধচটির পথে, সোকরি-গোলির পাহাড়ে ও কালীঘাটের মন্দির চত্বরে। জানি না আমার উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা।

জিতেনের পেড়াপীড়িতে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করেছি। নইলে আমি হয়তো প্রেফার করতাম হরিদ্বার বা কাশী। কাশ্মীরে আমার অভিলষিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাবার সম্ভাবনা কম। কাশ্মীর তো ত্যাগের জায়গা নয়, ভোগের, তবু এখানেই তো আছে ক্ষীর-ভবানী, অমরনাথ, মানুষের আত্মমুক্তির পরম ক্ষেত্র। ভাগ্যে থাকলে এখানেও কি জুটে যেতে পারে না তেমন কোন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ!

প্রায় পঁচিশ মিনিটের মত গাড়ি দাঁড়াল লক্ষ্ণৌ স্টেশনে। তারপর আবার চলতে আরম্ভ করে দিল। ইতিমধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ। আগত রাত্রির জন্য সবাই প্রস্তুত। সামান্য দু'একজনের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল। আমাদের সামনের সিটে কাশী থেকে দু'জন যাত্রী উঠেছিল, কোথায় নামবে কে জানে! কিছুক্ষণ পরেই দেখি ওদের তিনটি বাঙ্কে শয্যা পড়তে লাগল।

আমি জানালার ধারে বসে আছি। জিতেনের দু'একটা প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছি। তাতে বোধহয় ওর একঘেয়েমি কাটছে না। আরো দু'এক প্যাকেট সিগারেট শেষ করে ও হাই তুলল: মা, এবার আমি শুয়ে পড়ব। নিচের যে সিটে বসে আছি সেখানেই তার বিছানা পড়বে। পাশে আর যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তিনি সর্বোপরি বাঙ্কে ইতিমধ্যে তাঁর বিছানা বিছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছেন। জিতেনকে তার বিছানা পাততে বললাম। তার শিয়রের কাছে কিছু স্থান আরও কিছুক্ষণ আমার অধিকারে থাকবে সে জানে। সেখানে বসে আরও কিছুকাল আমি জানালার ফাঁকে বাইরে তাকিয়ে থাকব। সুতরাং সেই অনুপাতেই সে বিছানা বিছিয়ে নিল। শেষবারের মত আর একটা সিগারেট টেনে সে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিল। একা বসে রইলাম আমি। জানালার বাইরে বিপুল অন্ধকার। সেইদিকে দৃষ্টি মেলে আমি তাকিয়ে রইলাম। গাড়ির ঝক্‌ঝক্ শব্দ হচ্ছে। যেন নৈশব্দ্যের মধ্যে গাড়ির হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে।

আমরা এগিয়ে চলেছি হরিদ্বারের দিকে। এই অঞ্চলেই আমার জীবনে আধ্যাত্ম ক্ষেত্রে পরম কৌতূহল জাগরিত হয়েছিল। দুধচটির পথে হিমালয়ে অলৌকিক এক শক্তিধর সাধকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম আমি। তারপর থেকেই উন্মাদের মত অধ্যাত্ম জীবনের পরমার্থ খোঁজার জন্য হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি। মাঝে মাঝেই অদ্ভুত রকমের অভিজ্ঞতা হচ্ছে। কৌতূহল আরও প্রবল হচ্ছে। কৌতূহল আরো প্রবল হচ্ছে বটে কিন্তু অজানা জগতের রহস্যটা আরও বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। সত্যকে ক্রমশঃ যেন মনে হচ্ছে আরও দূরে

সরে যাচ্ছে। যতই সে কথাটা মনে হচ্ছে ততই আরও বেশি যন্ত্রণা পাচ্ছি।

ঘুমের বিশাল স্পর্শ ক্রমশই আমাদের বার্থ টাতে তার নিঃশব্দ প্রভাব বিস্তার করছিল। নিস্তব্ধ রাত্রির ঘড়ির কাঁটার মত দু' একটা টিক্‌টিক্‌ শব্দের কথোপকথনও এক সময় নীরব হয়ে গেল। নিঝ্‌ঝুম রাত্রি তার নির্ভেজাল সাম্রাজ্য ছড়িয়ে দিয়েছে যেন। কেউ আর জেগে নেই। আমাদের বার্থে আমি শুধু একা বসে আছি। বাইরে বিপুল অন্ধকার। কোটি কোটি বৎসর হয়তো এই বিপুল অন্ধকার জীবজগতের চেতনার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে এক সময় সেই অন্ধকার যেন আমার চেতনার উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। আস্তে আস্তে আমিও মাঝের বাঙ্ক নামিয়ে নিয়ে তাতে আমার শয্যা রচনা করলাম। তারপর—

ভোরবেলা কয়েকটি অস্ফুট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। কুয়াশা আবৃত একটি স্টেশন। যেন রাত্রিব্যাপী নিদ্রার ক্লান্তি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। নিচে নেমেই বুঝতে পারলাম লাক্‌সার। ব্রাহ্মমুহূর্তের অন্ধকারে যেন রহস্যময় দেখাচ্ছে তাকে। বাইরে গরম দুধ-ফেরিওয়ালাদের ভিন্নলোকের জীব বলে বোধ হচ্ছে।

যারা হরিদ্বার যাবে লাক্‌সার থেকেই তাদের বিছানাপত্র বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে তৈরি হতে হয়। লাক্‌সারের পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তের তোরণ পার হয়েই স্বর্গদ্বার হরিদ্বার।

আমি আবার এসে জানালার ধারে বসলাম। বাইরে থেকে হিমেল হাওয়ার স্পর্শ এসে চোখে মুখে আছড়ে পড়ছে। এই লাক্‌সার থেকে এখন হরিদ্বার যাচ্ছি। আবার শ্রীনগর যাত্রার জন্য এখান থেকেই পাঠানকোট এক্সপ্রেসে চাপতে হবে।

লাক্‌সার আয়তনে খুব বিরাট না হলেও একটি জংশন, কয়েক মিনিট গাড়ি এখানে দাঁড়াবে। কুয়াশার আস্তরণ ধীরে ধীরে পাতলা হচ্ছে। গরম দুধওয়ালারা ব্রাহ্মমুহূর্তের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে মাঝে

মাঝে হাঁক দিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া চতুর্দিকেই অদ্ভুত একটা রহস্য-ময়তা।

কুয়াশার আস্তরণ ধীরে ধীরে পাতলা হচ্ছে। এখনও সবাই জেগে উঠে আমাদের বার্থটাতে কলকোলাহল সৃষ্টি করেনি। আর কয়েক মিনিট পরেই গাড়ি রওনা হবে হরিদ্বারের দিকে। প্রায় নির্জন আলস্যভরা স্টেশনের দিকে আমরা মাত্র গুটিকয় প্রাণী তাকিয়ে আছি। ব্রাহ্মমুহূর্তের রহস্যময় কুয়াশায় রহস্যময় একটা ঘড়ির কাঁটার মত মাঝে মাঝে শুধু কয়েকটি গরম দুধওয়ালার হাঁক শোনা যাচ্ছে। জিতেন তখনও ঘুমুচ্ছে।

গাড়ি আবার ছাড়ল। দৃশ্য পাল্টাচ্ছে। নিবিড় সজল শ্যামলীমা ফুটে উঠছে পথের দু'ধারে। হরিদ্বার অঞ্চলটার তিনদিকে পাহাড়। অজস্র ঝর্ণা নামছে। জলের অভাব নেই। ভারতবর্ষের নানা স্থানে যখন খরা দেখা দেয় হরিদ্বারে তখনও শ্যামলের ছোঁয়া থাকে।

এগিয়ে চলেছি হরিদ্বারের দিকে। এখনও পাহাড়ের ছায়া চোখে পড়ছে না। কিন্তু কিছুদূর এগুবার পরই শাল পিয়ালের নিবিড়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অরণ্যের ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে পাহাড় কাছে। হিমালয়ের কোলে উঠবার আগে শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত দু'ধারে এমনিই অরণ্যের ছড়াছড়ি।

গাড়ি চলেছে। তবে আগের মত তেমন গতি নেই আর। ভাবখানা এই যে, 'গন্তব্যের কাছে তো এসে গেছি।' গাড়ির বেগ কমছে। কিন্তু আমার মনের আকাঙ্ক্ষার বেগ ততই উদ্দাম হয়ে উঠছে। হরিদ্বারের অলৌকিক স্মৃতি মনে পড়ছে আর মনের মধ্যে শিহরিত হচ্ছি। এবারও কি তেমনি কোন মহাসাধকের দর্শন লাভের ভাগ্য হবে!

গাড়ি এগুচ্ছে। ডিম ভেঙে রক্তাভ কুসুম ছড়িয়ে পড়ার মত আকাশ ভেঙে যেন একটা রক্ত আভা পূর্ব দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে। এবার আস্তে আস্তে যাত্রীরা উঠে বিছানা বেঁধে ছেদে তৈরী হতে লাগল; কারণ হরিদ্বার স্টেশনে গিয়ে এ গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না—এগিয়ে

যাবে দেরাদুনের দিকে। সুতরাং আগে থাকতে তৈরি হয়ে না থাকলে হরিদ্বারে নামা বিপদ।

আরও কিছুদূর এগুবার পর দূরে পাহাড়ের রেখা দেখা গেল। ভেজা ভেজা হাওয়া জানালা দিয়ে কামরার ভেতর এসে স্নিগ্ধ হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। যেন হরিদ্বারের পবিত্র গঙ্গার বুক ছুঁয়ে আসছে এই হাওয়া, পরম তীর্থস্থানে অবতরণ করার আগে সবাইকে পবিত্র করে নিচ্ছে। অবশেষে হরিদ্বারের ছায়া এসে পড়ল গাড়ির উপর। প্রভাত-সূর্য জ্বলজ্বল ক'রে হাসতে হাসতে যেন পুণ্যস্থানের যাত্রীদের অভিনন্দন জানাল। লাক্সার থেকে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে হরিদ্বার এসে গাড়ি থামল। জিতেন আর আমি সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিক্শা পাকড়ে হোটেলের সন্ধান করতে হবে। তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণার্থীর ভিড় বাঁধ ভাঙা প্লাবনের মত ফুলে উঠছে। ছোট্ট এই স্থানটুকু হয়তো সবাইকে স্থান দিতে পারবে না।

দুই

জিতেনের লক্ষ্য তীর্থস্থান নয়, পুণ্যস্থান নয়, মনোরম স্থান। হরিদ্বারের অধ্যাত্ম মাহাত্ম্যের কোন মর্যাদা নেই তার কাছে। এ-সবের চাইতে তার কাছে প্রকৃতির মনোরমতা বেশি উপভোগ্য। সুতরাং রিক্শায় উঠে সে বলল, হোটেলে চল।

হোটেলে একটা comfort আছে বটে কিন্তু তীর্থস্থানে এসে সেখানে তার মাহাত্ম্যের কোন ছোঁয়া পাওয়া যায় না। তীর্থস্থানে পুণ্যার্থীর মানসিকতা নিয়ে দেখতে এলে হোটেল নয়, ধরমশালার নিরাভরণ কক্ষই ভাল। তীর্থপথের চটির মত কোথায় যেন এর একটা আলাদা মাহাত্ম্য আছে। আমি পেড়াপীড়ি করে তাকে উঠালাম ধরমশালায়।

রিক্‌শাওয়ালা আমাদের এনে উঠালো মেহেরচাঁদ ধরমশালায়। ভাগ্যক্রমে ঘর খালি ছিল। রিক্‌শাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে একটা ঘরে এসে উঠলুম।

লাক্‌সারে হিমেল হাওয়ার যে রকম আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল হরিদ্বারের দিনের আলোতে তেমন শীতের আমেজ অনুভব করা গেল না। যে গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে স্টেশনে নেমেছিলাম সে চাদর আর গায়ে রাখতে হল না।

গঙ্গার খুব কাছেই মেহেরচাঁদ ধরমশালা। গঙ্গা আর ধরমশালার মাঝখান দিয়ে একটি রাস্তা। রাস্তার ওপাশে গঙ্গার ধারে মেয়েদের একটি স্কুল—নাম আনন্দময়ী কলেজ। এপাশে মেহেরচাঁদ ধরমশালা। সেই স্কুলবাড়ির ফাঁকে হরিদ্বারের গঙ্গার ফেনিলোচ্ছল নীলস্রোত দেখা যায়।

জিতেন ঘরে ঢুকেই বিছানা ছড়িয়ে একটু গা এলিয়ে নিল। হরিদ্বারের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তার তেমন আগ্রহ নেই। যথাযথ বিশ্রামের পর যখন সে ব্যবসায়ী মানসিকতা নিয়ে এ অঞ্চল দেখতে বেরুবে তখনই যা একটু চোখ মেলে তাকাবে। নইলে জ্বলন্ত সিগারেটের ধুঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকার মূল্য তার কাছে অনেক বেশি। কিন্তু আমার কাছে হরিদ্বার দেবলোকের মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। এছাড়া আছে পূর্ব কিছু অভিজ্ঞতা। সুতরাং হরিদ্বার সম্পর্কে আমার আগ্রহ ভিন্ন ধরনের।

আমি হাত মুখ ধুয়ে নিয়েই বাইরের বারান্দায় এসে গঙ্গার দিকে তাকালাম। ছুটো বাড়ির ফাঁকে গঙ্গার চলমান স্রোত দেখা যাচ্ছে। সূর্যরশ্মি গঙ্গার বুকে পড়ে চিক্‌চিক্ করছে। গরম পশমের স্পর্শের মত তার আলো এসে চুলের উপর লাগল।

বেলা নটা নাগাদ জিতেনের পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হল। ইতিমধ্যে আমি ধরমশালার কলেই স্নান সেরে নিয়েছি। জিতেনও তাই করল। এবার বেরুতে হবে আহার্যের সন্ধানে। এ অঞ্চলের জলখাবারের দোকান, হোটেল, সবই আছে ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে।

জিতেন ব্রহ্মকুণ্ডে পৌঁছুবার আগেই জলযোগ পর্বটা শেষ ক'রে নিতে চেয়েছিল আমি তা হতে দিইনি। হরিদ্বার এসে হরকিপৌড়িতে পুজো না দিয়ে প্রাতরাশ সারার কোন যুক্তি নেই। সুতরাং এগিয়ে চললাম।

কাশী পুরী বা মথুরার মত পাণ্ডার উৎপাত নেই হরিদ্বারে। সরু দীর্ঘ রাস্তা ধরে ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। দুধারে প্রচুর মনোহারী দোকান ভ্রমণার্থীদের আকর্ষণ করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝেই খাবারের দোকান।

ব্রহ্মকুণ্ডের কাছাকাছি একটু শীত আছে। বরফছোঁয়া হাওয়ার একটা স্পর্শ পেলাম। চোখে মুখে বেশ দাপটে যেন একটা শীতার্ত হাওয়া এসে আছড়ে পড়তে লাগল। সেই হাওয়ার বিরোধিতা অস্বীকার ক'রেই ঘাটের দিকে নামলাম।

আরও দুবার আমি হরিদ্বারের এই স্বর্গখণ্ড দেখেছি। মহৎ কবিতার মত এ যেন infinite suggestion-এ ভরা। প্রথম দর্শনের সেই বিমূঢ় বিস্ময় নিয়েই যেন আবার আমি দৃশ্যপটের দিকে তাকালাম: সকালবেলার সূর্যের নিচে ব্রহ্মকুণ্ড যেন সত্যিই একখণ্ড স্বর্গ। ঝলমল ঝলমল করছে। বাঁধানো গঙ্গার ধার। যেন স্বর্গের কোন অকল্পনীয় সমুদ্র-চাতাল। অসংখ্য পুণ্যার্থী দাঁড়িয়ে আছে যেন মুক্তির ঠিক নিচেই। গোটা কয়েক ভিখারী আছে বটে, পাণ্ডার উৎপাত মোটেও নেই। এমন সুনির্মল পবিত্রতা পৃথিবীতে অন্য কোথাও আছে কিনা জানা নেই।

আমার অধ্যাত্ম চেতনার মণিকোঠায় এ স্থান অত্যন্ত মনোরম। স্মৃতির পরশে যেন অপূর্ব এক স্নিগ্ধ প্রশান্তি ছড়িয়ে দিয়ে এ-স্থান দাঁড়িয়ে আছে। হর-কি-পৌড়ির ছোট মন্দির দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার উপর। গঙ্গার এপার ওপার বাঁধানো চাতাল। একটি ক্লক টাওয়ার যেন একা একা দাঁড়িয়ে এখানে কতদিন যাবৎ ধ্যান করছে। ফুলওয়ালা সারে সারে ছাতা মেলে তার নিচে ফুল নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। গঙ্গার এপার ওপার সেতু দিয়ে যুক্ত। গঙ্গা

এখানে দ্বিধা বিভক্ত। ক্লক টাওয়ারের ওধারে তার আরও একটু প্রশস্ত গতি। ওধারেও নদীর ধার বাঁধানো। এমন মনোরম দৃশ্য আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এই নিয়ে তিনবার হরিদ্বার এলাম। যতবার দেখছি ততবারই এ যেন নতুন। সর্বত্রই কেমন একটা অতীন্দ্রিয় ভাব।

গঙ্গার স্বচ্ছনীল জলের নিচে আজও তেমনি মাছেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গায়ের রংটা আঁশটা পর্যন্ত দেখা যায়। ভয় নেই, সহজ নিঃসঙ্কোচ গতি।

দূরে উত্তর দিকে দিগন্তরেখায় তুষারকীরিট পরে হিমালয় হাসছে। এখান থেকে সে তুষারকিরীট দেখা না গেলেও হিমালয়ের গম্ভীর ছায়া নজরে পড়ে। মনে হয় এই ছায়া নিবিড় একটা প্রশান্তি গায়ে মেখে স্বর্গের দিকে উঠে গেছে। এখানে মানুষ তার হারোনো সম্পদ খুঁজে পেতে পারে।

যে অতীন্দ্রিয় গন্ধ আমার চেতনায় আছড়ে পড়ছে জিতেন বোধহয় তার কণা মাত্রও পাচ্ছে না। চঞ্চল উন্মাদনা ছাড়া জীবনের কোন অর্থ নেই তার কাছে। ওর বোধহয় বেশিক্ষণ ভাল লাগল না। এদিক ওদিক একটুক্ষণ ঘুরে ক্লান্তি বোধ করল। বলল, কি এখন কি করি?

মনে মনে বললুম, হরিদ্বারে এসে কিছু তো করার নেই। কাজ অকাজ সব কিছু বিসর্জন দিয়েই এখানে আসতে হয়। তবেই এখানকার দৈবী মাহাত্ম্য চেতনার মধ্যে ধরা পড়ে। কিন্তু এনিয়ে তাঁকে কিছুই বললুম না। আমার মন ছিল তখন অন্যত্র। আমি চারদিক লক্ষ্য ক'রে খুঁজছিলাম একটি ব্যক্তিকে যে-ব্যক্তি হরিদ্বারে আমার মধ্যে একবার প্রবল অধ্যাত্ম অনুসন্ধিৎসা জাগিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তিটি একজন সাধু, 'বাঙ্গালী বাবা' নামে পরিচিত। প্রথম বার হরিদ্বারে এসে তাঁর কাছে অনেক জিনিস পেয়েছিলাম। তখন তিনি ছিলেন নিরীহ একটা সাধারণ ভিখারীর মত। দ্বিতীয় বার তাঁকে দেখেছিলাম যোগীর ভঙ্গীতে উন্মুক্ত আকাশের নিচে

গঙ্গার ধারে বসে থাকতে। কিন্তু দ্বিতীয় বার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে তিনি এমন সব অসংলগ্ন কথা বলেছিলেন যে, আমি রীতিমত বিভ্রান্ত বোধ করেছিলাম। এমন অদ্ভুত ব্যবহার সাধকের মধ্যে কেন যে হয় দীর্ঘদিন আমি তা অনুমান করতে পারি নি। পরে মনে হয়েছে, এড়িয়ে যাবার জন্য এ হল সাধকদের এক ধরনের কৌশল। কেউ বা নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য এই কারণে পাগলের ভান করে, কেউ বা তিরিক্ষি মেজাজ হয়ে থাকে। জানি না বাঙ্গালী বাবার মনে কি উদ্দেশ্য ছিল। সেই রহস্যটা ভেদ করার জন্যই ব্রহ্মকুণ্ডের চারধারে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমি। প্রথমবার যেখানে দেখেছিলাম তাকে সেখানে তিনি নেই। দ্বিতীয় বার যেখানে যোগাসনে বসেছিলেন সেখানেও নয়। হয় তো ধারে কাছেই কোথাও নেই তিনি। হিমালয়ের আরো উপরের দিকে চলে গেছেন কিনা কে জানে! সাধকের-দেখা পাওয়া তো ভাগ্যে না থাকলে হয় না!

আমার ভাবসাব লক্ষ্য করে জিতেন জিজ্ঞাসা করল: কিছু খুঁজছিস? কি খুঁজছি জিতেনকে তা বললাম না, কারণ এসব অধ্যাত্ম তত্ত্বে বা সত্যে জিতেনের কোন বিশ্বাস নেই। পার্থিব বস্তুবাদী ভাবধারায় সে আচ্ছন্ন। ভারতবর্ষের যে একটি অন্তরতম সাধনার ধারা আছে সে তা বোঝে না, বুঝতে চায় না। তার কাছে Democracy ও Socialism এর তাত্ত্বিকমূল্য Spiritualism-এর চাইতে অনেক বেশী। তাই বললাম, না কিছু না।

—কি করবি এখন? জিতেন আমার মুখের দিকে তাকাল।

বুঝলাম, এই উন্মুক্ত আকাশের নিচে পবিত্র প্রভাতের আলোতে জিতেন কোন আকর্ষণী কিছু পাচ্ছে না। তার কাছে উপভোগের বিষয় হলো জীবন, এবং জীবন মানেই এক ধরনের উন্মাদনা। ব্যস্ততা নেই, কলকোলাহল নেই, এধরনের স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতা তার ভাল লাগছে না। তবু বললাম, কেন তোর ঘুরতে ভাল লাগছে না?

জিতেন বলল, এখানে তো দেখবার কিছু নেই।

আশ্চর্য! জিতেনের কাছে দেখবার কিছু নেই, কিন্তু আমার কাছে

অনন্ত দর্শনীয় দৃশ্য এখানে। সে খুঁজে উন্মাদনা, আমি খুঁজি প্রশান্তি। দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গী কখনও মেলবার নয়। তবু বললাম, তাহলে বেড়াতে বেরিয়েছিস কেন? সে বলল, আমি তো হরিদ্বার আসতে চাইনি, শ্রীনগর যাব বলে বেরিয়েছি, তোর জন্যেই তো হরিদ্বার এলাম।

এধরনের জবাবের কোন প্রত্যুত্তর নেই। যার কাছে হরিদ্বারের স্নিগ্ধ প্রশান্তি আকর্ষণীয় নয় তাকে আমি এ স্থানের প্রতি আমার আকর্ষণের কারণ কোন রকমেই বোঝাতে পারব না। সুতরাং আমি চুপ ক'রে থেকে দুই চোখ ভরে দেখতে লাগলাম। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার মত দুই চোখ ভরে শুধু দেখতে লাগলাম। উত্তরে হিমালয়ের ছায়া, ঐ ছায়ার কোণেই আমি প্রথম অলৌকিক এক সাধকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, যিনি আমাকে কুলকুণ্ডলিনী সাধনার একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অলকনন্দাকে দেখিয়ে। মর্ত্যের দিকে ধাবমানা অলক নন্দাকে হিমালয় শীর্ষের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যা, কুণ্ডলিনী সাধনাও তাই।

অনেকদিন তাঁর এই কথার তাৎপর্য আমি মনে মনে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারিনি। পরে একজন সাধু শ্রেণীর ব্যক্তির কাছে এ কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি। কুণ্ডলিনী মায়াশক্তি। নির্গুণ পুরুষ থেকে নেমে এসেছেন। তাঁর এই নেমে আসার ফলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সময়ের সৃষ্টি, শব্দের সৃষ্টি, সব গতিময় বস্তুময় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্বত্রই মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন। এই মায়ার জন্য নির্গুণ সত্যের স্বরূপ বোঝা যায় না। সত্যপিপাসু অধ্যাত্ম সাধক যদি এই সত্যকে জানতে চান, তাহলে যে পথে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে সেই পথেই উল্টো গতিতে উৎপত্তির কেন্দ্রে যেতে হবে। অর্থাৎ উল্টো দিকে না গেলে সত্যের স্বরূপ জানা যায় না। উল্টো দিকে কে যেতে পারে? মানুষের মনও পারে না, জৈব চেতনাও পারে না, পারে শুধু যে শক্তির প্রভাবে এই দেহ সৃষ্টি, যে শক্তি সৃষ্টিক্রিয়ার পর এই দেহের মধ্যেই ঘুমন্ত, মূলাধারস্থিত সেই শক্তি। সাধকরা সাধনায় সেই ঘুমন্ত শক্তিকে জাগরিত করে

দেহের ঊর্ব অংশের সর্বনিম্ন অঞ্চল থেকে সর্বোচ্য স্থানে অর্থাৎ মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রে বা সহস্রারে নিয়ে যান। অর্থাৎ নিম্নগামী শক্তিকে ঊর্ধ্ব দিকে ঠেলে দেন। একেই বলে ষট্‌চক্রভেদ। শক্তিপ্রবাহের এই উল্টোগতিই শাক্তসাধনার বড় কথা। উল্টো বা বিপরীতকে অনেক সময় বলে 'বাম' যেমন কংগ্রেসের উল্টো বা বিপরীত দল বামফ্রন্ট। শক্তিসাধনার আচার এই উল্টো অর্থাৎ বাম দিকে বলে- একে বাম-আচার অর্থাৎ বামাচার বলে। এর অর্থ সাধারণ মানুষ যে ভাবে নেয়, তা নয়, অর্থাৎ বামা (মহিলা) সহ আচার নয়। এ হল উল্টো আচার।

কিন্তু তত্ত্বকথায় এই গূঢ় আচারের যতটুকু বোঝা যায় তা না বোঝারই নামান্তর। একে যথার্থ বুঝতে হলে ব্যক্তিগত সাধনা দরকার। এখনো আমি ব্যক্তিগত সাধনা করিনি, তবে ব্যক্তি-সাধকের অলৌকিক ক্রিয়া দেখেছি হিমালয়ের পায়দলের পথে দুধচটিতে, বিহারের সোকরিগোলির টিলা পাহাড়ের উপর ও কালীঘাটে। সেই অলৌকিক ক্রিয়ার প্রত্যক্ষতাই আমাকে দুনিবার আকর্ষণে অনবরত টেনে চলেছে। সেই আকর্ষণের নিবিড়তা যে কি, জিতেনকে বলে তা বোঝানো যাবে না। সেই জন্য আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চারদিক দেখবার পর আমি জিতেনের দিকে ফিরে তাকালাম, বললাম, চল্।

—কোথায় ?

—কেন, ধরমশালায় ?

জিতেন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, চল্।

আবার ব্রহ্মকুণ্ডের সরু গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই ধরম-শালাতেই ফিরে এলাম।

হরিদ্বারে বেশিদিন থাকব না। জিতেন থাকতে চায় এক রাত্রি, আমি অন্ততঃ দু রাত্রি কাটাবার ফন্দীতে আছি। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আর একবার অঞ্চলটা ঘুরে দেখতে হবে। প্রথম বারের নানা অভিজ্ঞতা এখনও স্মৃতির মণিকোঠায় সাঞ্চত হয়ে আছে। সুতরাং

ধরমশালায় ফিরে জিতেনকে বিশ্রামের বেশি অবকাশ দিলাম না। কিছুক্ষণ পরেই রাস্তায় বেরিয়ে একটা সিন্ধি হোটেলে নিরামিষ ভোজন করে হরিদ্বার অঞ্চলটা পরিভ্রমণ করার জন্য একটা টাঙ্গা নিলাম।

জিতেন একটু বিশ্রাম নিতে চেয়েছিল। তাকে সে সুযোগ দেওয়া গেল না। দ্বিপ্রহরের আহারের শেষেই টাঙ্গা ধরলাম। গাড়ি চলতে লাগল উত্তর দিকে। প্রথম সপ্তধারা অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখাবে।

হরিদ্বারেব পথঘাট কলকাতার মত নোংরা এবং যান বাহন-কণ্টকিত নয়। ঝকঝকে পথ। চলেছে বেশির ভাগ টাঙ্গা আর রিকশা. মাঝে মাঝে দু একটা স্থানীয় ট্যাক্সী ও দূরাগত ভ্রমণবিলাসীদের প্রাইভেট কার। সাইকেল এখানে বড় বাহন। যুবতী মেয়েরা দেখি সবাই প্রায় সাইকেলে করে যাতয়াত করে।

টাঙ্গা চলেছে। বাজারের কোণ ঘেঁষে ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে উঁচু বাঁধের মত রাস্তা দিয়ে আমাদের টাঙ্গা এগিয়ে চলেছে। জিতেনকে দেখলুম বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। জিজ্ঞাসা করলাম কেমন লাগছে ?

জিতেনের আর যা-ই থাক মনে কোন রোমান্টিক চেতনা নেই। যেখানে প্রকৃতি শুধু স্নিগ্ধ ছায়া মেলে অধ্যাত্মতার স্পর্শে ভরে থাকে সেখানে তার মন সহজে আকৃষ্ট হবার নয়। জীবনটার অর্থ সে বুঝে উন্মাদনা। জিতেন বলল : Lifeless.

যাকে জিতেন বলে লাইফ, আমরা তাকেই বলি যন্ত্রণা। জীবনের যন্ত্রণা এড়াবার জন্যই আমরা এমনতর স্থানের সন্ধান করি। বেশি করে সন্ধান করি সেই সব ব্যক্তিকে যাঁরা এই স্নিগ্ধ প্রকৃতির রস তাঁদের চিত্তে প্রতিফলিত করতে পেরেছেন, যাঁরা প্রশান্ত জগতের সন্ধান পেয়েছেন। সত্যি সত্যি জীতেনকে হরিদ্বারে নিয়ে আসা ভুল হয়েছে।

আমি জিতেনের মনের দিকে না তাকিয়ে নিজের অভিলষিত

জিনিস পাবার জন্য একাগ্র মনোনিবেশে চারদিক তাকিয়ে দেখ
লাগলাম। আমাদের টাঙ্গা কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেল লাই
ধারে এসে পৌছুল। রাস্তা এখানে রেল লাইনের পাশ দিয়ে গে
পাশেই পশ্চিমে পাহাড়, উপরে শ্বেতশুভ্র মনসা মন্দির। গত
কুলকুণ্ডলিনী রহস্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা ভেবে ম
পাহাড় তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছিলুম, কিন্তু কোন সাধু সন্তেরই সা
পাইনি।

রেল লাইন চলে গেছে পাহাড়ের গা দিয়ে। দার্জিলিং-এর
লাইনের মত অত ঘোরানো নয়। এ লাইন গেছে দেরাদুন পর্য
আমি পর পর দুবার হরিদ্বারে এসেও দেরাদুন যাইনি, কারণ, দেখ
ভাল শহর হলেও অধ্যাত্মচর্চার কোন ক্ষেত্র নয়। হরিদ্বারের ব্রহ্মকু
ধারে যদি ত্যাগীরা এসে ভিড় করে, দেরাদুনে ভিড় করে ভোগী
ভোগী শ্রেণীর মানুষ যাঁরা দেশভ্রমণে বেড়ান তাঁরা এতদঞ্চলে
হরিদ্বারে না উঠে দেরাদুনে গিয়ে হোটেলে উঠেন। কৌতূহল ব
একবার হরিদ্বার ঘুরে যান।

আমাদের টাঙ্গা একটু বাঁকানো রাস্তার উপর এসে পড়
এখানে রাস্তা তত সুন্দর বা পরিচ্ছন্ন নয়, প্রত্যেকটি বাড়ির উঠা
হনুমানজীর মূর্তি বা ছোট মন্দির দেখলাম।

রাস্তায় দুই পাশেই মন্দির, প্রত্যেকটি মন্দিরের পেছনেই হ
কোন না কোন কাহিনী গজিয়ে উঠেছে। গাড়োয়ান কিছু
পরিচয় দিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এ ধরনের কাহিনীতে আ
আকর্ষণ নেই কারণ ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সত্যের কোন কিছুই
কাহিনীতে নেই।

আমাদের টাঙ্গা ব্রহ্মকুণ্ড থেকে আড়াই ফার্লং রাস্তা চলা
একটা জায়গায় এসে থামল, নাম ভীমগোড়া। গত দুবার এসে এ
পরিদর্শন করেছি। অবিশ্বাস্য, অনৈতিহাসিক এবং কিংবদন্তী
আছে এর পেছনে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তৈরিকরা
তাছাড়া ভীমগোড়ার গুহাতে কোন সাধুও থাকেন না। কিছু ব্যব

পুরোহিত-জাতীয় লোক বসে আছে। গাড়োয়ানকে বললাম এখানে গাড়ি রোখার প্রয়োজন নেই, এগিয়ে চল। জিতেনকে জিজ্ঞাসা করলাম সে নামতে চায় না কিনা। এসব স্থানের প্রতি জিতেন তার স্বাভাবিক কারণেই অনাগ্রহ দেখাল, সুতরাং আমাদের টাঙ্গা এগিয়ে যেতে লাগল।

আমি নিবিড় দৃষ্টি মেলে পথের দুপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। বহু দেহাতী লোক আছে, দেহাতী ভক্তজনের আনাগোনাও চলেছে কিন্তু কোন সাধুসন্ত নেই। সাধুর বেশে যারা আছে তারা নিতান্ত ভিখারী। ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য ভেক নিয়েছে। সুতরাং অভীষ্ট কোন ব্যক্তি দেখতে পেলাম না।

অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধকের সাক্ষাৎ পাওয়া নিতান্তই ভাগ্যের ব্যাপার। তাঁদের করুণা না হলে তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এ পর্যন্ত যে কয়জন সাধকের সাক্ষাৎ পেয়েছি আমি, তা হয়তো তাঁদের করুণার জন্যই। সেই করুণা যদি অকস্মাৎ ঝরে পড়ে সেই জন্যেই তো অর্থনৈতিক অবস্থা অনুমোদন না করলেও জিতেনের সঙ্গে বেরিয়েছি।

সপ্তধারা অঞ্চলে আমি যে কয়বার এসেছি সাধুসন্তের কোন সাক্ষাৎ পাইনি। তবুও হরিদ্বার অঞ্চলে আসার কারণ আমার একটু ভিন্ন। মুখ্য উদ্দেশ্য আবার সেই দুধচটির পায়দলের পথে এগিয়ে যাওয়া, যেখানে একবার আমি অলৌকিক শক্তিধর সাধকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তাঁর কাহিনী সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে-এর প্রথম খণ্ডে লিখেছি। ভারতীয় অধ্যাত্ম সত্য সম্পর্কে তিনি আমার মনে অনিবার্য বিশ্বাস জন্মিয়েছেন। মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল অকস্মাৎ রহস্য-জনক ভাবে যিনি এখান থেকে এক সময় অন্তর্ধান করেছিলেন আবার তিনি অব্যক্ত ভাবে এসে সামনে তো উদয়ও হতে পারেন। সাপ সম্পর্কে যে কৌতুহল তিনি আমার মধ্যে জাগিছেন একমাত্র তিনিই হয়তো তা চরিতার্থ করতে পারেন। কিন্তু দুধচটি এখন নয়, এখন চলেছি সপ্তধারার দিকে।

সপ্তধারা হল সেই স্থান যেখানে হিমালয় থেকে নেমে গঙ্গা সাতটি ধারায় বিভক্ত হয়ে ছোট ছোট দ্বীপের মত সৃষ্টি করেছে। অরণ্যাবৃত সেই সব দ্বীপ। গল্প কাহিনী, এখানে বসে ভারতের গোত্র প্রধান সাত ঋষি যখন যোগ সাধনা করছিলেন তখন গঙ্গা মর্ত্যে নামেন। এই সাতঋষির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ গঙ্গা তাঁদের ভাসিয়ে না নিয়ে সপ্তধা বিভক্ত হয়ে সমতল ভূমিতে পড়েছেন। এইজন্য স্থানটির নাম সপ্তধারা। সেই দিকেই এগিয়ে চলেছি।

এগুচ্ছি। অদ্ভুত একটা গৈরিক স্নিগ্ধতা তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত অঞ্চলটি। ভারতবর্ষে যে হিন্দুধর্ম লুপ্ত হয়ে যায় নি উত্তর প্রদেশের এই সীমান্তে এলে সেটা বোঝা যায়। পথের ধারে ছোটবড় মন্দির, সাধু সন্ন্যাসীদের আস্তানা। নতুন নতুন মন্দির এখনও তৈরি হচ্ছে। উগ্র বর্তমান-সভ্যতার চাপে নিষ্পেষিত হবার পর তপোবন সদৃশ ভারতের এই অঞ্চলে এলে সত্যি যেন ভাল লাগে। যন্ত্রণা দগ্ধ জীবনের শেষে এখানে একটা শান্তির প্রলেপ অনুভব করা যায়

জিতেনও দেখছি মনোযোগ দিয়ে সব দেখছে। তার ভাল লাগছে বলেই বোধ হল। প্রাচীন ভারতের সেই শ্যামস্নিগ্ধ জীবনের জন্য এই বিভ্রান্তির যুগেও মানুষের অবচেতন মনে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে। তলিয়ে বিচার করে দেখে না বলে লোকে বুঝতে পারে না সত্যি, পরিবেশ আর প্রকৃতি এখানে শান্তির প্রলেপ মাখানো। এই সৌম্য উদার প্রকৃতির কোলে মানুষ যদি কৃত্রিমতা না দেখাতো তবে বোধহয় মানুষের ধর্মবিশ্বাস কোন দিনই দুর্বল হয়ে যেত না। তবে বেদনার ঘটনা হল এই যে, এই বিপুল প্রকৃতির কোলে মাঝে মাঝেই পথের ধারে সাধুদের জন্য অট্টালিকা উঠছে। যদি নিশ্চিন্তে সুরক্ষিত গৃহেই থাকতে হয় তাহলে ঘর ছেড়ে এরা সব বাইরে এল কেন?

অধ্যাত্মতা এখানে স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠেছিল। তার মহান আবেদন মানুষই অনেকটা নষ্ট করেছে। বেনেরা ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিতে এখানে এসে অনেক মন্দির ফেঁদে বসেছে। এ পথে তেমনই এক

মন্দির আছে রামসীতার মন্দির। গদিওয়ালা মাড়োয়ারীরা নিয়ন্ত্রণ করে। আর্শির ভেল্কিতে এক রাম-সীতা বহু হয়ে দেখা দেয়। সহজবুদ্ধি দেহাতী মানুষেরা এতেই বিভ্রান্ত হয়। এর আগে যখন এখানে এসেছি, এ মন্দির দেখে গেছি। এধরনের মন্দিরের জন্য আমার তেমন আগ্রহ নেই। আমি যা খুঁজছি, তাও এখানে পাওয়া যাবে না। টাঙ্গাওয়ালা এখানে এসে টাঙ্গা থামাতে জিতেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সব দেখবার তাঁর কোন আগ্রহ আছে কিনা। জিতেন বলল: না। সুতরাং টাঙ্গাওয়ালাকে এগিয়ে যেতে বললাম।

টাঙ্গা আবার এগিয়ে চলল। দৃশ্য সত্যিই অতুলনীয়। ওধারে গঙ্গা বয়ে চলেছে। বাঁধের মত রাস্তার উপর দিয়ে টাঙ্গা ছুটে চলেছে। বাঁয়ে কাছে পাড়ে, ডাইনে গঙ্গার ওধারে পাহাড়। প্রাকৃতিক এই সৌন্দর্যের মধ্যে কোথায় যেন এখানে একটা গৈরিক উত্তরীয় বসানো রয়েছে। নিবিড় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, মহাভারতের বুক থেকে বোধহয় মহাকাব্যের একটা ধ্বনি উঠছে।

আরো কিছুদূর এগুবার পর টাঙ্গা থেমে পড়ল। এখানেই এ-পথে যাত্রা শেষ। পূর্বপরিচিত স্থান। দেখেই বুঝতে পারলাম যে, সপ্ত ঋষির আশ্রম, সপ্তধারা।

প্রচণ্ড ভিড় নেই এখানে, তবে কিছু কিছু লোক সপ্তধারা দেখতে এসেছে। কিছু লোক দেখে ফিরছে। জিতেনকে নিয়ে নামলাম। প্রথম গেলাম ঢালুপথ বেয়ে ডাইনে নিচে নেমে। সেখানে বাবলা গাছের নিচে দেখি একজন জটাজুটধারী তরুণ সন্ন্যাসী। একজন চেলা কাছে বসে। সন্ন্যাসী একটি দৈনিক হিন্দী খবরের কাগজ পড়ছে।

প্রথমটা তাকে দেখে আমার মধ্যে একটা অধ্যাত্ম কৌতুহল জেগে উঠেছিল, কিন্তু এ দেখে আগ্রহ কমে গেল। যিনি চিরন্তনের স্বাদ পেয়েছেন তিনি ক্ষণস্থায়ী উন্মাদনার খবর পড়ে কি করবেন? এ বিষয়ে বা তাঁর আগ্রহই থাকবে কেন? সুতরাং সন্ন্যাসী সম্পর্কে আগ্রহ কমে গেল।

ঢালু পথে সপ্তধারায় নামতে ডান দিকে তার দিয়ে ঘেরা একটা সমাধি আছে। এ-সব এখন আমার পরিচিত। সুতরাং ওদিকে এগুবার কোন আগ্রহ দেখালুম না। জিতেনকে নিয়ে নেবে গেলুম সপ্তধারার দিকে।

জিতেন জিজ্ঞেস করল : এখানে কি আছে রে ?

বললাম : সপ্তধারা :

—সে কি !

—আয় না। দেখলেই বুঝবি।

নিচে নেবে গিয়ে সপ্তধারার পাশে দাঁড়ালুম। লক্ষ লক্ষ উপল খণ্ডের উপর দিয়ে গঙ্গা এখানে তর্‌তর্‌ ক'রে বয়ে যাচ্ছে। এক হাঁটুও জল নেই। কিন্তু স্রোত প্রবল। আমরা দুজনে গিয়ে বড় বড় পাথরের টুকরোর উপর দাঁড়ালুম।

শত ধারায় প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা এখানে নিচে নামছে। কাছে গঙ্গা দূরে গঙ্গা। বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত। মূলত এখানে ধারা সাতটি। হরিদ্বারের কাছে গিয়ে এক হয়ে মিশেছে। হরিদ্বারের গঙ্গায় মানুষের সৃষ্টি-কৌশলের পরিচয় রয়েছে, এখানে জগদীশ্বরের অকৃত্রিম শিল্পকৌশলের প্রকাশ।

জিতেন জিজ্ঞেস করল : এর নাম সপ্তধারা কেন রে ?

বললাম, এর পেছনে একটা গল্প আছে।

—কি ?

—ভগীরথের কাহিনী।

—সেটা কি ?

বললাম, ভগীরথ যখন গঙ্গাকে নিয়ে এপথ দিয়ে মর্ত্যে নামছিলেন তখন এখানে সাতজন ঋষি যোগ করছিলেন। পাছে ঋষিরা ভেসে যান এই জন্য গঙ্গা এখানে সপ্তধারায় বিভক্ত হয়ে নিচে নেমেছেন।

জিতেন বলল : সবই আজগুবি কাহিনী।

বললাম, কাহিনী তো সবই আজগুবি। যাঁরা কাহিনীকার তাঁরা

ঘটনার নির্ভেজাল বর্ণনা দেন? সেখানেও তাঁদের কল্পনার খাদ
। পুরাণকারেরাও হয়তো খাদ মিশিয়েছেন। প্রণয় কাহিনী
ন কাহিনীতে উপভোগ্য হয় বাস্তবে কি আর তেমন? অথচ
ক উপভোগ করে। পুরাণকারেরা যাঁদের জন্য লিখেছিলেন
রা এ কাহিনী বেশ উপভোগ করেছেন।

তেন বলল: কিন্তু মানুষকে এসব কাহিনী বিভ্রান্ত করেছে।
রা এ সব কাহিনী শুনে অদৃষ্টবাদী হয়েছে। ভাগ্যের হাতে
জেদের ছেড়ে দিয়েছে। এ-সব কাহিনীই লোকের অজ্ঞতা ও
থ দুর্দশার কারণ হয়েছে। এইসব কাহিনীকেন্দ্রিক যে ধর্ম তাকে
ক্য করেই কার্ল মার্কস বলেছিলেন Religion is opium of the
ople.

হেসে বললাম: মার্কসের তত্ত্বও এক ধরনের অপিয়াম।

—কি রকম?

—মার্কসীয় তত্ত্বের কাছে বিচার বুদ্ধি বিক্রি ক'রে লোকে এক
নের বিশ্লেষণহীন বিশ্বাসে fanatic-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

জিতেন বলল: ভারতের অধ্যাত্মতা সম্পর্কে তোর দুর্বলতাই
াকে এমনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। আমার তো মনে হয়, তোর
বিশ্বাস, তাও এক ধরনের আফিং।

বললাম, তুই আসলে ভারতকে চিনিসনি। যথার্থ কোন সাধুসন্ত
খিসনি। তাহলে বুঝতিস ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম চিন্তায় কতবড়
ত্য নিহিত আছে। বুঝতিস মানুষের এই দেহটা বিরাট এক রহস্য।
কটা মানুষ দেহের আয়তনে ছোট বটে, কিন্তু এই বন্ধনের মধ্যে
। অনেক বড়। দেহের ভেতর ঘুমন্ত কুলকুণ্ডলিনীকে জাগালে
জের মধ্যেই সে অনন্তস্বরূপের বোধ লাভ করে।

জিতেন বলল: তোর কুলকুণ্ডলিনী না কি, এ নিয়ে দু'একটা
ইও লিখেছিস, পড়েছি। সেই সাপ তোকে দংশন করেছে। সাপের
যে তোর ব্যক্তিসত্তার মৃত্যু হয়েছে।

বললাম: এক সময় বৃহস্পতি লৌক্য, অজিত কেশকম্বলিন,

চার্বাক, এঁরাও এমন কথা বলতেন। কিন্তু ভারতের লোকেরা তাঁদের নেয় নি।

জিতেন বলল : এ হল বস্তুজগৎ থেকে পলায়নপর মানসিকতা।

বললাম : বস্তুজগৎ চর্চা ভারতবর্ষ এক সময় যথেষ্টই করেছিল। রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা কিছুতেই তো ভারতবর্ষ পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু একদিন এ-সব ছেড়ে দিয়ে সে নিজের অন্তরের দিকে তাকাল. কেন ?

জিতেন বলল : practical life-এর নানা সমস্যা সহ্য করতে না পেরে এ হল এক ধরনের escapism. গাঁজা খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকার মত

তর্কে আমার প্রবৃত্তি হল না। এটা তর্কের ব্যাপার নয়। যে মিষ্টি খায়নি তাকে মিষ্টির স্বাদ বলে বোঝানো যাবে না। ভারতের অধ্যাত্মতা সাধনার জিনিস, অনুভবের জিনিস। যিনি ব্যক্তিগত জীবনে সাধনা ক'রে কোন ফল লাভ না করেছেন, তিনি এর মর্ম বুঝবেন না। সুতরাং আমি দৃষ্টি ফেরালাম পারিপার্শ্বিকের দিকে।

আরো কয়েকবার এ দৃশ্য দেখেছি। তবু যেন এখানকার দৈবী প্রকৃতি অনন্ত আকর্ষণে ভরা। আশ্চর্য ব্যাপার, গঙ্গা হল ভারত-বর্ষের প্রাণ। এই গঙ্গাই ভাগীরথী পদ্মার বিশাল রূপ নিয়েছে বাংলা দেশে এসে। কীর্তিনাশা দুরন্ত সেই পদ্মা এবং প্রশস্ত গঙ্গা যিনি দেখেছেন তাঁর কাছে বিশ্বাস করাই প্রায় অসম্ভব যে, উৎসের কাছে তার প্রাণপ্রবাহ এত ক্ষীণ। জানি না, সৃষ্টির উৎসে শক্তির গতি এত তীব্র অথচ শীর্ণ কিনা। সে-কথা জানবার জন্যই তো দীর্ঘদিন ধরে এত ছটফট করছি। ভেতরে একটা রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বুঝতে তো পারিনি কিছুই। জানবার কৌতূহল কিছুটা জানবার পর আর জানতে না পারলে যে কি দুঃসহ ভাবে যন্ত্রণাদায়ক হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।

সপ্তধারা দেখবার পর আবার উপরে উঠে এলুম। এবার সপ্ত-ঋষির আশ্রম।

সপ্তঋষির আশ্রম-মন্দির মোটেই পুরানো নয়। আশেপাশে নতুন নতুন ঘর তৈরি হচ্ছে। সাধুসন্তদের থাকবার জন্য এখানে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। মন্দিরে উঠে সপ্তঋষির মূর্তিগুলো দেখতে লাগলুম। গৌতম ভরদ্বাজ ইত্যাদি করে গোত্রপ্রধান সপ্তঋষির মূর্তি রয়েছে এখানে।

জিতেন জিজ্ঞেস করল : এই প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের স্বচক্ষে কে দেখেছিলেন যে, মূর্তি তৈরি করা হয়েছে ?

বললাম, দেবদেবীর মূর্তি হল কি ভাবে ?

জিতেন বলল : ওগুলো কল্পনা মাত্র। আর্ট। বিশেষ বিশেষ ভাবব্যঞ্জক।

—কিন্তু সাধকরা তা বলেন না। তাঁরা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন।

—অপরকে দেখাতে পারেন ?

—তাঁরা যে পথ অবলম্বন ক'রে দেখেছিলেন যে কেউ সে পথে চললে তারাও তা দেখতে পাবে।

—কিন্তু সপ্তঋষি তো পার্থিব জীব ছিলেন। তাঁরা মরে গেছেন কবে। তাদের দেখা যাবে কি করে ?

বললাম : তাঁদের স্থূল দেহটা মরে গেছে, সূক্ষ্ম দেহটা তো মরে যায়নি।

জিতেন বলল : ও-সব বাজে কথা। যদি সূক্ষ্ম দেহ থেকে থাকে, তাই বা দেখা যাবে কি করে। কারণ এঁরা তো বড় বড় সাধক ছিলেন। মোক্ষলাভ করেছেন ধরা যায়। তাহলে এদের সূক্ষ্মদেহ থাকবে কি ক'রে ?

বললাম : আমি শুনেছি, জগতে যা কিছু আছে, তাদের সূক্ষ্ম অস্তিত্ব পরমাত্মার বুকে ফটোর নিগেটিভে আটকে থাকার মত টিকে আছে। তাঁদের কর্মফল পরমাত্মার বুকে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল সেই তরঙ্গ অনুযায়ী নানা মূর্তিতে আজও রয়ে গেছে। কর্মফল নাশ হলে জীবননাট্যের বাকি অংশ আর অভিনীত হয়নি এই যা।

কিন্তু যতটুকু একবার অভিনীত হয়ে গেছে তার আর লয় নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না সৃষ্টির লয় হচ্ছে। মুভি পিকচার্সের রিলের মধ্যে যেমন সমস্ত কাহিনী আটকে থাকে তেমনি। সূক্ষ্ম দৃষ্টি যাঁরা অর্জন করেন তাঁরাই এই সব দেখতে পান। এই জন্যই তাঁরা ত্রিকালজ্ঞ। ভূত, বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই তাঁদের কাছে দৃষ্ট।

জিতেন বলল : এ-সব এক ধরনের উদ্ভট কল্পনা।

বললাম ঃ $E = Mc^2$-ও তো তাহলে উদ্ভট কল্পনা হতে পারে ?

—কিন্তু এবিষয়ে অঙ্কের নির্দিষ্ট solution আছে।

আমি বললাম ঃ আমার বক্তব্যের পক্ষেও সাধু সন্তদের solution আছে। সে solution জানা চাই!

জিতেন বলল : এতদিনে বুঝলাম, সত্যিই তোর মাথাটা বিগড়ে গেছে।

মাথাটা আমার বিগড়েছে, না, যারা তথাকথিত বিশ্বাসে সুস্থ মানুষ তাদেরই বিগড়ে আছে, কে জানে। তবে বর্তমান মনোস্তত্ত্ব এ-সব ব্যাপারে এখন সব চমকপ্রদ তথ্য সরবরাহ করছে যে, এখন প্রচলিত অনেক বিশ্বাসই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমার মাথা যথার্থই বিগড়েছে কি বিগড়ায় নি তার স্পষ্ট উত্তর যে সত্যকে জানতে উদগ্রীব হয়েছি তার স্বরূপ জানা না গেলে বলা যাবে না। শুধুমাত্র এইটুকু বলতে পারি যে, দুধচটির সাধকের মত কোন সাধক দেখলে জিতেনও নিজের কতকগুলি fixed idea-কে পরিবর্তন করতে বাধ্য হত। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বলেছিলেন যে, 'impossibility' বলে কোন শব্দ তাঁর অভিধানে নেই। আমায় মনে হয় অলৌকিক ক্ষমতার সামান্য পরিচয়ও যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাও বলবেন যে, 'incredulity বলে কোন শব্দ জ্ঞানানুন্ধানের অভিধানে নেই।

সপ্তঋষির আশ্রম থেকে আমাদের টাঙ্গা ফিরে চলল। এবার সটান আমাদের সে নিয়ে যাবে—কন্‌খল। কুণ্ডলিনী সাধনা যাঁরা করেন কনখল তাঁদের কাছে একটি বড় স্থান। এখান থেকেই একান্নটি শাক্তপীঠ উৎবের কাহিনী অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞের কাহিনী জন্মলাভ

করেছে। আরও দু'বার আগে যখন হরিদ্বার এসেছিলাম, কন্‌খল দেখে গেছি। একবার এখানে নাথপন্থী এক বিরাট সাধকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার কারো সাক্ষাৎ পাইনি। তবে এই পরম সাধনক্ষেত্রে অনেক সময়ই বড় বড় শৈব ও শাক্ত সাধকের আবির্ভাব হয় শুনেছি। ভাগ্যে থাকলে তবেই তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জানি না আমার কুণ্ডলিনী-কৌতূহল চরিতার্থ করতে সে রকম কোন দৈবী আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করার ভাগ্য এবার আমার হবে কিনা।

টাঙ্গা চলেছে। চলতে চলতেই পথিমধ্যে মহারাজ মানসিংহের ছত্রী, নীলপর্বত, কুশাবর্ত, শুমননাথ মহাদেবের মন্দির ইত্যাদি গাড়োয়ানের নির্দেশ মত তাকিয়ে দেখে নিলাম। এখানে থামবার তারো যেমন ইচ্ছে নেই, আমাদেরও নেই। অবশেষে গাড়ি এসে থামল কন্‌খলে।

কন্‌খলের পেছনে একটা কিংবদন্তীর ঐতিহ্য একে বিশেষ মহিমায় উন্নীত করেছে। সতীর মন্দিরের দেয়ালের অতি প্রাচীন ছোট ইটও ধূসর ইতিহাসের গন্ধ দেয়। ভাঙা দেয়ালের দরওয়াজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। কন্‌খল মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রাচীন এক বিশাল বটগাছ বিস্তৃত ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ছায়ার প্রান্ত দেশেই দক্ষযজ্ঞকুণ্ডের উপর মন্দির। বটগাছের বাঁধানো চাতালে বহুদিন যাবৎ রক্তাম্বর পরিহিত এক বাঙালী সন্ন্যাসী আছেন। দু' এক পয়সার বিনিময়ে চরণামৃত বিক্রি করেন। কিন্তু অধ্যাত্ম জগতে তিনি কতটা উন্নত জানি না। তাঁর কাছে অধ্যাত্ম উৎকর্ষের কোন ইঙ্গিত পাইনি।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বার কয়েক দেখলাম। খুব বেশি ভিড় নেই। সাধুসন্তও তেমন নেই। সুতরাং মন্দির চত্বরে না দাঁড়িয়ে ঘাটের দিকে গেলাম। বৃক্ষশ্রেণীর নিবিড় ছায়ার নিচে কন্‌খলের ঘাট। ছোট ছোট পাখিরা আপন মনে কিচির মিচির করে কলকণ্ঠ তুলেছে। সব দেখে শুনে একটা স্নিগ্ধ ভাবের শিহরণ জাগে। কনখলের ঘাটে অনেকেই পিণ্ড দান করে। আমি জীবাত্মার অস্তিত্বে

বিশ্বাস করি। প্রেতাত্মাতেও বিশ্বাস করি। কিন্তু পিণ্ড দান করে তাদের কর্মফল থেকে মুক্তি দান করা যায় হেন তত্ত্বে বিশ্বাস করি না। সুতরাং পিণ্ড দিলাম না। শুধু বার কয়েক তাকিয়ে দেখলাম চারদিকে। আমি যাঁদের বেশি ক'রে খুঁজছি, তাঁদের কেউ নেই এখানে। জানি না এবারকার এই বাইরে আসা আমার উদ্দেশ্য অনুযায়ী আদপেই সফল হবে কিনা!

কন্‌খল থেকে ফিরে এলাম সূর্য ডোবার মুখে মুখে। সামান্য কিছুক্ষণ ধরমশালায় বিশ্রাম ক'রে নিলাম। তারপর সন্ধ্যাবেলা আবার বেরুলাম ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে। সকালবেলা ব্রহ্মকুণ্ডের এক দৃশ্য বিকেলে আর এক। সকালবেলার তপস্যা সেরে সে যেন বিকেলবেলা সংকীর্তনে নামে। অনেক সময় সন্ধ্যাবেলার ভিড়ের মধ্যে বড় বড় সাধু মিশে থাকেন। প্রথমবার নীলগঙ্গার বাঁধানো চাতালে এরকম একজন তরুণ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। মনে মনে এরকম কোন সাক্ষাৎ পাবার জন্য প্রবলভাবে আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম।

হরিদ্বার এতক্ষণ পর্যন্ত জিতেনকে আকর্ষণ করতে পারেনি। সন্ধ্যাবেলা মনে হল সেও আকৃষ্ট হয়েছে। না, তার দৈবী সত্তার জন্য নয়, তার মধ্যে জীবনের উন্মাদনা ফুটে ওঠার জন্য।

সন্ধ্যাবেলা ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাট লোকে লোকারণ্য, জীবনের চাঞ্চল্য এত বেশি যে, রাত্রি নেমেছে সে-কথাটা মনেই হয় না। সকালবেলা এত লোক দেখিনি এখানে। এখন যেন তার দ্বিগুণ বেশি লোক। বিপণিশ্রেণীর আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা গঙ্গার ধারে আসতেই হাওয়ার মধ্যে বরফগলা জলের কামড় অনুভব করলুম। তাড়াতাড়ি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলুম।

অধিকাংশ লোকই ব্রহ্মকুণ্ডের চারধারে ভিড় করেছে। মেয়েরা সব পাতার নৌকোয় ফুল আর প্রদীপ ভাসিয়ে দিচ্ছে জলে। এর যে কি গুরুত্ব কে জানে। কোন্ রীতি থেকে এর জন্ম হয়েছে কে বলবে! ঐতিহাসিকেরা তা বিশ্লেষণ করতে পারেন। সাধারণ মানুষের কাছে

এ একটা অভূতপূর্ব বিশ্বাস। সার বেঁধে পাতার নৌকো স্রোতে ভেসে চলেছে, সে সত্যি দেখবার মত দৃশ্য। জিতেনকে বোধহয় এ দৃশ্যটা যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। সে দেখতে লাগল। কিন্তু আমার দৃষ্টি ঘুরতে লাগল অন্যত্র। জনারণ্যের ফাঁকে ফাঁকে আমি খুঁজতে লাগলুম সেই মুখ যে মুখ আমার অতীন্দ্রিয় জগতের এই কৌতূহলের সমস্ত খবর জানে। কিন্তু, না, কোথাও সে মুখের সন্ধান পেলুম না।

দেখি কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় সাহেব মেমও জড় হয়েছে এখানে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের কুসংস্কারের একটা রেকর্ড সংগ্রহ করতে এসেছে ওরা। ওদের ভাবসাব দেখে মনে হয়, ওরা উপভোগ করতে এসেছে, ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসত্তা অনুভব করতে আসেনি। এদেরই কিছু সংখ্যককে হিমালয়ের প্রাঙ্গণে গৈরিক বসন পরে ঘুরতে দেখেছি। বস্তুবাদের অসারতা বুঝতে পেরে ওরা বোধহয় ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম শান্তি খুঁজতে এসেছে। আমার নিজের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে যথার্থই অধ্যাত্ম সত্য আজও টিকে আছে। কিন্তু তা আছে মুষ্টিমেয় কিছু সাধকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যাঁদের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। সমুদ্র যেমন রত্নাকর, অধ্যাত্ম পুরুষদের আকর হল তেমনই এই হিমালয়। হিমালয়ের গিরিকন্দরে লোকচক্ষুর আড়ালে এখনও তাঁরা আছেন। কখনও কখনও কদাচিৎ কাউকে দেখা দেন, যেমন আমি দেখা পেয়েছিলাম দুধচটিতে।

ভাবছি আর খুঁজছি। হঠাৎ মনে হল একটা ঠাণ্ডা হাওয়া আমার কান ছুঁয়ে গেল, যেন ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে গেল—ভুল, ভুল।

কি ভুল! আমি হতচকিত হয়ে ফিরে তাকালুম। কেউ যে আমার পাশে এসে একথা বলে গেল তা মনে হল না। তাহলে!

একপা দু'পা করে আবার ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে এগিয়ে এলুম। আশ্চর্য এক দৃশ্য সেখানে। সন্ধ্যাবেলার হিমেল হাওয়ায় যেখানে চাদর গায়ে দিয়েও কাঁপুনি লাগে, আশ্চর্য হয়ে দেখি কয়েকটি ছেলে খালিগায়ে শিকল ধরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, গঙ্গামায়ের বুকে ভক্তজন নিক্ষিপ্ত কিছু সোনাদানা যদি মেলে।

সামান্য রত্নের জন্য যদি এত কষ্ট করতে হয় তাহাল অমূল্য রত্নের জন্য না জানি কি করতে হবে।

ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি। ভক্তজন ঠায় বসে আছে গঙ্গা মায়ের আরতি দেখার জন্য। উদ্‌গ্রীব হয়ে সকলেই তাকিয়ে আছে। এখনই আরতি আরম্ভ হবে। পুরোহিত ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ঘড়ি ধরে রোজ এখানে আরতি হয়। দেখতে দেখতে শেষ ঘণ্টা বাজল, আরতি আরম্ভ হল।

পাতার নৌকো তখনও প্রদীপ নিয়ে ভেসে চলেছে। সেই রাত্রি বেলাতেও জলের নিচে স্বেচ্ছাবিহারী মাছগুলিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সৌখিন লোকেরা ময়দার ঢেলা জলে ছুঁড়ে দিয়ে মাছেদের তাণ্ডব নৃত্য দেখছে। আরতি দেখার চেয়ে এখানেই তাদের মজা বেশি। জিতেন দেখি সেই খেলায় মেতে উঠেছে। আমার মনে হল পৃথিবীতে মাছেদের মত আমরাও মেতে আছি। মায়ার নানা খেলা আমাদেরও লোভের বশবর্তী ক'রে এমনভাবে নাচাচ্ছে।

আরতি চলল পাকা দশমিনিট ধরে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এখানে আরতি হয়। কাটায় কাটায় শেষ হয়। যতক্ষণ আরতি হল নিষ্পলক দৃষ্টিতে ভক্তজনেরা তাকিয়ে দেখল। প্রদীপের আলোতে যেন ব্রহ্মকুণ্ডের সমস্ত জল আলোকিত হয়ে ছিল এতক্ষণ, সে আলো নিভে গেলে জমাট বাঁধা অন্ধকারে জনারণ্যে ভাঙন ধরল।

ঠাণ্ডা ক্রমশঃ যেন ভারি বোঝার মত চাপ সৃষ্টি করছে। সবাই ফিরে চলেছে হোটেল বা ধরমশালায়। জিতেনকে নিয়ে আমিও ফিরলুম। যা পাবার জন্য এত উদ্‌গ্রীব হয়েছিলুম তা পেলুম না।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই সারা দিনের জন্য পরিকল্পনা করেছিলুম। প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র কয়েক ঘণ্টা হরিদ্বারে আছি। সন্ধ্যাবেলায় আজই লাকসার থেকে পাঠানকোট ধরতে হবে। আজ দিনে দিনেই হৃষীকেশ লছমনঝুলা দেখতে হবে। আরও দুবার এস্থান আমি দেখেছি। লছমন ঝুলার ওপারে গীতা ভবনেও গিয়েছি। সে-সব দেখবার মতন আগ্রহ আমার ছিল না। এবারে আমাকে

এখানে টেনে এনেছ হুধচটির অলৌকিক অভিজ্ঞতা। আর একবার সেখানে আমার যাবার ইচ্ছা ছিল, যত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যই হোকনা কেন।

সুতরাং খুব সকাল সকালই বেরুলাম। বেলা আটটার মধ্যে সিন্ধ্রি হোটেলে ভাত খেয়ে স্টেশনের কাছ থেকে একটা ট্যাক্সি নিলাম। সকালের দিকে লছমনঝুলায় নামিয়ে দেবে, বিকেলে আবার নিয়ে আসবে।

গাড়ি চলল আবার হিমালয়ের প্রাঙ্গণের দিকে। দু'ধারে অরণ্যের ইশারা, তিনদিকে দিগন্তের কোলে হেলানো পাহাড়। বরাবর উত্তর অভিমুখে আমাদের গাড়ি চলল লছমনঝুলার দিকে।

প্রথম বারের সেই স্মৃতির কথা মনে পড়তে লাগল। এপথ দিয়েই এসেছিলাম; অলৌকিক ভাবে এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়ে যাই, যাঁর কথা আমার 'সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে'-এর প্রথম খণ্ডে লিখেছি। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললুম, আবার কি তাঁর সাক্ষাৎ পাব না?

গাড়ি চলেছে, সভ্যতার ক্রমপ্রসারিত হাতের বাইরে মুক্ত প্রকৃতি ধীরে ধীরে প্রবল হচ্ছে। সভ্যতার কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্ত থাকার জন্যই এত অপরূপ লাগে হিমালয়ের আঙিনাকে। চতুর্দিকে তাকিয়ে আমি আবার চুপ হয়ে গেলুম। কেবলই মনে পড়তে লাগল, এই পথে গতবারও গিয়েছিলাম।

বেলা সাড়ে নয়টাতে গাড়ি এসে থামল লছমনঝুলার ব্রীজের কাছে। ঝোলার ব্রীজে সেই বিদ্যুৎ চমক। ওপারে প্রাচীন ভারতের তপোবন। নিচে সুনির্মল জলস্রোত। অজস্র মাছের খেলা। নবাগন্তক যারা এখানে তাদের চোখে বিস্ময়েব সীমা নেই।

আমাদের নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সিওয়ালা চলে গেল; বেলা চারটেয় সে হৃষীকেশ ঘাটে এসে দাঁড়াবে।

কম্পিত ব্রীজ বেয়ে ওপারে এসে দাঁড়ালুম আমি আর জিতেন। জিতেনের মধ্যে একটু একটু ছেলেমানুষিও আছে। ব্রীজের এক পাশে বসা ছেলেদের কাছ থেকে খাবারের ঢেলা কিনে নিয়ে তাই

নিচে ফেলে দিয়ে মাছেদের খেলা দেখতে লাগল। মনে মনে ভাবলুম, আমাদেরও যে এমন ক'রে একজন অদৃশ্য খেলোয়াড় মায়ার ঢেলা ছুঁড়ে দিয়ে খেলাচ্ছেন জিতেন কি তার খবর রাখে! মাছগুলো উপরের মানুষকে দেখতে পায় কিনা কে জানে, কিন্তু আমি সেই অদৃশ্য মায়াবিকে দেখতে চাই।

ঢেলাগুলো ফুরালে জিতেন ব্রীজ থেকে নামল। কিন্তু মায়ার ঢেলা যিনি ছড়ান তাঁর ঢেলা বোধহয় কখনও শেষ হয় না।

ব্রীজ পার হয়েই খাড়াই অলকনন্দার পারে একটি চটি। জিতেনকে নিয়ে সেখানে এসে আমি একটু বসলাম। চটির মধ্যে বহু দূরাগত একটা রহস্যময় ধ্বনি শুনতে পাই যেন আমি। বসে বসে ধূসর এক ইতিহাসের সন্ধান করতে লাগলুম। যখন মহাপ্রস্থানের এই পথে পায়ে হেঁটে ছাড়া অগ্রসর হবার আর উপায় ছিল না তখন অগণিত কত তীর্থযাত্রী এখানে এসে বিশ্রাম ক'রে গেছে সে কথা কল্পনায় আনতেও কেমন রোমাঞ্চ বোধ হয়।

চটির অনেক নিচে গিরিপথে গঙ্গা। ঊর্ধ্বে পাহাড়। চটির দেওয়ালে হিজিবিজি আঁকা। এ সব হিজিবিজি হয় তো একালের চঞ্চলমতি ছেলেদের কাজ। গতবার আমার সামনে একটি ছেলে এর দেয়ালে নিজের নাম লিখেছিল। নাম দুলাল ভৌমিক। হিজি-বিজির আড়ালে সেই নামটা খোঁজার চেষ্টা করলুম। পাওয়া গেল না, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ঠিক এমনি করে জগতের কত মানুষ যে নূতন মানুষের আড়ালে ডুবে যাচ্ছে, কে জানে!

জিতেন একটা সিগারেট ধরিয়ে মৌজ ক'রে দুটো টান দিয়ে বলল: এবার কি করবি?

বললাম: চল পায়দলের পথে পুরানো মহাপ্রস্থানের পথটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

জিতেন বলল: তোর যত উদ্ভট খেয়াল। পুরনো পরিত্যক্ত জিনিসের প্রতি তোর যে এত আকর্ষণ কেন তাই ভাবি।

কেন যে আকর্ষণ, বিশেষ ক'রে এই পথটার জন্য, জিতেন তা বুঝবে

না। সে কথাটা তাকে না বলে অন্যভাবে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলাম। অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য দুই ধারে, চল দেখবি। দেখবি হিমালয়ের পাহাড়ী লোকেরা কি রকম।

কি একটু ভাবল জিতেন। তারপর সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল : চল্।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। যে-জিতেন একটা স্টপের জন্য ৪০, ৫০ পয়সা ব্যয় করে—তবু পায়ে হাঁটে না—সে যে এতটা পথ হাঁটতে রাজি হবে—বুঝতে পারিনি। এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের জন্য আমার মনে হল হয়তো বা এবারও ওখানে কিছু পেয়ে যেতে পারি।

বৃক্ষশ্রেণীর নিবিড় ছায়া ভরা পথ। চলে গেছে বহুদূর। ছোট ছোট পাহাড়ী ঘর। শূওর গরু চরে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে। এঁকে বেঁকে গভীর পাহাড়ের মধ্যে গেছে পথ।

হাঁটছি। হাঁটছি আর মানসলোকে ধূসর কল্পনার আলপনা রচনা করছি। বহু তীর্থযাত্রীর নীরব চরণ সম্পাত আজও যেন মুখর হয়ে আছে এখানে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি হাজার হাজার তীর্থযাত্রী চলেছে মানসলোকের সন্ধানে।

চলেছি। অরণ্য ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে। পাষাণের বুক ভেদ ক'রে জীবনদাত্রী গঙ্গা নেমেছে মর্ত্যের পথে। ফেনিল নীল তরঙ্গোচ্ছ্বাস। যতই দেখছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি। অবাক হচ্ছি এই দেখে যে, জিতেনও মুগ্ধ হচ্ছে। কোন রকম প্রতিবাদ না ক'রে, কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে সে হাঁটছে।

অপূর্ব দৃশ্য। হরিদ্বারের কৃত্রিম গঙ্গার শোভাকে—প্রকৃতির এই সৃষ্টি হার মানিয়েছে। কে যেন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পাহাড়ের দুই তীর ছেঁটে দিয়েছে। মসৃণ তীর। তার মধ্যে নীল গঙ্গা প্রবাহ। এখানে বোধহয় লোকে প্রবল এই জলধারাকে গঙ্গা বলে না, বলে অলকনন্দা। ওপারে পাহাড়ী পথ। ওপথে বাস লরি প্রাইভেট কার চলেছে। দেবপ্রয়াগ হয়ে ওরা যাবে—বদ্রীনাথের দিকে।

আজ আর পায়দলের পথে দীর্ঘশ্রমের ক্লান্তি সহ্য করতে হয় না যাত্রীদের। তবে হিমালয়ের তীর্থপথে অরণ্যের ছায়ার আড়ালে পায়দলের পথে চলার যে কী অপূর্ব উন্মাদনা এপথে পদব্রজী যাত্রী ছাড়া আর কেউ তা বুঝবে না।

হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা। প্রশস্ত পথ হলেও ক্রমশঃ সে ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। বুঝলাম জিতেন এবার হাঁফিয়ে উঠেছে। তবু হিমালয়ের যে বিপুল সৌন্দর্যরাশী তার চিত্ত হরণ করেছে তাতেই ক্লান্তির কথা সে ভুলে গেছে। আমার তো কথাই নেই। এমন অনবদ্য অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য যদি চোখের উপর থাকে তাহলে অনন্তকাল চললেও ক্লান্তি আমার বোধ হবে না।

একটি পাহাড়ী ছেলে সওদা নিয়ে ফিরছিল—জিতেন তাকে জিজ্ঞাসা করল—ইধার চটি কিত্‌না দূর হ্যায়?

ছেলেটি বলল: থোড়া দূর, মেরে সাথ আইয়ে।

থোড়া দূর মানে তখনও অর্ধক্রোশ অর্থাৎ এক মাইল। এক মাইল পরে দুধচটি।

অজস্র ফুল, বন্যঘাস, শালপিয়াল। অরণ্য যেন দুই হাত বাড়িয়ে ডাকছে। জিতেন প্রেমেন্দ্র মিত্রির 'হেইডি হাইডি' আবৃত্তি করতে লাগল। আবৃত্তি শেষ হতে বলল: পাহাড়ীদের কাছে যেপথ অত্যন্ত সহজ, শহরের মানুষের কাছে তাই যেন দুর্গম।

বললাম, আমাদের ট্রাম বাস যেমন ওদের কাছে ভয়াবহ।

—'তা ঠিক।' জিতেন আরও একটি সিগারেট ধরাল।

আরও আধক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর তবে দুধচটির দেখা মিলল।

জিতেন আর পারল না। সামনের চায়ের দোকানটাতে বসে পড়ল: আঃ!

বসলুম আমিও। বাঁপাশে গভীর গিরিখাদে খরস্রোতা অলকনন্দা। ডানপাশে গগনচুম্বী পাহাড়ের শীর্ষদেশ। নানা ফলফুল আর অরণ্যে ছাওয়া। সেখানে দুগ্ধফেননিভ পুঞ্জ তুলে প্রবল বেগে ঝর্ণা নামছে

নদীর বুকে। মনে হয় যেন দুধ পড়ছে। এরই জন্য এ চটি দুধচটি'
নামে বিখ্যাত।

এখানে ঝর্ণার মুখে বাঁধানো ঘাট। পাশেই ছোট একটি চটি। চটির চারধারে পাহাড়ী বস্তি। ছোট ছোট দু-একটা চায়ের দোকান। ছেলেমেয়েদের সেখানে নিঃসঙ্কোচ অবাধ গতি। কী রঙ। যেন দুধে আলতায় মেশানো। অপূর্ব সব পাহাড়ী শিশুর ছড়াছড়ি। মেয়েদের মুখ যেন পাথর কুঁদে আঁকা। চৌলুক্য শিল্পীদের ধ্যানেও এত সুন্দর মুখ ধরা পড়েছিল কিনা কে জানে!

জিতেন দেখি অবাক হয়ে দেখছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

জিতেন বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

বললুম, চায়ের অর্ডার দে, আসছি।

আমি যে পথ দিয়ে এসেছিলাম—সে পথেই আবার ফিরে গেলাম। গতবার ফেরার পথে এখানেই ডান দিকে পাথর দিয়ে তৈরি করা ছোট একটি ঘরে—সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহা-পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

দূরত্বটা ছিল কয়েক ফার্লং মাত্র। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও সেই পাথরের ঘরটির আর কোন সন্ধান পেলাম না। কিন্তু সে ঘর গেল কই? —সে-সব কিছুই নেই। মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম। দুধচটির চায়ের দোকানে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ালাম। হঠাৎ এমন সময় পেছনে ঝরা শুকনো পাতার উপর কিসের একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলাম যেন। আমার মনের মধ্যে অসম্ভবের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে ঘুরে, ফিরে তাকালাম। কিছু নেই। তাহলে? অকস্মাৎ অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলাম। ঠিক সেই জায়গাটা থেকে যেন চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের মত একটি আলোর রেখাকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কিসের এ আলো ঠাহর করতে গিয়ে আরো আশ্চর্য হলাম। আলো কোথায়? এযে জ্যোতির্ময় এক সাপ। বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। এহেন অভূতপূর্ব সর্প দেখে বিস্ময়ে

আমি হতবাক হয়ে গেলুম। কি করব বুঝতে পারলুম না। সাপটার দুই চোখে যেন দুটো উজ্জ্বল হীরের টুক্‌রো বসানো। সেই উজ্জ্বল হীরক সদৃশ চোখের মণিতে সে আমাকে তাকিয়ে দেখল, তারপর আস্তে আস্তে নেমে সির্‌সির্‌ ক'রে মুহূর্তের মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

এদৃশ্যের অর্থ কি আমি জানি না। সাধারণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মন একে নিছকই একটি স্বাভাবিক আরণ্যক ঘটনা বলে মনে করত। কিন্তু আমার যেন কেন কেবলই মনে হতে লাগল, না, এর অন্য কোন অর্থ আছে। এ নিশ্চয়ই কুণ্ডলিনী সন্ধানের ক্ষেত্রে আমার জীবনের আর একটি অধ্যায়। ভবিষ্যৎ এ ইঙ্গিতের অর্থ স্পষ্ট করবে।

ফিরে এলাম। এসে দেখি চা তৈরি হয়ে গেছে। জিতেন বলল : মুহূর্তের মধ্যে আবার কোথায় গেলি ?

কোথায় গিয়েছিলাম, কেন, এ-কথা তাকে আর বললুম না। চা খেয়ে নিলুম। জিতেন জিজ্ঞেস করল : এবার ?

বললুম, এবার ফিরতে হবে, চল।

ফেরার পথ ঢালু। উঠতে যত কষ্ট হয়েছিল নামতে তত নয়। দুধচটিতে আসতে যত সময় লেগেছিল নামতে তার অর্ধেক সময় লাগল। ফিরে এলাম আবার সেই লছমনঝুলা ব্রীজে। ব্রীজের ধারে কয়েকটা মন্দির। আমার আর তত আগ্রহ ছিল না। কিন্তু এবার দেখি জিতেনের আগ্রহ বেড়েছে। মন্দির কয়টিও ঘুরে দেখল সে। এরপর পাহাড়ী পথ ভেঙে যেতে হবে হৃষীকেশ, কালী কমলীওয়ালার আশ্রম আর গীতা ভবন। ওধারে গঙ্গার অপর পাড়ে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

অরণ্যভরা পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দু'মাইল পথ আমরা অতিক্রম ক'রে গেলুম। পথের শেষে বাবা কালী কমলীওয়ালার আশ্রম দেখে গেলুম গীতা ভবনে। গীতা ভবন থেকে এ অঞ্চলের দৃশ্যকে আরও সুন্দর দেখায়। কিছুক্ষণ এখানে থেকে ঘাটে ফিরে এলুন। জিতেনের পথে খিদে পেয়েছিল। ঘাটের কাছে রেস্টুরেণ্টে

কিছু খেয়ে নিল। তারপর অপেক্ষমান লঞ্চে চেপে ঘাট পার হলুম।

গাড়ি ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে চাপলুম। এ পারে ছোট একটা মন্দির দেখিয়ে গাড়ি ছুটল হরিদ্বারের দিকে। হরিদ্বারে গিয়ে বিশ্রাম পর্যন্ত করা হবে না। হরিদ্বারের মনসা পাহাড় আর চণ্ডী পাহাড় এ যাত্রায় আর দেখা হবে না। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আজ বিকেলেই ফিরতে হবে লাক্‌সার। সেখান থেকে পাঠানকোট এক্‌সপ্রেস ধরে—পাঠানকোট। তারপর শ্রীনগব উপত্যকার দিকে যাত্রা।

তিন

হরিদ্বার থেকে লাক্‌সার এসে পৌঁছুলাম সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। পাঠানকোট লাক্‌সার এসে থামবে রাত নটায়। আমাদের রিজার্ভেশন নেই। সারারাত বসেই যেতে হবে। তবে শুনেছি তেমন ভিড় হয় না। একজন কুলির সঙ্গে ব্যবস্থা করলুম একটা সুবিধাজনক কামরায় উঠিয়ে দেবার জন্য।

যে প্রেরণা নিয়ে বেরিয়েছিলুম, সে প্রেরণায় আমার ভাটা পড়ছে। কাশ্মীরের জন্য আমার তেমন আগ্রহ নেই। দেবভূমি হরিদ্বারেই যখন কারো সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না তখন কাশ্মীরে আর কি পাব? কাশ্মীর ভোগের জায়গা, ত্যাগের জায়গা নয়। যদিও সে ভূ-স্বর্গ, সে হল সুখের স্থান, শান্তির স্থান নয়।

কুলকুণ্ডলিনীর সন্ধান করতে করতে ইতিমধ্যে আমার একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, জীবনের ঘটনা সব নির্দিষ্ট হয়ে আছে। মানুষের প্রাক্তন কর্মফল তার ভবিষ্যৎ জীবন নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছে। এবার বেরুবার সময় আমার ধারণা ছিল হরিদ্বারে কিছু পাব। পাব বলেই বহুদিন পরে আবার সেখানে যাবার জন্যে টান পড়েছে। কিন্তু

আমার সে বিশ্বাস যেন প্রচণ্ড রকমের একটা আঘাত পেল। তবে আবার ভাবলুম, হয়তো কিছু পেয়েছি। যার অর্থ ধরতে পারিনি। অমন জ্যোতির্ময় সর্প ঐ ভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতাতে তো কেউ কখনও দেখেনি। এরও নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে। হয়তো ওটা আসলে কোন সর্পই নয়। কোন দৈবী সত্তা; আমাকে কিছু ইঙ্গিত দিল। ঐ ইঙ্গিতের অর্থ আমার নিজের চেষ্টাতেই আমাকে ধরতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়েই 'পাঠানকোট' এসে থামল লাক্সারে। মাত্র দশ মিনিট দাঁড়াবে এখানে। গাড়ির অবস্থা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলাম। ভিড়ে ভিড়াকার। ফুটবোর্ডেও পা রাখা যাবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। জিতেন বলল: কি হবে রে?

বললাম: কিছু একটা করতে হবেই।

অনেক চেষ্টা ক'রে একটি কামরায় কোনরকমে ঠাঁই করলুম। কিন্তু বসবার কোন ব্যবস্থা নেই। দরজার সামনে একটু জায়গা ছিল সেখানে বিছানার হোল্ডিং ফেলে তারই ওপরে কোন রকমে বসলুম।

জিতেন তখন ঘামছে। বিমর্ষ মুখে সে একটা সিগারেট ধরাল। আমি মনে মনে ভাবলুম, ভোগের রাজ্যে সুখের সাধনার জন্য এ-ভাবেই কষ্ট করতে হয়।

গাড়ি ছাড়ল। এভাবে বসে থাকতে পারলেও একটা কথা। যাতে সুখের সন্ধানের খেসারৎ এর চাইতে বেশি দিতে না হয় সে আশঙ্কাই করতে লাগলুম

প্রায় দু'ঘণ্টা নিরাপদে কাটল। রাত এগারটা নাগাদ গাড়ি এসে থামল সাহারানপুর। ভেবেছিলাম, চাপ বোধহয় আর বেশি হবে না। কিন্তু সাহারানপুর এসেই বোঝা গেল আমাদের ক্যালকুলেশনের কোন ভিত্তি নেই। পিঁপড়ের দঙ্গলের মত স্টেশনে শুধু লোক আর লোক।

জিতেন শিউরে উঠল: এরা এ গাড়িতে উঠবে নাকি?

ওকে স্তোক দেবার জন্য বললুম, হয়তো ভিন্নগাড়িতে উঠবে।

কিন্তু আমার স্তোকবাক্যকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে সকলে এগাড়িতেই

উঠতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি কানায় কানায় ভরে উঠল। যেন প্লাবনের জল এসে ডোবা নালায় পড়ছে। নিরীহ কয়েদীর মত লোকের আড়ালে বাক্সপেঁটারার উপর বসে রইলুম। জিতেনের সিগারেট ঝাড়বার জায়গা পর্যন্ত রইল না। সে রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ল।

ভোগ মানেই দুর্ভোগ, সুখ মানেই দুঃখ। এর একটা না থাকলে আর একটা হয় না। ভোগের রাজ্য ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে যাবার জন্য সেই জন্যই বুঝি খেসারৎ দিতে হচ্ছে।

কষ্টে আমার কষ্ট নেই। আমার যে কষ্ট হতে লাগল তা মানসিক। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে যে অন্তরের সঙ্গে কথোপকথন উপভোগ করব সে পথও রইল না। এটাই আমার মানসিক বেদনার কারণ হতে লাগল।

রাত নটা নাগাদ গাড়ি এসে থামল আম্বালা ক্যান্টনমেণ্টে। ভাবলুম, কিছু লোক নামবে। নামল তো নাই, বরং এরই মধ্যে কিছুলোক ঠেলেঠুলে উঠে পড়ল। মনে হল এবার নিঃশ্বাস পর্যন্ত নেওয়া যাবে না। Blackhole Tragedy ঘটে না যায় এমন মনে হতে লাগল। ভোগের জন্য কি কঠিন সংগ্রাম! অথচ হরিদ্বার আসতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি।

একজন সাধক আমায় বলেছিলেন যে, অধ্যাত্মপথের পথিক যদি পার্থিব সুখের সন্ধান করে তার দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। আমি 'অধ্যাত্ম পথের পথিক' একথা বলবার স্পর্ধা নেই, তবে অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কে আমার প্রবল আগ্রহ আছে। হয়তো অদৃশ্য বিধাতা সেই জন্যই আমায় বুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে, ভোগের স্বর্গ ভূস্বর্গ আমার জন্য নয়। কাশ্মীর উপত্যাকা কখনই আমার অভীষ্ট হতে পারে না।

রাত দুটো নাগাদ এলুম লুধিয়ানা, লোক উঠলও না, নামলও না। সেই আড়ষ্টভাব। হাত পা গুটিয়ে বসে রইলুম। জিতেনকে দিখলুম নির্বাক। হেন দৃশ্য এবং অভিজ্ঞতাতে তার বাক হারিয়ে

গেছে। বিশেষ ক'রে ধুমপানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে তার বোধহয় চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে গেছে। সে যে আমায় কিছু বলবে, তারও উপায় নেই, কারণ শ্রীনগর উপত্যকার পরিকল্পনা তার, আমার নয়, আমি বরং কোন তীর্থস্থানের কথা বলেছিলুম। আমার অভিষ্ট একমাত্র তীর্থস্থানেই মিলতে পারে।

যে অবর্ণনীয় কষ্ট যেতে লাগল তা কহতব্য নয়। মৃত্যুযন্ত্রণা এর চাইতে অধিক কিনা জানি না। ভাবতে লাগলুম, এ থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি।

মাঝখানে দুটো স্টেশন গেল—দিল্লাউর এবং কাগোয়ারা। ভিড়ের চাপ একটুও কমলা না। ভোরবেলা গাড়ি এসে থামল জলন্ধরে। এবার যেন জনচাপ একটু নরম হল। বেশ কিছু লোক নেমে গেল এখানে। বেশ কয়েক প্রহর পরে অক্সিজেন ভরা ঠাণ্ডা হাওয়া ফুসফুসে নিলুম। অবশ্য সে অক্সিজেনকে উপেক্ষা ক'রে জিতেন বুকভরে নিল নিকোটিনের ধোঁয়া।

জানালার সামান্য ফাঁক দিয়ে বাইরে কিছুটা দেখা যায়—সেটাই যা একটু স্বস্তি। আমি বাইরে তাকালুম। পাঞ্জাবের বুকের উপর দিয়ে চলেছি। দেশটার প্রকৃতি কি রকম সামান্য একটু হদিস না করতে পারলে চলবে কেন। কিন্তু এখনো কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। পাঞ্জাবে বেশ কুয়াশা-কুয়াশা ভাব। অদ্ভুত রহস্যময় আচ্ছাদনে মাঠঘাট ঢেকে আছে।

সাড়ে ছ'টায় গাড়ি এসে থামল মুকোরিয়ান স্টেশনে। কুয়াশা কেটে এবার পাঞ্জাবের মাঠঘাট দেখা যাচ্ছে। আমি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। শরীরটা যেন ব্যথা করছে। করুক, তবু দেখতে হবে। কালোয়-লালে মেশানো মাটির রঙ। বোঝা যায় বেশ উর্বর। কিছু কিছু ক্ষেতে শস্য আছে। অধিকাংশ শস্যই কর্তিত হয়েছে। চাষ চলেছে। গরু মোষ ঘোড়া সবই ব্যবহৃত হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। দু-এক জায়গায় ট্রাকটরও দেখতে পেলাম। মাঝে মাঝে ডোবা নালা খাল। কোথাও মরা নদীর রেখা। মাঝে মাঝেই

কাঁশবন। দূরে দূরে দু' একটা প্রাচীন ইমারত দেখা যাচ্ছে। দু একটা পরিত্যক্ত মসজিদ। স্থাপত্যশিল্পে ইসলামী ঢংটাই বেশি। আর্যরা যখন ভারতে আসেন তখন পাঞ্জাবই ছিল তাদের প্রথম বাসভূমি। পরবর্তী কালে মুসলমানদের প্রথম বাসভূমি হয় পাঞ্জাব। বহু ঐস্‌লামিক ইতিহাসের অভিনয় হয়ে গেছে পাঞ্জাবের উপর। ঐস্‌লামিক স্থাপত্যের নিদর্শন এখানে থাকা অসম্ভব নয়।

মাঠঘাট পেরিয়ে গাড়ি চলেছে। দু'ধারে বাড়িঘর পেছনে পড়ে যাচ্ছে। ক্রমশঃ পাঠানকোটের দিকে এগুচ্ছি। দূরে হিমালয়ের রেখা। হিমাচল প্রদেশ সমতল ভূমি থেকে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবির মত সব দেখা যায়। কি একটা নদী পার হলাম। তারপর কয়েকটি মাঠ গ্রাম আর পথ পার হয়ে এলাম শহরের সীমানায়। কষ্টের লাঘব হচ্ছে। একটু দূরেই পাঠানকোট।

বেলা আটটা নাগাদ গাড়ি এসে থামল পাঠানকোটে। গাড়ি লেটে রান করছিল। পাঠানকোটের আগেই যাত্রীরা সব নেবে গেছে। শুধু কাশ্মীর ভ্রমণেচ্ছু যাত্রীই রয়েছে। ভ্রমণবিলাসীরা এতদূরে কেউ সিট রিজার্ভ না ক'রে আসেনি, আমরাই শুধু উৎকট বিলাসী বলে হেন দুষ্কর্মের ঝুঁকি নিয়েছি।

জিতেনের চোখে এতক্ষণে একটু স্বস্তির ভাব দেখলাম। বহু সংগ্রামের পর লোক যখন পার্থিব আকাঙ্ক্ষার বস্তু লাভ করে তখন এমনি একটা স্বস্তি ও আনন্দের ভাব তাদের মধ্যে দেখা দেয়।

জিতেন দীর্ঘক্ষণ পরে উঠে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে বলল, এমন মৌন নিশ্চল আসনে মুনি ঋষিরাও ধ্যান করেছেন কিনা সন্দেহ। নরমুণ্ডের আসনে বসে তন্ত্র-সাধনায় যদি ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তবে বিছানার হোল্ডিং-এর উপর বসে যোগাভ্যাসে কাশ্মীরের দেখা পাওয়া যাবেই। তাই শেষ পর্যন্ত পাঠানকোট এসে পৌছুলুম।

বললুম : কিন্তু এ যোগাভ্যাসে যা লাভ করা যাবে তা নিতান্তই তাৎক্ষণিক। কিন্তু শবাসনের তন্ত্রসাধনায় যা লাভ করা যাবে তা চিরকালের।

জিতেন বলল : থাক, থাক, আর লেকচার দিতে হবে না। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে তো লিখছিস তন্ত্রসাধনার নামে। সাধনার ফল যে কি, তাতো হরিদ্বারে দেখে এলি। ভিখারী গোছের কিছু সন্ন্যাসী এইতো! এত সাধনার পর মানুষের কাছেই হাত পাততে হয়।

বললুম : সাধকের মত সাধক দেখিসনি, তাই।

জিতেন বলল : সাধকের প্রয়োজন নেই, এবার পাঠানকোটের দিকে তাকা।

গাড়ি এসে স্টেশনে ইন করল। যেন চন্দ্রলোক পরিভ্রমণ ক'রে বহুদিন পরে মাটির পৃথিবীতে ফিরে এলুম এমন ভাব। মাটিতে পা দিয়ে মনে হল, যেন সারা দেহ দুলছে। এই মুহূর্তে আর নতুন যাত্রার ঝুঁকি নেওয়া যায় না। একদিন পাঠানকোটে বিশ্রাম নিতে হবেই।

পাঞ্জাবের অধিকাংশই বার হোটেল। অন্ততঃ পাঠানকোটে তাই দেখা গেল। আমরা ঠিক এমন হোটেলে থাকতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু কোন উপায় নেই। এখানে তীর্থাভিলাষী যাত্রীদের মনের মত কোন স্থান নেই। ফলে একটি হোটেলেই উঠতে হল।

গতরাত এক নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে। ঘুম নেই। তার উপর ভদ্রতাবোধশূন্য যাত্রীদের কনুইয়ের আঘাত, জুতোর চাপ আর দেহের ঠেলা-ঠেলি। তাই খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরটা বেশ নিবিড়ভাবে ঘুমিয়ে নিলুম।

ঘুমের মধ্যে আমি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলুম। পাহাড়ের একটা চূড়া। পেঁজা তুলোর মত শ্বেতশুভ্র বরফ পড়ছে। বরফ পড়তে পড়তে মুহূর্তের মধ্যে প্রান্তরটা তুষার শুভ্রতায় ভরে গেল। ঝলমল করছে তুষারের শ্বেতশুভ্রতা। অদ্ভুত এক হাল্কাভাব বোধ করছি শরীরে। কেন যেন ভালও লাগছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘুম ভেঙে গেল।

কেন দেখলাম, কি দেখলাম, ঠাহর করতে পারলাম না। স্বপ্নকে ফ্রয়েডীয়রা বলেন অবদমিত ইচ্ছার শিল্পময় প্রকাশ। মনের

আকাঙ্ক্ষা আর অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটে সেখানে। কিন্তু তুষারশুভ্র পাহাড় বা পর্বত সম্পর্কে আমার পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাহলে আমার মনের মধ্যে এ সম্পর্কিত আকাঙ্ক্ষা থাকবে কি ক'রে? তবে মনোবিজ্ঞানীরা আজ মনে করেন যে, নানা জন্মের অভিজ্ঞতা ক্রমবিকাশের স্তর বেয়ে প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে চলে এসেছে। ব্যক্তিগত জীব মরণশীল। কিন্তু যে অনির্বাণ প্রাণপ্রবাহ চলেছে তা একটি ধারায় ক্রমবর্ধমান। স্বাতন্ত্র্যহীন ভাবে সেই ধারার মধ্যে ক্রমবিকাশের পথের নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে আছে। হয় তো মানবজীবনের পথে ক্রমবিকাশের ধারাতে কোন সময় আমরা তুষারমানব ছিলাম। তাদের সংস্কার রক্তের কণিকার মধ্যে জড়িয়ে থেকে আমাদের অজ্ঞাতেই বাসা বেঁধে আছে। হয়তো সেই প্রাচীন কোন অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন।

চা পর্ব শেষ করার পর জিতেন বলল: চল, একটু ঘুরে দেখে আসি। হরিদ্বারে কিন্তু এধরনের আগ্রহ জিতেনের মধ্যে দেখা যায়নি। হয়তো চরিত্র অনুযায়ী পাঞ্জাবের এই পরিবেশ ও জীবন জিতেনের ভাল লেগেছে।

চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। পাঠানকোটের ঘনঘিঞ্জি রাস্তা কর্মব্যস্ত লোকের ভিড়ে সর্বদা সরগরম। সত্যি পাঞ্জাব কর্মজীবনের এক বিরাট ক্ষেত্র। পথে আসতে আসতে পাঞ্জাবের মাঠে দেখেছি অনলস পরিশ্রম ক'রে যাচ্ছে কৃষকেরা। ট্রেনে স্টেশনে, মাঠে, ঘাটে সর্বত্রই ব্যস্ততা। সবাই কর্মব্যস্ত। পাঠানকোটেও তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল না। অবশ্য পাঞ্জাব বলতে সবাই যে এখানে শিখ তা নয়। হিন্দুও যথেষ্ট। কিন্তু পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম গুরু নানক যে তত্ত্ব প্রচার করেছেন তাতে তো বাস্তবজীবনেব প্রতি এমন আগ্রহ হবার কথা নয়! মানুষ এখানে আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হয়ে কর্মব্যস্ত। কিন্তু শিখ ধর্ম তো এ ধরনের আত্মস্বার্থসম্পন্ন কর্মেরই নিন্দা করেছে। গুরুগ্রন্থ সাহেব-এ আছে:

'সংকীর্ণ আত্মস্বার্থে সে মানুষ নিমগ্ন তিনি জল ব্যতিরেকেই ডুবে

আছেন। এ মানুষের মন হল ভেকের মত এবং তার পাপ হল কাদার মত।'

তবে শিখরা নির্ভেজাল অধ্যাত্মতা দ্বারা ততটা পরিচালিত নয়। গুরুগ্রন্থের চেয়ে গুরুপন্থই এখন তাদের অনুকরণীয়। গুরু গোবিন্দ শিখদের জন্য যে খালসা করেছিলেন তাই এখন শিখদের পরিচালিত করে। পাঞ্জাবের আবহাওয়াই বোধ হয় মানুষকে শক্তিশালী ও কর্মঠ হতে শিখিয়েছে।

পাঠানকোটে সারি সারি দোকান। দোকানে দোকানে ক্রেতার ভিড়ও যথেষ্ট। লেডিস কোট, কম্বল প্রভৃতি গরম পোশাকের ছড়াছড়ি। পশমী বস্ত্রের ক্ষেত্রে পাঠানকোট বোধহয় একটা বড় ঘাঁটি। রাস্তার দু'পাশে পাহাড়ী মেয়েরা 'র' উলের কম্বল, সোয়েটার প্রভৃতি নিয়ে বসে আছে। দাম খুব সস্তা। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের ধারেও এদের দেখা যায়।

ফলের ছড়াছড়ি পাঠানকোটে। মাঝে মাঝেই আপেল আর আঙুর নিয়ে বসেছে লোকে। দামও সস্তা। এত সস্তা যে আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোকে তা কল্পনাও করতে পারি না। পাঠানকোটের কুলি মজুর থেকে সবাই দেখছি ফল কিনছে। আমাদের কাছে যা দামী ফল ওদের কাছে তা হয়তো সাধারণ আহার্য।

তাকিয়ে দেখছি পাঠানকোটের রাস্তার প্রতিটি মোড়। জনারণ্য এখানেও কম নেই। কলকাতারই মত। কিন্তু একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করার মত এই যে, মোড়ে মোড়ে এখানে ছেলেদের আড্ডা নেই। ছোট থেকে বড় সকলেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সামান্য কাজ করতেও এদের আপত্তি নেই। এ জন্যই বুঝি দেশ-বিভাগের আঘাত কাটিয়ে পাঞ্জাব আবার তাড়াতাড়ি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আর পশ্চিমবঙ্গ দিনের পর দিন কুব্জ হচ্ছে। কলকাতা আশী বছরের বুড়ির মত জরাজীর্ণ। পাঞ্জাবে এই কাজের সঙ্গে যদি অধ্যাত্মতার স্পর্শ থাকত তবে এ-দেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ হতে পারত। ভারতবর্ষ কর্মকে অবহেলা করেনি। জীবনকেও অবহেলা করেনি। দুইয়ের

সমন্বয় ঘটিয়েছে। তাইতো এদের জীবন চার আশ্রমে বিভক্ত: ব্রহ্মচর্যে প্রস্তুতি পর্ব, গার্হস্থ্যে ভোগ পর্ব বানপ্রস্থে ধীরে ধীরে ভোগ জীবন পরিত্যাগের চেষ্টা ও সন্ন্যাসাশ্রমে পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। এই জন্যই মানবজীবনের ধারা রচনায় ভারতবর্ষের কথা :— ধর্ম অর্থাৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন অনুসরণ, অর্থ—বাঁচার জন্য সম্পদ, কাম অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ বা মুক্তি।

কর্মব্যস্ত পাঠানকোটের নানাস্থান ঘুরে শেষপর্যন্ত আমরা গিয়ে বাস ডিপোতে উপস্থিত হলুম। সন্ধ্যাবেলাও সেখানে বেশ ভিড়। অল্প যাত্রী এসে আটকা পড়েছে পাঠানকোটে, সকলেই কাশ্মীরের টিকিট কাটতে ব্যস্ত। টিকিট কাটা হচ্ছে জে. এণ্ড. কে ট্রান্সপোর্টে। বাস কর্মীরা ব্যস্ত। কথা বলার তাদের সময় নেই। অ্যাড-ভান্স টিকিটের কোন ব্যবস্থা করা গেল না। ভোরবেলা এসে লাইন দিয়ে টিকিট কেটে বাসে চাপতে হবে। বেলা সাতটার মধ্যেই বাস ছাড়বে। ইতিমধ্যে পাঠানকোট এক্‌সপ্রেসও এসে পড়বে।

সকালবেলা লাইন দিয়ে এসে টিকিট কাটলুম। জিনিসপত্র নিয়ে একেবারে তৈরি হয়েই এসেছিলুম। কেন যেন বিশ্বাস জন্মেছিল যে টিকিট পাব। আমাদের লাইনে এক ভদ্রলোককে দেখলাম। সমস্ত কিছু বিচার করলে একজন যে সুপুরুষ তা নয়। কিন্তু তাঁর দেহে অদ্ভুত এক গ্লেজ। আমার সঙ্গে যতবারই চোখে চোখে হল ততবারই দেখি তিনি হাসছেন' যেন আমাকে চেনেন এমন ভাব। কিন্তু আমি কিছুতেই স্মরণে আনতে পারলুম যে, ভদ্রলোক কে বা আগে কোথায় তাঁকে দেখেছি। কোথাও তাঁকে দেখেছি বলে মনে হল না।

জে. এণ্ড. কে. ট্রান্সপোর্টের বাসগুলো কলকাতার স্টেটবাসের মত দেখতে। টুরিস্ট বাসের জন্য ভেতরে সামান্য একটু কমফোর্টের ব্যবস্থা। এতবড় বাস পাহাড়ের গা বেয়ে শ্রীনগর উপত্যকায় উঠবে, ভাবতে কেমন আশ্চর্য লাগল। কয়েকবার দার্জিলিং গিয়েছি.

সেখানে পাহাড়ে ওঠার জন্য ছোট ছোট জীপ আছে। বড় গাড়ি সেখনে যেতে পারে না।

আমরা বাসের মাঝখানটায় সিট পেয়েছিলাম। সেই ভদ্র লোককে দেখলুম পেছনের সিটে বসেছেন। চোখে চোখে হতে আবার হাসলেন তিনি। সত্যি ভদ্রলোকের মধ্যে অদ্ভূত এক আকর্ষ-ণীয়তা আছে।

যাত্রীদের চালচলন, চেহারা ও পোশাক দেখে মনে হল সাধারণ ঘরের নয়। ভোগের রাজ্য কাশ্মীরে সাধারণ লোক এত ব্যয় ক'রে আসবেই বা কি ক'রে। যাত্রীদের চেহারা দেখে মনে হল কাশ্মীরে যাওয়া আমার পক্ষে বৃথা। কারণ এ ভোগের রাজ্যে আমি যা খুঁজছি তা পাওয়া যাবে না।

ভাগ্য ভাল, জানালার ধারের আসনটাই আমার। চলতে চলতে অন্ততঃ প্রাকৃতিক দৃশ্যটা উপভোগ করা যাবে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই গাড়ি ছাড়ল। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গাড়ি বেরল হাইওয়েতে। পথের দু'ধারে অজস্র দীর্ঘ কাশবন। মাঝে উদ্যত শালের চারা। আরো অন্যসব কি গাছ। পথ কখনও ঢেউ-খেলানো আকারে দেখা দিচ্ছে। কোথাও উঁচু, কোথাও ঢালু। আমাদের সামনে যে পার্বত্য প্রদেশ এ-সব তারই ইশারা। পাঠানকোট থেকে জম্মুর সীমান্ত খুব দূরে নয়। ডান দিকে হিমাচল প্রদেশের ছায়া।

নতুনের চিরকালই একটা ভিন্ন আকর্ষণ থাকে। তার উপর চলন্ত কোন যানবাহনে বসে যদি তাকে দেখা যায় তবে তো কথাই নেই। কাশ্মীর যাত্রার প্রারম্ভের পথ দেখে আমার শিলিগুড়ি থেকে হিমালয়ের পাদদেশের কথা মনে পড়তে লাগল।

তবে পার্থক্যও আছে। শিলিগুড়ি থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত অঞ্চলে পথের দুইধারে অরণ্যের যে ইশারা তা সজল, শ্যামল। কিছুটা সামঞ্জস্য আছে লাক্সার থেকে হরিদ্বারের পথের অরণ্যের সঙ্গে। পাঠানকোট থেকে জম্মুর দিকে এ-পথের পাহাড়ী অরণ্যের

যে ইশারা লক্ষ্য করা যায় তার চরিত্র পারিপার্শ্বিকের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষ ক'রে বাঁ-ধারে উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে দূরে পশ্চিম পাঞ্জাবের গ্রামরেখা শিলিগুড়ির পথ থেকে এপথের চরিত্রকে ভিন্ন ক'রে দিয়েছে। এরও এক নতুন আকর্ষণ।

কিছুদূর এগিয়েই ছোট্ট বাসস্ট্যাণ্ড মত জায়গায় বাস থামল। সামনেই একটা পেট্রোল পাম্প। এখানে গাড়িটা একটু তেল নিল। ওপাশে দোকান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মোটেই নয়। নোংরা মিষ্টি, বিরাট আয়তন লুচি, কিছু আপেল, বহুদিনের পুরনো কিছু বিস্কুট এই সব।

।ভ্রমণে বেরুলে অনেকেরই খাবার বাতিক চাপে। ভ্রমণের মধ্যে কিছু না কিছু চর্বণ করেই সকলে আনন্দ পান। তাদের চোখ বুঝি দুপাশের চর্বণযোগ্য দ্রব্যগুলি খুঁজে ফেরে। বাসটা এখানে থামতেই দেখি বেশ কিছু লোক ঐ সব দোকানের সামনেই গিয়ে ভিড় জমিয়েছে। মহিলারা এ বিষয়ে অগ্রণী। আমার নিজের ধারণা, অস্থির চিত্ততার জন্যই এমন ঘটে। এই অস্থিরচিত্ততার জন্যই লোকে মদ খায়, উত্তেজনা খুঁজে। কোন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে স্থির থাকতে পারে না বলেই লোকে এমন করে। ভ্রমণের মধ্যে একটু অস্থিরতা আছে। অনবরত ছুটে বেড়ানো যায়। এর ফলে অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি তার চঞ্চল্যের সুযোগ খুঁজে পায়। কিন্তু বাসের মধ্যে সামান্য একটুকু সময় স্থির হয়ে বসে থাকতেই তাদের নানা অসুবিধা হয়। সেই জন্য এরা এমন করে। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ এই অস্থিরতা। এই জন্যই জগৎজুড়ে উন্মাদনা। ব্যক্তিগত জীবনের ভিত্ ধসে গেছে। ইউরোপে ও আমেরিকায় পারিবারিক :জীবন বিপন্ন। আসলে স্থির হয়ে বসার জন্য যে প্রশান্তি তা বাইরে কোথাও নেই। আছে মানুষেরই অন্তরের মধ্যে। মানুষের নিজের মধ্যে সেই স্নিগ্ধ স্থানটুকুর সন্ধান পাওয়ার সাধনাই অধ্যাত্ম সাধনা, কুলকুণ্ডলিনী সাধনা। কিন্তু কে তার খোঁজ করে! আমাদের কুণ্ডলিনী অন্ধ সাপের মত। একপথে গিয়ে বাধা পায়, আবার ভিন্নপথ খুঁজে। যেন নদীর জল, বাধা পেলে ভিন্ন পথ নেয়। নদীর জল তবু এক সময়

না একসময় সাগরের মধ্যে গিয়ে পড়ে নিতান্ত দুর্ভাগা নদীই মরুভূমিতে পথ হারায়। মানুষের আকাঙ্ক্ষা জলের মত শত সহস্রে ধারা হলেও শেষের স্থান খুঁজে নিতে পারে না। যাঁরা পারেন তারাই অধ্যাত্ম পুরুষ নামে পরিচিত।

গাড়ি আবার চলেছে। পথের পাশে তাকিয়ে দেখছি। সুন্দর ঝক্‌ঝকে মসৃণ পথের উপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। দু'ধারে ক্রমশঃ দৃশ্যপটের পরিবর্তন হচ্ছে। ক্রমশঃ পাহাড়ের ছায়া কাছ থেকে কাছে নেমে এল। ডাইনে একটা কলধ্বনি শুনলাম। তীব্র কলস্রোতের এক তরল প্রবাহ চলেছে। একটি ক্যানাল। সুন্দর মসৃণভাবে তার দুই তীর বাঁধানো। একজন সাধকের কাছে শুনেছিলাম কুণ্ডলিনী যদি এমন ঋজু ভঙ্গীতে অগ্রসর হতে পারে তবে সহজেই সিদ্ধিলাভ হয়।

মনে পড়ে গেল পাঞ্জাবের কথা। পঞ্চনদীর দেশ পাঞ্জাব। নানা দিকে তার নালা নদী ও খাল। ফলে পাঞ্জাবের সেচ ব্যবস্থা উন্নত। মাঠ শস্যসমৃদ্ধ। একজনের কাছে জানলুম ক্যানালটির নাম বারি ক্যানাল। কিন্তু এর উৎস কোথায় জানতে পারলুম না।

বাস এগিয়ে চলেছে। আমি অধিকাংশ সময় বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকয়ে আছি। দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টাচ্ছে। ক্রমশঃ ধূসর রুক্ষতা নিয়ে পাহাড় দেখা দিচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে পাঞ্জাব ছাড়িয়ে আমরা জম্মুর সীমানায় প্রবেশ করছি।

কিছুদূর এগিয়েছি, দেখি একদল ভারতীয় ফৌজ নিচে নামছে। কোন লরি, জীপ বা ট্রাক নেই তাদের সঙ্গে। টাট্টু ঘোড়া বা গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে নিচে নেমে আসছে। ইদানীং কালে এমনভাবে সেনা বাহিনীকে চলতে দেখা যায় না। যেন মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা। পরে বুঝতে পারলুম, পাহাড়ী অঞ্চলে বন্যঘোড়া, খচ্চর প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। লরি, জীপ, ট্রাক একটি নির্দিষ্ট পথে চলতে পারে। পাহাড়ের সর্বত্র যাতায়াত করতে পারে না। এইসব ঘোড়া গাধা ও খচ্চরের পিঠেই পাহাড়ী বাহিনী তালিম নেয়।

ভারতের সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ জিনিসটার স্বরূপ বোঝা যায় না। কিন্তু কাশ্মীর একটা আন্তর্জাতিক উত্তেজনার ক্ষেত্র। এইতো সেদিন ১৯৬৫, ৭১ সালে কি কাণ্ডই না ঘটে গেল এখানে! সুতরাং পাঞ্জাব থেকে কাশ্মীরের পথে সামরিক বাহিনীর চলাচল অত্যন্ত স্বাভাবিক। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চীনা হামলার পর সেখানেও এমনি সামরিক তৎপরতা দেখা দিয়েছে। দার্জিলিং-এর জলা পাহাড়ে, বিশেষ করে কালিংপমে এই সামরিক বাহিনীর তৎপরতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্যের ছায়ায় মানুষের সভ্যতা হিংসার উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে মানুষের সভ্যতা বাড়ছে না কমছে বোঝা ভার। আসলে বস্তুগত বিজ্ঞানে জীবন-রহস্যের কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না। এজন্য চাই মানুষের আন্তর সাধনা, অধ্যাত্ম সাধনা।

বাস এগিয়ে চলেছে, আমি দেখছি। পাহাড়ের আকর্ষণ আমি চিরকালই অনুভব করি। অসীম দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের বিস্তার দেখেছি। দেখেছি ক্রুদ্ধকালোনাগিণীর ফণার মত তার ঢেউ। কিন্তু বেশিদিন আমার মনকে সে আটকে রাখতে পারেনি। তবে পাহাড়ে আমার ক্লান্তি নেই। দার্জিলিং-এর পথে জীপে যখন চলেছি অপূর্ব এক মায়া দু'চোখে মুগ্ধতার অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছে। কার্শিয়াং-এর কাছাকাছি আসতেই দেখেছি কুয়াশার খেলা, যে কুয়শা দার্জিলিংকে দিয়েছে অতুলনীয় গাম্ভীর্য, মহান সৌন্দর্য আর নিত্য আকর্ষণী ক্ষমতা।

কাশ্মীরের পথে চলেছি। বাংলাদেশের উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয়ের সবুজ সমারোহ এখানে নেই। ক্রমশঃ রুক্ষ গৈরিক পাহাড় দেখা দিচ্ছে। এর স্বাদ যেন এর বিপুলতার মধ্যে। কাশ্মীরের পথে দার্জিলিং-এর ঘনবুনট সৌন্দর্য নেই।

দীর্ঘবিস্তার পাহাড়। চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ের ধারে ছোট ছোট উপত্যকা। সেখানে চাষবাস। এদিক ওদিক মেষপালকেরা মেষদল চরিয়ে বেড়াচ্ছে। পশমীবস্ত্র কাশ্মীরের এক বিরাট বাণিজ্য ভাণ্ডার। শস্যের নমুনা দেখে মনে হয় যথেষ্ট উর্বর

অঞ্চল। কোথাও কোথাও নাতিদীর্ঘ ধানগাছে আগত ধানের শীষ ঝুলছে।

এ সব অঞ্চল উর্বর তো হবেই, কারণ, এখানে কখনও জল-সিঞ্চনের অভাব হয় না। হজার হাজার গিরিনির্ঝরিণী এখান ওখান দিয়ে সামান্য বৃষ্টির স্পর্শেই ঢালু পাহাড় গড়িয়ে নিচের দিকে নামে। নিচে সেই গিরি-নির্ঝরিণী পার্বত্য ঝরণাগুলোই প্রশস্ত নদীর আকৃতি ধারণ করে।

পাঠানকোট থেকে জম্মুর পথে মাঝে মাঝেই সেই সব গিরি-নির্ঝরিণী নদীগুলোকে লক্ষ লক্ষ উপলখণ্ড বুকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ভারত সরকার সুদৃশ্য সেতু নির্মাণ ক'রে দিয়েছেন এর উপর দিয়ে। পরিবহণের ক্ষেত্রে এইসব সেতু আশ্চর্যরকমের কল্যাণকর হয়েছে। দেশরক্ষার জন্যও এ-সবের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিরাট বিস্তৃত এই পাহাড়ী দেশের বুকে, আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত পাহাড়ী পথের উপর দিয়ে বাসে চলতে চলতে যেমন সবকিছুকে মনোরম বোধহয়, তেমনই একটা বিপুলের স্পর্শও অনুভব করা যায়। পশ্চিম-সীমান্তের প্রকৃতির মতই দীর্ঘবৃত্ত রুক্ষ আকর্ষণীতে ভরা কাশ্মীরের পথ। এপথের সাদৃশ্য দার্জিলিং-এর পথে পাওয়া যাবে না।

কোন্ অলকার সৌন্দর্যপুরীতে আমরা চলছি, কে জানে! অবশ্য অলকাপুরী আমার লক্ষ্য নয়। তবুও প্রকৃতি যে তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে, সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই! লোকে বলে কাশ্মীরের সৌন্দর্যের তুলনা নেই। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর। সেই কাশ্মীরের সৌন্দর্য ভ্রমণ-বিলাসীদের মনে কেমন ভাবে সাড়া তুলবে কে জানে, তবে যারা পার্থিব সৌন্দর্যের সন্ধানে এখানে ছুটছে, তারা নিশ্চয় সাময়িক একটা উত্তেজনার খোরাক পাবে। কিন্তু আমার বোধ হয় সমস্ত শ্রমই অর্থহীন হবে। আসলে তো লছমনঝুলার কাছে সেই ফুধচটিই আমার লক্ষ্য ছিল, যদি আবার সেই মহাপুরুষের দেখা পাই। তা যখন হয়নি, দেবভূমিতে যা পাওয়া যায়নি, ভোগভূমিতে তা কি পাওয়া যাবে?

বাস এগিয়ে চলেছে। বেশ দ্রুত তার গতি। দু-একটা ছোট ষ্ট্যাণ্ডে বাস থেমেছে। যাত্রীরা কেউ বড় একটা নামেনি। এসব—জায়গায় নেমে দুদণ্ড উপভোগ করার মত নয়। তাই যাত্রীরা এখানে কেউ নামে না। সবাই নামবে সেই জম্মুতে। সেখানে দ্বিপ্রহরের আহার পর্ব সেরে আবার চলতে শুরু করবো।

আপাতত কুলকুণ্ডলিনীর চিন্তা বাদ দিয়ে পথের দিকেই তাকিয়ে আছি। কখনও যদি ভাবনার সূত্র ধরে সে চিন্তা আসবার সুযোগ পায় আসে, এই পর্যন্ত। এর বেশি নয়।

পাঠানকোট থেকে জম্মুর দূরত্ব অতিক্রম করতে ঘণ্টা তিনেক মাত্র লাগে। সকাল ছ'টায় রওনা হয়েছিলাম, ঘড়িতে নটা বাজতে অদূরে সামনে জম্মু শহরের ছায়া নজরে পড়ল। বাস দেখতে দেখতে জম্মু শহরের প্রবেশ পথে এসে দাঁড়াল। বাঁ ধারে পাহাড়ী খাদের উপর জম্মু শহর দাঁড়িয়ে। সুন্দর দেখাচ্ছে। ছোটবড় নানারকম ইমারৎ, ঘরবাড়ি সব দেখা যাচ্ছে। কোন্‌গুলোর গুরুত্ব কি যাত্রীদের তাই বলাবলি করতে শুনলাম। বোধহয় ইতিপূর্বেও এইসব যাত্রী কাশ্মীরে এসেছিলেন।

আমাদের বাসড্রাইভার খুব আমুদে। অল্প বয়স। সুন্দর স্বাস্থ্য। কয়েকজন তরুণ যাত্রী বসেছিল সামনের সিটে। তাদের সঙ্গে বেশ রহস্যালাপ জমিয়ে চলেছিল সে। কিন্তু এই দুর্গম গিরিপথে চলার সময় রহস্যালাপে ড্রাইভারের মনকে বিক্ষিপ্ত করা উচিত নয়। এতটুকু অমনোযোগিতার ফলে বাস উল্টে গভীর খাদে পড়তে পারে। আজকাল সর্বক্ষেত্রে কেমন একটা অনিকেত ভাব দেখা দিয়েছে। ত ভবিষ্যৎ কোন কিছুরই প্রতি মানুষের যেন আর আকর্ষণ নেই। নিজের ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতাও মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। Spiritualism থেকে সরে আসার ফলেই যে মানুষের এমন হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাস জম্মু-শহরের প্রবেশ করল। একেবারে আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত শহর। বৈদ্যুতিক আলো, সিনেমা হল, ট্রাফিক কণ্ট্রোল,

সব আছে এখানে। ট্যুরিস্ট সেণ্টারে গিয়ে বাস থামল। কয়েক
যাত্রী ইতিমধ্যেই বাসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে আম
জিতেনও আছে। এরা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলে যে, আজ
শ্রীনগর পৌঁছুতে হবে। তা যদি হয়, তাহলে দ্বিপ্রাহরিক
জম্মুতে না সেরে আরো এগিয়ে গিয়ে সারাই ভাল। সুতরাং গাড়ি জম্
শহরে বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। বাসড্রাইভারটা আমুদে লোক। যাত্র
অনুরোধে সে রাজি হয়ে গেল। নইলে এসব বাস ড্রাইভারেরা এ ক্ষেত্রে
দীর্ঘসূত্রতার নীতি অনুসরণ ক'রে চলে। তার কারণও আছে। কো
হল্টিং স্টেশনে যাত্রীদের রাত্রির মত কাটিয়ে দিতে পারলে সে সে
জন্য হল্টিং স্টেশনের হোটেলওয়ালাদের কাছ থেকে কমিশন পায়

জম্মু ছাড়িয়ে আবার গাড়ি চলেছে। পথের দুইধারে হিমালয়ে
রুক্ষতা এখনও আছে, সেটা বাড়ছে বই কমছে না। কিন্তু তা সত্ত্বে
আরও একটু বেশি সৌন্দর্য যেন উপভোগ করা যাচ্ছে। মা
মাঝেই ছোট ছোট অধিত্যকা পড়ছে। শস্যভারে সে-সব অধিত্যক
যেন নম্র-নত। মেষচারকেরা মেষ চারণা করছে। ঝর্ণার ধা
অধিত্যকার কোলে ছোট ছোট ঘড়বাড়ি দেখা যাচ্ছে। তবে
এই পর্বতসঙ্কুল প্রদেশে মানুষের সংখ্যা খুবই কম বলে মনে
দার্জিলিং-এর পথে পাহাড়ী বস্তি এর চাইতে ঘন আর সংখ্যায় বেশি
কিন্তু এমন শস্যের সমারোহ দার্জিলিং-এ নেই, আছে ভুট্টার চা
এমন হরিৎশীর্ষ ধান্যক্ষেত্রও সেখানে নেই।

গ্রীষ্মে কার্শিয়াং ছাড়িয়ে পাহাড়ী পথের মোড় ঘুরলেই
আমেজ অনুভব করা যায়, কিন্তু এখানে অক্টোবর মাসেও শীত নে
পাঞ্জাবির ভেতর সোয়েটার পরে এসেছিলুম, সেটা খুলতে পারলে
বাঁচি। চাদর গলায় জড়ানো ছিল, খুলে কোলের উপর রাখল
যদি পথের দু ধারে দার্জিলিং-এর মত সবুজের সমারোহ থাকত
বোধহয় গরমের তীব্রতাটা এতটা অনুভব করা যেত না। কলকা
অক্টোবর ও কাশ্মীরের দিনের বেলার অক্টোবরের মধ্যে যেন
পার্থক্য নেই। নির্মল আকাশে তেমনই তীব্র রোদের আমেজ

চলতে চলতে কেন যেন বার বার নানা কথা মনে পড়তে লাগল। পথের দু'ধারে সৌন্দর্যের শেষ নেই, তার ব্যাপ্তিও বিরাট। তবুও কোথায় যেন একটা স্নিগ্ধতার অভাব আছে, কোথায় যেন দৈবী সত্তার একটা অভাব রয়ে গেছে। যে দৈবী স্পর্শ হিমালয়ের পায়দলের পথে, অলকনন্দার ধারে ধারে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

আমাদের সামনে উধমপুর। জম্মু থেকে উধমপুরের দূরত্ব বিয়াল্লিশ মাইল। এ পথে চলতে গেলে ন্যাড়াপাহাড় আর বৃক্ষলতাহীন উঁচু নিচু প্রান্তর হামেশাই চোখে পড়ে। তবে এ রুক্ষতারও বিশেষ একটা সৌন্দর্য আছে। কিছু দূরেই দেখা যায় মসৃণ কালোপাথরের পর্বতশীর্ষ। কোথাও মাঝে মাঝে শ্বেতশুভ্র রেখা। বোঝা যায় সারা শীত এই পর্বতশীর্ষগুলি বরফের মুকুট মাথায় পরে ছিল। তার ক্ষীণ চিহ্ন এখনও রূপালী রেখার মধ্যে লেগে আছে।

বাস এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে গিরি নির্ঝরিণীর রেখা দেখছি। কখনও কখনও শিলাচ্ছন্ন পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগুচ্ছি। অনেকক্ষণ চলতে চলতে কয়েক শ্রেণীর নিচু পাহাড় ছাড়িয়ে বাস এগিয়ে গেল। মাঝে মাঝে পথে মিলিটারি ট্রাক চোখে পড়ছে। পড়বারই কথা। শুনলুম, উধমপুর একটি সামরিক ছাউনি। কাশ্মীরের পথে ভারতের বিরাট এক সেনানিবাস আছে এখানে। পাকিস্তান ও কাশ্মীর-হাঙ্গামা ভারত-সরকারকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চিরন্তন এক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সম্মুখীন করেছে। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে মুসলমানরা দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করেছে। ভারতবর্ষের অন্তরাত্মায় যে সহনশীলতার স্থান তার কোন মূল্য দেয়নি তারা। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ দুষ্ট রাজনীতিতে ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনার ধারাকে বিপন্ন করেছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে রাজনীতি পরিচালনার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তার অন্তর্নিহিত ত্রুটির ফলেই বস্তুতান্ত্রিকতা একদিন ভেঙে পড়বে। ভারতের মানুষও একদিন ভুল বুঝতে পারবে। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনা কোন সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ দ্বারা পরিচালিত নয়। সর্ব মানবের কল্যাণের জন্যই তার এই সাধনা।

যে মানুষ তার সাধনার সেই বিপুল উদারতা বুঝতে পারেনি, তারও মোহভঙ্গ হবে। ভারতের মানুষই দুষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে একদিনের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে। দুষ্ট রাষ্ট্রনেতারা তাদের নিয়ন্ত্রণ হারাবেন। সত্যকে আড়াল রেখে তাদের কুট উদ্দেশ্যপূর্ণ সংকীর্ণ স্বার্থপরতা একদিন ব্যর্থ হবেই। ভারতবর্ষ এক হবে, এশিয়াকে তার মহান অধ্যাত্ম সত্যের কথা শোনাবে। তার পর সারা পৃথিবী তার দুয়ারে আসবে মুক্তির বাণী আহরণ করতে। বস্তু তান্ত্রিক সাধনা তার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। মানুষের আত্মিক উন্নতি না হলে মানবসভ্যতার সামনে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা শেষ হবে না। তাই বলে মানুষের জীবনপ্রবাহ যে এখানেই শেষ হবে তা নয়। একজন সাধকের মুখে আমি শুনেছিলুম যে, সৃষ্টি এখনও প্রসারণশীল। সৃষ্টিক্রিয়া শেষ হয়নি। বৈজ্ঞানিক সত্য অনুযায়ী সৃষ্টি বৃত্তাকার। সত্যের কেন্দ্র স্থির। তার শক্তিজাত গতি অস্থির ও অনিত্য। কিন্তু স্থির সত্য থেকেই তার উৎপত্তি। সেই সত্যেই আবার তাকে ফিরে যেতে হবে। সত্য মিথ্যায় পরিণত হয়, নিত্য অনিত্যের মধ্যম অবস্থা নিয়ে আবার নিত্যেই মিশে যায়, সৃষ্টির এইই হল লীলা। পরমাত্মনরূপী দেবত্ব থেকে মানুষের, জগতের উদ্ভব। পূর্ণতা থেকে অপূর্ণ জগৎ অর্থাৎ যা গতিশীল তার প্রকাশ। সেই অপূর্ণ জগৎ আবার পূর্ণতার মধ্যে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সৃষ্টি লয় হতে পারে না। মানুষ এখনও সেই দৈবী সত্তায়, পরম সত্তায় উপনীত হতে পারেনি। অপূর্ণ মানুষ পূর্ণতা লাভ করেনি। সৃষ্টিশক্তির গতির ফলে সেই শক্তিজাত সৃষ্টির আবির্ভাব প্রথম বস্তুর আকারেই দৃষ্ট। বস্তু বাহ্যতঃ প্রাণহীন। তবে সমগ্র সৃষ্টিই ক্রমবিকাশের পথে পূর্ণতার দিকে ধাবমান। তাই বস্তু থেকে অব্যক্ত কারণে প্রাণের সৃষ্টি, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদির সৃষ্টি। মানুষই মন এবং বুদ্ধি অহংকার ইত্যাদির অধিকারী। মানুষের পরে সৃষ্টির দৈহিক পরিবর্তন তেমন হবার কথা নয়। যে চেতনা থেকে তার জন্ম সেই চেতনার স্তরেই এক সময় সে উন্নীত

হবে। সেই চেতনা তার নিজস্ব সত্তা অর্থাৎ সৎ-এ ফিরে যাবে। যে মানুষের মধ্যে মন-বুদ্ধি-অহংকারের উদ্ভব সেই মানুষের মধ্যে পূর্ণতার পথে ধাবমান সৃষ্টিশক্তি শুদ্ধ চৈতন্য ও পরম প্রশান্তি না পওয়া পর্যন্ত বৃত্তাকার সৃষ্টিলীলার সমাপ্তি হতে পারে না। সুতরাং অনেকটা মুক্তই হোক আর যাই হোক, পূর্ণতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই। মানুষের বিভ্রান্তিকর বস্তুতান্ত্রিকতা অধ্যাত্ম পিপাসায় রূপান্তরিত হবে, মানুষ পূর্ণতার স্পর্শ লাভ করবে, তবেই সৃষ্টির বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়ে প্রলয় হবে। আবার সংস্কারের অভিঘাতে নতুন সৃষ্টি হবে।

সাধকরা কোন্ বিশ্বাসে এ-ধরনের কথা বলেন জানি না। যদিও আইনস্টাইন বলেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বৃত্তাকার, হিন্দুরা এই বৃত্তাকার অনুমান করেই universe-কে বর্ণনা করেছেন ব্রহ্মাণ্ড বলে, অর্থাৎ Circular বলে, তবু যেখান থেকে উৎপত্তি ক্রমবিকাশের পথে সেখানে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সৃষ্টি ধ্বংস হবে না বিজ্ঞান অন্ততঃ এমন নিশ্চিন্ত সত্যে পৌঁছুতে পারেনি। সাধকদের মতে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বস্তুবিজ্ঞানের অনেক উর্ধ্বে। বিশ্লেষণপন্থী বিজ্ঞানের সাহায্যে অবাঙমানসগোচর শুধুমাত্র অনুভবযোগ্য সত্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সাধকদের এ-সব কথা নাকি সাধনা ও দিব্যদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতা প্রসূত। সেই সাধনার যথার্থ চরিত্র যে কি, তা জানি না। তার একটা সামান্য ইঙ্গিত পেয়েছি মাত্র, বাকীটুকু পাবার জন্য আকুপাকু করছি। সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। কিন্তু কবে কোথায় যে এ-সত্যের নাগাল পেয়ে সন্দেহের উর্ধ্বে যাব, জানি না। অনেক আশা নিয়ে এবারও বেরিয়েছিলাম, কিন্তু কোন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধকের দেখা পাইনি।

এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ী রুক্ষতা ক্রমশই বাড়ছে। কোথাও শ্যামল সৌন্দর্য নেই, যাকে বলে রসের জোয়ার তা নেই, যেমন আছে দার্জিলিং-এ। কিন্তু বিপুল বিস্তৃত এই পর্বতাকীর্ণদেশের এক গম্ভীর আকর্ষণ আছে যা দার্জিলিং-এর নেই। দার্জিলিং-এ ম্যালের উপর মহাকালের মন্দিরের বারান্দায় বসে কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে কাঞ্চন-

জঙ্ঘার রঙিন শীর্ষে তাকালে সুদূর বিপুলের যে অস্তিত্ব অনুভব করা যায় এ বিপুলতা তেমন নয়, এ যেন কঠিন, নির্মম, বাস্তব বিপুল। কাঞ্চনজঙ্ঘার বিপুলত্ব দেবতাত্মার পুণ্যস্পর্শে মহামহিম, কাশ্মীরের বিস্তৃতি নিতান্তই বাস্তব অর্থে ব্যাপক। দুইয়ের মধ্যে এই হল পার্থক্য।

বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ বাস এসে থামল উধমপুরে। ঘরবাড়ি দোকানপাট সব আছে এখানে। আস্ত একটা শহর যেন। জায়গাটাও উঁচু। কিন্তু এখানে পথ অনেকটা সমতল। এতটা উপরে উঠেছি ভাবাই যায় না।

বাস থামতেই যাত্রীদের মধ্যে কলকণ্ঠ শোনা গেল। অনেকেই চটপট নেমে পড়ল মাটিতে। ভ্রমণবিলাসীদের অদ্ভুত স্বভাব—ট্রেনে, বাসে ওঠার সময় তাদের যেমন গুঁতোগুঁতি, তেমনি ট্রেন-বাস কোথাও একটু থামলে নামার জন্যও তাড়াহুড়ো। অবশ্য যারা দু'চোখ ভরে সব দেখবার জন্য বেরিয়েছে তারা তো দেখবেই। কিন্তু আমার তো শুধু দেখা নয়, দেখার সঙ্গে সঙ্গে গতির আনন্দ ও কল্পনার আনন্দ সবই উপভোগ করা। সুতরাং বাস-ট্রেন থামলে আমার দেখার ব্যাঘাত ঘটে, আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে।

অনেকেই দেখি তাড়াহুড়ো ক'রে নেমে পড়ল। কেউ নেমেই সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ধরালো। কেউ বা নতুন প্যাকেট কিনল। কেউ বা গরম না থাকলেও পাইনঅ্যাপেল বা অরেঞ্জস্কোয়াশ খেল। কেউ নিল চা। কেউ কেউ একদৃষ্টিতে পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

ইতিমধ্যে বাসে আবার ভোটাভুটি শুরু হয়ে গেছে, অর্থাৎ উধমপুরেই খাবার নেওয়া হবে কিনা। জিতেন এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকার লোক নয়। তাকেও দেখা গেল বিশেষ এক ভূমিকায়। অনেকের সঙ্গে তাকে কথা কাটাকাটি করতে শুনলুম। বিতর্কের বিষয় সেই এক—উধমপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন সারা হবে, না পরের স্টপে ?

বাসড্রাইভারের অভিমত—যদি আজকের মধ্যেই শ্রীনগর উপত্যকায় পৌঁছুতে হয় তবে যথাসম্ভব আরো এগিয়ে গিয়ে মধ্যাহ্ন

ভোজন সারতে হবে। অনেকে আছেন, যাদের তাড়াহুড়ো বেশি, তারা পথের মধ্যে হল্ট করতে চান না, তাতে যেমন খরচ আছে, তেমনি হয়রানিও অনেক। কিন্তু অনেকে আছেন যারা পথে পথে চলতেই পছন্দ করেন, সামনে পেছনে তাদের তেমন কোন তাড়া নেই। যাদের হাতে সময় নেই, দুদিনের জন্য বেরিয়েছে, তাদের জরুর তাড়া --আজকের মধ্যেই শ্রীনগর পৌছুতে হবে। সুতরাং মধ্যাহ্ন ভোজনটা সামনের স্টপে সারা হবে বলে তারা অভিমত দিলেন। শেষপর্যন্ত বাসের দুই তৃতীয়াংশ যাত্রীর অভিমত হল পরের স্টেশনে দ্বিপ্রহরের আহারপর্ব সারার পক্ষে। সুতরাং এগিয়ে যাওয়াই ঠিক হল। আবার বাস ছাড়ল।

উধমপুর ছাড়বার পরই পথ আরো বেশি সর্পিল হতে লাগল। যেন ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে উপরে উঠতে লাগল বাস। কখনেও বা সে নামছে, কখনও উঠছে। এবার পথকে ক্রমশই দুর্গম বলে বোধ হচ্ছে। পাশে ভয়ঙ্কর গিরিখাদ, কিন্তু চতুর্দিকে একটা অপার পার্থিব সৌন্দর্য। পাহাড়ী রুক্ষতা আছে বটে তবে তার রূপের বৈচিত্র্য আরো খুলেছে।

অদ্ভুত দেখাচ্ছে চেনাবের গিরিখাদকে। ঝিরঝির ক'রে নিচে জল নামছে। যত উপরে উঠছি পাশের গিরিখাদকে ততই ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। যে রাস্তাকে ছাড়িয়ে এসেছি আবার পাশ থেকে নিচে সেই রাস্তাকেই দেখা যাচ্ছে। চেনাবের ভয়ঙ্করতা আরও বাড়ছে। যেন একটা আরণ্যক অজগর পড়ে আছে। এই অজগর বা সাপ উর্ধ্ব থেকে নিচে নামছে। যেন কুলকুণ্ডলিনী সৃষ্টিপ্রবাহে নিচে আসছে। যতই তার অবতরণ, ততই তার জটিলতা। উর্ধ্ব থেকে তাকিয়ে দেখলে তার জটিলতাকে বেশি ক'রে মনে হয়। বিপরীত গতিতে কুণ্ডলিনী শক্তির উর্ধ্ব পর্যায়ে যাঁরা যেতে পেরেছেন সেই সব সাধকও বোধহয় জগৎ সংসারকে এই রকম জটিল অবস্থায় দেখেন।

বাস এগিয়ে চলেছে। কোথাও কোথাও চেনাবে জল দেখা যাচ্ছে। উপরের পথের ধার থেকে নিচের পথের পাশে কোথাও

চেনাবকে দেখা যাচ্ছে চলতে চলতে অরণ্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে সে। মনে পড়ে গেল দার্জিলিং থেকে কালিংপম যাবার পথে আরণ্যক তিস্তার সর্পিল গতি। ঘোলাজল বুকে নিয়ে তিস্তা প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে। তিস্তার উদ্দামতা কখনও বেশি কখনও কম! কিন্তু অনুদ্দাম সে কখনও নয়। চেনাবের বুকে এখনও তিস্তার সেই উদ্দামতা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বর্ষাকালে সে হয়তো প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। ভয়ঙ্করের পাশে এপথে তখন হয়তো সৌন্দর্যের অপার বিস্তার। ভয়ঙ্করের পথে পার্থিব সৌন্দর্যের কেশজাল যে কত সুন্দর এপথে না চললে তা অনুমান করা যায় না! এর বোধহয় একটা শিক্ষণীয় দিকও আছে, সে হল এই যে, পার্থিব সৌন্দর্যের পাশে, পার্থিব সুখভোগের পাশে এমনি ক'রে বিপদের ভয়ঙ্করতাও ওৎ পেতে থাকে। দার্জিলিং-এর পথের সঙ্গে এর তুলনা এই যে, দার্জিলিং-এর পথ যদি মরমিয়া গীতিকাব্য, কাশ্মীরের পথ তবে মহাকাব্য। সৌন্দর্যের অভাব কারো নেই, শুধু রসের আস্বাদন ভিন্ন।

যদিও সৌন্দর্যের মধ্যে একটা পার্থিব ভাব আছে, তবুও তন্ময় হয়ে আমি পথিপার্শ্বের দিকে তাকিয়ে থাকলুম। সৌন্দর্য যদি পার্থিবও হয় তবু তার মধ্যে ঐশ্বরিক প্রকাশের ভাব একটু বেশি থাকে। সকল দিকের সুসমতাই সৌন্দর্য, যে সুসমতা মহাপ্রকৃতির নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য—; তাঁর মধ্য দিয়ে ঐশ্বরিক সৃষ্টি প্রকাশ পেয়ে তাঁর গুণসাম্যেইতা রক্ষিতা হচ্ছে।

আমি তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। সীমাবদ্ধতা আমারও আছে। আমিও পার্থিব জীব। তবুও সৌন্দর্যের সঙ্গে কোথায় যেন আমার বিশেষ রকম একটা আত্মীয়তা আছে। যেন অনাদিকালের ধারায় সৌন্দর্যের এই বিপুল স্রোতে আমি চিরকাল ভেসে আসছি। এই সৌন্দর্য-প্রীতি দুষ্ট ভোগবাসনা দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। ফলে সৌন্দর্যের প্রতি আমার যে তন্ময় ভাব—তা প্রত্যহের সংশয়, সংসারের কলহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, সব কিছুর হাত থেকে আমাকে সুযোগ পেলেই অব্যাহতি দান করে।

যদিও ইদানীং কালে অধ্যাত্ম অনুসন্ধিৎসা আমার মধ্যে প্রবল, তবু তা যে সৌন্দর্যরহিত তা নয়। এবং তা তো হতেও পারে না, কারণ সত্য নিজেই সুন্দর। সেই জন্যেই প্রচলিত ধারণা তিনটি শব্দকে একত্রে ধরে রেখেছে—সত্যম, শিবম, সুন্দরম। ত্রিকালজ্ঞ কবিই এ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। আমার মধ্যে সে কবিসত্তা আছে কিনা জানি না কিন্তু সুযোগ পেলেই সৌন্দর্য আমাকে কেমন যেন নাড়িয়ে দেয়। সেই সৌন্দর্যের ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। আমি তন্ময় হয়ে চেনাবের গিরিখাদের পাশে জম্মু থেকে শ্রীনগরের পথে হিমালয়ের এই বিপুল সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম।

চলতে চলতে এক সময় বাসের গতি যেন শ্লথ হয়ে এল। অদূরে লক্ষ্য করলাম ছোট্ট একটি পাহাড়ী শহর। পাহাড়ের গা ঘেঁষে কয়েকটি দোকান: চা, বিড়ি, সিঙাড়া, লুচি, তেলে-ভাজা এই সব খাবার। বাস এসে বাজারের মত একটি জায়গায় থামলো।

আশ্চর্য! সারাপথ থেকে এই জায়গাটার চরিত্র যেন একটু আলাদা। অরণ্য যেন এখানে জাদুমন্ত্রবলে ঘন সবুজ। কুয়াশার সামান্য আভাস। অরণ্যবৃক্ষে নাম-না-জানা ফুলের সমারোহ। একটু শীত শীত ভাব। দার্জিলিং-এর কথা মনে করিয়ে দিতে চায়। জায়গাটার নাম কুঁদ।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম বেলা হয়েছে বেশ। শরতের আকাশে সূর্য একটু আগেই ঢলে পড়ে। সমুদ্রতল থেকে কয়েক হাজার ফুট উপরে পাহাড়ী দেশে তার উত্তাপ আরো কম। সূর্যের রঙ-এ বিষণ্ণতা ক্রমশঃ বাড়ছে। কুয়াশার আভাস জড়ানো পাহাড়ী প্রদেশে সে বিষণ্ণতা যেন আরো বেশি।

সবার সঙ্গে এবার আমিও নামলাম। এখানেই দ্বিপ্রাহরিক আহার্য নেওয়া হবে। অধিকাংশ যাত্রীই সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল। জিতেনও দেখি চটপট ঢুকে আমাদের দু'জনের জন্য দুটো সিটের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। আমি তৎক্ষণাৎ

সেখানে গিয়ে গিরিখাদের ধারে দাঁড়িয়ে উত্তুঙ্গ হিমালয়শীর্ষে তাকিয়ে থাকলাম। রুক্ষ বিপুল ক্রমশঃ যেন স্নিগ্ধ সুন্দর হচ্ছে।

উধমপুর থেকে কুঁদের দূরত্ব ২৪ মাইল। উচ্চতা ৫৭০০ ফুট। কুঁদের পরে পথ আরও দুর্গম। কুঁদ থেকে বার মাইল দূরে বেটট। সেখানে আরও একটি ছোট স্টপেজ। অনেকে চা-টা খান এখানে। কোন কোন বাস সেখানে যাত্রীদের রাত্রির মত নামিয়ে দেয়। পাঠানকোট থেকে শ্রীনগরের পথে নৈশ বিশ্রামের স্থান নির্ভর করে সেখান থেকে বাস ছাড়বার সময়ের উপর।

আমাদের বাস সর্বাগ্রে ছেড়েছে। বাসের ড্রাইভার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, সে আজকের মধ্যেই আমাদের শ্রীনগর পৌঁছে দেবে। সুতরাং বেটটে বেশিক্ষণ দাঁড়াল না বাস।

দেখতে দেখতে বাসটা প্রায় হাজার দু'এক ফুট উপরে উঠে এল। পাশে সেই চেনাবের গিরিখাদ। ক্রমশঃ গভীরতর রহস্যের মধ্যে যেন প্রবেশ করছি। দু'ধারে চোখে পড়ছে পাইন অরণ্য। কোথাও বা ঘন সবুজ দেবদারু বন। পাহাড়ের 'বাঁক থেকে বাঁক' পার হয়ে অনেকক্ষণ ধরে উপরে উঠে এক সময় বাসটা আবার নতুন বাঁক নিয়ে নিচে নামতে লাগল।

হঠাৎ একজন সাধকের কথা মনে পড়ে গেল। কুণ্ডলিনী সাধনায় নাকি পদ্মাসনে সোজা হয়ে বসার ও কুঁজো হয়ে বসার দুটোই ব্যবস্থা আছে। কুঁজো হয়ে বসে যদি কুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্বে ওঠাবার চেষ্টা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ুর খেলা চলে, তাহলে এমনি করেই নাকি উপরে নিচে উঠতে নামতে হয়। সোজা হয়ে বসে জাগ্রত কুণ্ডলিনীকে কুম্ভক ক'রে টানলে বরাবর সহস্রারে উঠে গিয়ে সাধককে সমাধিস্ত করে। চেনাবের বঙ্কিম গতি যথার্থই একটা সাপের মত, যেন এঁকেবেঁকে ঊর্ধ্ব দিকে ওঠবার চেষ্টা করছে। যেন একটি নাগ। কাশ্মীরের শুনেছি বহুস্থান নাগ শব্দে পরিচিত। যেমন কোকরনাগ। এক সময় কাশ্মীর ছিল হিন্দুসভ্যতার কেন্দ্র।

হিন্দুসভ্যতার ক্ষীণ রেখা এখনও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বেঁচে থাকলেও যথার্থ হিন্দু এলিমেণ্ট বর্তমানে অত্যন্ত কম কাশ্মীরে। তবে একদা তন্ত্রের এক বিরাট পাদপীঠ ছিল কাশ্মীর। শৈব ধর্মের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল এখানে। শৈব তন্ত্রসাধনা তো সর্বোৎকৃষ্ট। স্বয়ং শিবই তো তন্ত্রের প্রচার করেছিলেন এ-দেশে, যদিও শিব এখন প্রতীক অর্থে তন্ত্রে ব্যবহৃত। জানি না হঠাৎ কুণ্ডলিনী সাধনার কোন ইঙ্গিত এখানেও পেয়ে যাব কিনা। মনের মধ্যে যেন একটা ক্ষী আশা উঁকি দিল। এতক্ষণ পার্থিব সৌন্দর্যের আবরণে যাকে জড়ি বলে মনে হয়েছিল তার মধ্যে অনেকটা যেন অধ্যাত্মতার গন্ধ পেলাম। জিতেনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এ-দৃশ্য তাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছে। যার মধ্যে কোন রকম কবিসত্তা নেই সেও যেন মনমাতানো দৃশ্যে তন্ময় হয়ে কবির মত উপভোগ করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন একটি সুন্দর অরণ্য-শহরের মধ্যে বাস এসে থামল। এই হল বেটট।

বেটটে বেশিক্ষণ গাড়ি দাঁড়াল না। চা-খাবার অবসর পর্যন্ত দিল না ড্রাইভার। বেটট থেকে বাস আবার ছাড়ল। এবার নামার পালা। গাড়ি নামছে তো নামছেই। মনে হলে এতটা যে উঠলাম তা যেন পণ্ডশ্রম মাত্র। দিনের আলো ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে। যাত্রাপথের দুই দিকে আরও রহস্যময়তা বাড়ছে। পাশে সেই ভয়ঙ্কর গিরিখাদ তখনও বিদ্যমান। বিরাট বিস্তৃত পটভূমি অবাক ক'রে দেবার মত। আঁচ করা যায় না যাত্রাপথের শেষে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা ক'রে আছে! জিতেন পার্বত্য দেশের অরণ্য-ছায়ায় মুগ্ধ ও নীরব হয়ে গেছে। সিগারেটটা পর্যন্ত তেমন খাচ্ছে না। পথের পর পথ অতিক্রম ক'রে ক্রমশঃ নিচে নামছি। নিচে রামমন নামক স্থানে নাকি বাসটা গিয়ে দাঁড়াবে।

সমুদ্রতল থেকে বেটটের উচ্চতা ৫০০০ ফুটেরও বেশি। আর রামবনের উচ্চতা সমুদ্র তল থেকে ২০০০ ফুটের সামান্য উপরে। এ যেন একটা তেলমাখানো বাঁশে উঠছি। যতটা উঠছি মাঝে

মাঝে তার চেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছি। উপরে শীতের আমেজ পাচ্ছিলাম। রামবনে নেমে আসতে গ্রীষ্মের স্বাদ পাওয়া গেল। বেটটের পর ১৭ মাইল পথ অতিক্রম করলে তবে রামবন। নামটা শুনে কেমন একটা আগ্রহ জন্মাল। একদিন হয় তো এখানে রামায়ণী সংস্কৃতির প্লাবন ছিল।

রামবনে গাড়ি থামল না, সামান্য একটু দাঁড়াল মাত্র, যেমন কলকাতার বাস রাস্তার স্টপেজে মুহূর্ত মাত্র দাঁড়ায়। তার পরই আবার যাত্রা শুরু হল উর্ধ্বপথে।

রামবনে মোড় ঘুরে কিছুদূর উঠতেই আবার শীতের স্পর্শ অনুভব করা গেল। সন্ধ্যা নামছে। অন্ধকার না নামলেও স্পষ্ট আলো নেই। এ সময় হাওয়াতে চিরকালই স্নিগ্ধতা নামে। এখানে যেন তা আরও বেশি ক'রে নামল। রামবন থেকে এবার আমাদের লক্ষ্য বানিহাল। অর্থাৎ শ্রীনগর প্রবেশের ছাড়পত্র। এর পরই নাকি সব চাইতে দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হবে। সেই পাহাড়ের নাম পীরপঞ্জাল। তার পরই শ্রীনগর উপত্যকা—সৌন্দর্যপিপাসুদের অলকাধাম—বহু পথ উঠানামার পরে কুণ্ডলিনী শক্তির সহস্রার অঞ্চলে এসে অভূতপূর্ব সৌন্দর্য দর্শন। কুণ্ডলিনী সহস্ররের কাছা-কাছি এলে থাকি অনন্ত আকাশে সুমধুর চন্দ্রালোকের প্লাবন দেখা দেয়—তন্ত্রে যাকে বলা হয়েছে 'কোটিচন্দ্রসুশীতলম' অঞ্চল। জানিনা ভাগ্য কোথায় নিয়ে আসছে। হয়তো বা কোন একটা ইঙ্গিত পেতেও পারি।

পীরপঞ্জালের পাদদেশ বানিহালে সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকার নেমে আসছে। বানিহালকে সত্যিই মায়াময় অপরূপ দেখাচ্ছে। অরণ্যের এক গম্ভীর আহ্বান যেন চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অন্য কোন যাত্রীবাহী বাস নেই। চলেছে শুধু আমাদের বাস। আর চলেছে মিলিটারী ট্রাক আর জীপ। এরা যেন সহস্রারের পথে পার্থিব বিঘ্নের আঘাত।

পাঠানকোট থেকে কাশ্মীরের পথে মিলিটারী গাড়ির যাতায়াতের

বিরাম নেই। জম্মু থেকে আবার যানবাহনের সংখ্যা যেন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। সর্বদা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর নজরে রয়েছে এই পথ। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের যোগাযোগের একমাত্র পথ এটা, লাইফ লাইন। কোন মতে শত্রু যদি এপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে তবে কাশ্মীরে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিরাট এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। শুধু তাই নয়, সামরিক বাহিনীর বিরাট এক অংশ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং এপথে সামরিক তৎপরতা বা টহলের বিরাম নেই।

একটানা প্রপেলারের গর্জন শোনা যাচ্ছে। তন্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ হয়তো অনাহত চক্রে 'অ-উ-ম' নাদের মত। মিলিটারি জীপ ও ট্রাক আমাদের বাসের পাশ দিয়ে শাঁ ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে, যেন তান্ত্রিকের সুষুম্না পথে উর্ধ্বগতিশীলা কুলকুলণ্ডলিনীর 'হিস্ হিস্' শব্দ, যে শব্দের কথা তন্ত্রগ্রন্থ থেকে আমার 'সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে'র তৃতীয় খণ্ডে বলেছি। রাত্রির জানোয়ারের মত জীপ ও ট্রাকের চোখগুলি জ্বলেছে যেন। সেই জ্বলন্ত চোখ পাশ দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। এমনি ক'রে নাকি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডকে উল্কার মত ছুটে আসতে দেখেন যোগীরা যখন তাঁরা বিশুদ্ধ চক্রের আকাশে কুলকুণ্ডলিনীকে ওঠাতে পারেন।

সমুদ্রতল থেকে বানিহালের উচ্চতা প্রায় ৬০০০ ফুট। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হবে যে, আমরা সমতল ভূমিতেই দাঁড়িয়ে আছি।

বানিহালে একটুক্ষণ বিশ্রাম নিল গাড়িটা। যেন দম নিচ্ছে। সামনে খাড়াই পাহাড় পীরপঞ্জাল। বাসটা যেন সেই পাহাড়ে ওঠবার জন্য দম নিচ্ছে। হয়তো বিশুদ্ধ চক্র থেকে আজ্ঞাচক্রে যাবার জন্য এমনই দম নিতে হয় সাধককে।

আশ্চর্য! একবার নিজের মনের মধ্যেই ভেবে অবাক হলাম যে, যতই উপরে উঠছি ততই যেন সবকিছুকে তন্ত্রের আলোতে দেখছি। কে এমন ক'রে আমাকে ভাবাচ্ছে? তন্ত্র সম্পর্কে আমার

অভিজ্ঞতা তো পড়াশুনার মাধ্যমে। এ ব্যাপারে কয়েকজন অলৌকিক শক্তিধর সাধকের সাক্ষাৎ পেয়েছি এই যা। কিন্তু তা নিয়ে এমন ক'রে ভাবা তো সম্ভব নয়! কে আমাকে এমন ক'রে ভাবাচ্ছে? সত্যিই আমার চিন্তাধারা দেখে আমি নিজেই অবাক হলাম।

যাত্রীদের মধ্যে আর সেই কলকোলাহল নেই। দিনের প্রারম্ভে যে এনার্জি থাকে পাহাড়ী পথের ঝাঁকুনিতে ক্রমশঃ সে এনার্জি ক্ষয় হতে হতে কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন উত্তেজনা একটা মন্থর নদীর মত নেতিয়ে পড়ে। লক্ষ্যের কাছাকাছি এলে নাকি এমনই হয়। নদী সমুদ্রের কাছাকাছি এসে মোহনাতে যেমন ক'রে তার কলনাদ হারিয়ে ফেলে ঠিক যেন তেমনই। সাধকরা নাকি আজ্ঞাচক্র ভেদ করলে এমনি ক্রম প্রশান্ত জগতে প্রবেশ করেন, পরমপুরুষের প্রশান্ত রূপের স্পর্শ লাভ ক'রে চুপ ক'রে যান। এই জন্য মুনি শব্দের অর্থ করা হয়েছে এইভাবে, অর্থাৎ সত্যজ্ঞান লাভ ক'রে যে সাধক মৌন অবলম্বন করেন তিনিই মুনি।

ঝাঁকুনিতে ঝাঁকুনিতে পেছনের যাত্রীদের জীবন অস্ত। শুধু সেই যে ভদ্রলোক—বাসে ওঠবার সময় যার সঙ্গে চোখে চোখে দেখা হয়েছিল শুধ্ তাঁকেই দেখলাম অক্লান্ত। এই দীর্ঘপথে পাহাড়ী ঝাঁকুনি খেয়েও তাঁর মধ্যে যেন এতটুকু ক্লান্তি নেই। সেই প্রথমবার আমার দিকে তাকিয়ে পাঠানকোটের বাসস্টপে যেমন ক'রে হেসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই হাসছেন। আমার মুখের অবস্থা কি হয়েছিল জানি না, তবে আমি নিজেও কোন দৈহিক ক্লান্তি অনুভব করিনি। অন্ধকারের কেশজাল ভেদ ক'রে আমার মন সক্রিয়ভাবে কাজ ক'রে চলেছে। কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে -কিছু একটা পেয়ে যাব এখানে, কোন গোপন নির্দেশই আমাকে এখানে টেনে নিয়ে আসছে।

বানিহাল ছেড়ে আরো খানিক দূর সমতল ভূমির উপর দিয়েই আমাদের বাস চলল। সামনে জমজমাট পীরপঞ্জালের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। খানিক দূর এগিয়েই গাড়ি বাঁক নিল। তারপর ধীরে

ধীরে উপরের দিকে উঠতে লাগল। জম্মু শ্রীনগর মোড়ের সবচাইতে দুর্গম অংশ এই পীরপঞ্জালের পাহাড়। এই পীরপঞ্জাল ডিঙোলেই শ্রীনগর উপত্যকা—ভ্রমণবিলাসীর কামনার মোক্ষধাম-ভূ-স্বর্গ। বিরাট এই পর্বতশ্রেণী দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত কাশ্মীরকে জম্মু থেকে পৃথক করে রেখেছে। শুনেছি পীরপঞ্জাল থেকে নিচে উপত্যকার দৃশ্য দেখতে অপরূপ। পারিপার্শ্বিকও দেখবার মত। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসাতে সে দৃশ্য দেখা গেল না। শুধু দেখা গেল ধূসর পাহাড় ও অন্ধকার হয়ে আসা সবুজ অরণ্যবৃক্ষ। নিচে অন্ধকার কালো ঘন ধুঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। আশেপাশে সর্বত্রই অন্ধকার।

বাইরে কিছু দেখা যায় না। শুধু একটা জিনিস অনুভব করা যায় যে, আমরা উপরে উঠছি। বালির তন্ত্রসাধক ননীগোপাল ভট্টাচার্যের অর্থাৎ বেনুদার কথা অনুযায়ী এ যেন সাধকের সাধনার প্রথমস্তরে Black hole পার হওয়া। সেই Black hole পার হতে অধিকাংশ সাধকই ভয় পান। অন্ধকার এক রহস্যময় আকর্ষণ যেন সাধককে চুম্বকের মত টানতে থাকে। সাধক নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন বলে ভয় পান। এই অন্ধকার গহ্বর পার হতে পারলে তবে আর সাধকের পা হড়কে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যেই বুঝি প্রকৃত ভ্রমণবিলাসীরা একদিনে শ্রীনগর না এসে বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হন। এই অন্ধকারের জন্য পীরপঞ্জালের দুর্গম পথের পাশে মোহময় সৌন্দর্যের বিপুল বিস্তারকে দেখা গেল না।

যান্ত্রিক বাসটাও যেন টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। বেশ বোঝা যায় বাসেরও কষ্ট হচ্ছে। এই কষ্টের মধ্যে দিয়ে বাসটি উপরে উঠতে লাগল। কষ্ট না করলে কেষ্টও মেলে না, সিদ্ধিও অর্জন করা যায় না।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বাস এসে থামল জওহর টানেলের মুখে। যথার্থই আমরা Black hole-এর চৌম্বক আকর্ষণে পড়ে গেলাম। ডানদিকে অতলস্পর্শী গহ্বর অন্ধকারে ভরে আছে। বাঁয়ে পাহাড়, সামনে টানেল।

সমুদ্রতল থেকে জহর টানেলের উচ্চতা প্রায় আটহাজার ফিটের মত। মাথার উপরে আরও তিনহাজার ফুট উঁচু পাহাড়। জওহর টানেল তৈরি হবার আগে—এই তিনহাজার ফুট উঁচু পথ বাসেই অতিক্রম করতে হত। সে যাত্রাপথ ছিল আরও ভয়ঙ্কর।

আগে, বছরে তিন মাস এই পথ বন্ধ থাকতো। কারণ তুষারপাতের ফলে এ অঞ্চলে বরফ জমে থাকত বলে এপথে চলাচল সম্ভব হত না। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে উদ্বোধিত জওহর টানেল যাতায়াতের পথকে অনেকটা সুগম ক'রে দেয়। প্রায় দেড় মাইল লম্বা এই টানেল। টানেলের ভেতর দিয়ে আমাদের বাস চলতে লাগল। যাত্রীরা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—জওহর টানেল, জওহর টানেল। যেন Black hole-এ প্রবেশ ক'রে সাধক চমকে উঠলেন।

জওহর টানেল পেরুতেই প্রবেশ করলাম ভূ-স্বর্গে। দু-একটা পাহাড়ের বাঁক পেরুতেই শ্রীনগর উপত্যকার দেখা মিলল।

রাত্রিবেলা বোঝা যায় না, তবু অপরূপ মনে হচ্ছে কাশ্মীরকে। চওড়া পথ চলে গেছে শ্রীনগরের দিকে। পথের দু'ধারে পপ্‌লার, দেবদারু আর চেনার গাছের সারি। নিম্নভূমি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক দেশে যে প্রবেশ করছি সেটা বেশ বোঝা যায়। এমনি অদ্ভুত এক প্রবেশপথ নাকি সাধকেরা যোগের পঞ্চম স্তরে দেখতে পান। তাঁরা বলেন, এ দৃশ্য হল গ্রহান্তরের দৃশ্য। সমতল ভূমির লোকের কাছে শ্রীনগরও তো প্রায় গ্রহান্তর তুল্য!

এবার আর পথের সেই ঝাঁকুনি নেই, নেই সেই পাহাড়ের বাঁক ঘোরার যন্ত্রণা; সোজা চলেছি শ্রীনগরের পথে। এতক্ষণ শীতের তীব্রতা ছিল না, এবার যেন কিছুটা তার কামড় অনুভব করা গেল। ভাল ক'রে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলুম। দু'একটা কাঁচের জানালা যা উপরে তোলা ছিল যাত্রীরা সেগুলিকে নামিয়ে দিল। রাত্রির আচ্ছন্ন অন্ধকারে ভূ-স্বর্গের পথে চলেছি আমরা। সামনে আমাদের শ্রীনগর। ভেবেছিলুম, এবার বাস অবিশ্রান্ত চলবে। কিন্তু বাস

ড্রাইভার বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সে একটি হোটেলের কাছে এসে বাস থামিয়ে দিল।

যাত্রীরা স্বপ্নে ছিল যে, একেবারে শ্রীনগর গিয়ে তবে বিশ্রাম। হঠাৎ এখানে বাস থামতে সবাই কৌতূহলী প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। ড্রাইভার বলল, শ্রীনগর পৌঁছুতে রাত হবে। ওখানে গিয়ে রাতের খাবার পেতে অসুবিধা হবে। সুতরাং খাবার-দাবার এখানেই সেরে নিন।

যাত্রীদের তখন আর খাবারের দিকে তেমন আগ্রহ নেই। সবারই ইচ্ছা শ্রীনগর গিয়ে বিশ্রাম নেয়। তাদের একমাত্র লক্ষ্য তখন শ্রীনগর। কিন্তু বাসের ড্রাইভারের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং বাস অপেক্ষা করল। ড্রাইভার নিজে খেয়ে নিল। যাত্রীদের মধ্যেও অনেকেই বাধ্য হয়ে আহার সেরে নিলেন।

গাড়ি ছাড়ল বেশ কিছুক্ষণ পরে। এবার আর কোথাও অপেক্ষা নয়, এবার বরাবর শ্রীনগর। দিনের শেষে যাত্রীদের মধ্যে তখন কলকোলাহল থেমে গেছে। এবার সবাই বিশ্রামের জন্য কাতর। সকলেই তাকিয়ে থাকল সামনের দিকে।

রাস্তার দুই ধারে পপ্‌লার, দেবদারু আর চেনার বৃক্ষ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা যায়, উন্মুক্ত দিনের আলোয় এই রহস্যময় পথকে সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত দেখাবে। জমাট শীতের স্পর্শ ভরা বাতাস। বাসের শাটার কেটে বাইরে হুহু ক'রে বাতাস চলেছে। নিঃসঙ্গ একটা বাস যেন রহস্যলোকের পথে এগিয়ে চলেছে।

রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ শ্রীনগর শহরে এসে বাস থামল। ট্যুরিস্ট সেন্টারে এসে থামতে থামতে দশটা বেজে গেল। সকলেরই তাড়াহুড়ো। বিছানাপত্র নিয়ে আমরাও নামলাম। বিরাট ট্যুরিস্ট সেন্টার। সেন্টারের মুখে সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে। ভেতরে রীতিমত জাঁকজমক-পূর্ণ অফিস। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে গেলাম।

ট্যুরিস্ট সেন্টারে ঢুকতেই বোটওয়ালা আর হোটেলওয়ালারা এসে ছেঁকে ধরল : আইয়ে বাবুজী। কিন্তু অধিকাংশই অচেনা অজানা

স্থানে রাত ক'রে বেরুল না। ফোনে দু'একটা নামকরা হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে কোন স্থান পাওয়া গেল না। ফলে রাতটা ট্যুরিস্ট সেণ্টারে কাটিয়ে দেওয়াই ঠিক করলুম।

ট্যুরিস্ট সেণ্টারের চেহারা দেখে কল্পনা করার উপায় নেই যে কাশ্মীর একদা হিন্দুসভ্যতার কেন্দ্র ছিল, এখানেও কোনকালে কদাচ অধ্যাত্মতার চর্চা হয়েছিল।

সহজে ঘুম এল না। জিতেন অবশ্য নাক ডাকাতে থাকল। আমি আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলুম। সেই যে রহস্যময় যাত্রীটি আমার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে দেখছিল, তাঁর আর কোন পাত্তা পেলুম না, কখন যে সে কোথায় নেবে গেছে বোঝা গেল না। আমি ভাবতে লাগলুম, ভাগ্য হঠাৎ এখানে নিয়ে এল কেন আমাকে? মনের মধ্যে কিসের একটা ক্ষীণ আশা এখন উঁকি দিচ্ছে কেন?

চার

হোটেলে উঠব কি বোটে উঠব, ডালে উঠব না ঝিলমে উঠব স্থির করতে করতে এক সময় একজন বোটওয়ালার কাছে আত্ম-সমর্পণ ক'রে ফেললুম। বোটওয়ালার নাম গোলাম কজ্জর। তার বোট ঝিলমের উপর। পরে আর একবার কাশ্মীরে এসে তাঁর বোটে উঠেছিলুম।

ট্যুরিস্টসেণ্টার পেরিয়ে শ্রীনগর শহর। বড় বড় দেবদারু, চেনার আর পাইন বৃক্ষের সমারোহ। সুন্দর রাস্তা। ওধারে একটা বাঁধ। বাঁধের এপাশে গভর্নমেণ্ট এম্পোরিয়াম। বাঁধের দিকে এগুতে ডান পাশে একটা বড় নাইট ক্লাব। বাঁধের নীচে ঝিলমের পান্নাবরণ ধীর জলপ্রবাহ। বাঁধের এপার ওপার সর্বত্র সারি বাঁধা হাউস বোট। দু'একটা বোট চলেছে নদীর উপর দিয়ে। কাশ্মীরী পণ্ডিতানীরা বেয়ে চলেছে। ছেলেমেয়েরা সকলেই বোট চালায় এখানে। মেয়েরা বিশেষ ধরনের কাশ্মীরী ওড়না পরা। দেহের রঙ ও আদল সত্যি

ভাল। কাশ্মীরের সৌন্দর্যের সঙ্গে যেন এই সব মানুষ একাত্ম হয়ে আছে। কিন্তু এ-সৌন্দর্য এখন আর আমার কাছে আকর্ষণীয় বিষয় নয়। জিতেন যেন এ দেখে একেবারেই মুগ্ধ। আমায় বলল : কি হরিদ্বার হরিদ্বার বলিস! দৃশ্য দেখবি তো দেখ। এ না হলে একে ভূ-স্বর্গ বলে।

যার যার মানসিক চিন্তাধারা অনুযায়ী সৌন্দর্য। কেউ বা সুন্দরকে মনে করে প্রশান্তি বলে, কেউ ভাবে চাঞ্চল্যকে। যে ভাব মনের মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় করে না, আমার কাছে তার আকর্ষণ কম, সুন্দর বলেও তা উদ্ভাসিত হয় না।

গোলাম কজ্জরের সঙ্গে বোটে গিয়ে পৌঁছুলাম। আমাদের বোট ঝিলমের এপারে বাঁধা। পাশে বাঁদিকে বিরাট কাঠের সেতু। ঝিলমের এপার ওপার সেই সেতু দিয়ে যুক্ত। মিলিটারি জীপ, লরি, ট্যুরিস্ট বাস, সব চলেছে তার উপর দিয়ে। সকালবেলায় পাতলা কুয়াশার নিচে অপূর্ব দেখাচ্ছে ঝিলমকে। ওপারে দেবদারু, আর চেনার বৃক্ষের সার ঝিলমের বাঁধানো তীরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় ওপারে দিগন্ত বিস্তৃত এইসব অপরূপ বৃক্ষের বাগান। ফুলের গাছও আছে। অনেক দূরে পাহাড়ের ছায়া। এই সব বাগানের গায়ে, সমগ্র ল্যাণ্ডস্কেপে কেমন একটা ভোগের গন্ধ লেগে রয়েছে, কেমন একটা মোগল আমলের রুচি। মোগলরা আর যাই করুন অধ্যাত্ম চর্চায় তেমন আগ্রহ দেখাননি। তাঁদের স্থাপত্য পরিকল্পনা, জীবনযাত্রাপ্রণালী সবই ভোগের লালসায় আচ্ছন্ন। যদিও সম্রাট আকবর দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেছিলেন তবু তা যে অধ্যাত্ম অনুসন্ধিৎসা থেকেই করা তা মনে হয় না। অনেক ঐতিহাসিক একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করেন। **V. A. Smith** তো বলেই ফেলেছেন যে, আকবরের ধর্মমতের উদ্ভাবনা অহংকারপ্রসূত।

ঝিলম থেকে শ্রীনগর উপত্যকাকে তাকিয়ে দেখলে এটাকে আধুনিক কাল বলে মনে হয় না। যেন মোগল যুগে দাঁড়িয়ে আছি

সেইরকম মনে হয়। যেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল। জাহাঙ্গীরই তো কাশ্মীরের নাম দিয়েছিলেন—ভূ-স্বর্গ!

ঝিলমের তীর থেকে প্রথম সাক্ষাতে শ্রীনগরকে ভূ-স্বর্গ বলে ভাবতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। বড় বড় রাজহংস ঝিলমের বুকে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। পান্নাসবুজ ঝিলমের বুকে—ভাসমান শ্বেত মরালগুলি অনির্বচনীয় এক সৌন্দর্যের স্বাদ ছড়িয়ে দিয়েছে। শ্বেতহংসের এই রাজকীয় ভাসমানতা এই ভোগাকর্ষণপীড়িত সৌন্দর্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা ভিন্নরূপ স্বাদের স্পর্শ দিতে চায়। কিন্তু তক্ষুনি আবার পার্থিব ভোগের বিষয় একে উগ্র সৌন্দর্যে ভরে তোলে। স্বর্গও তো ভোগেরই স্থান। অধ্যাত্ম জগতের লক্ষ্য নাকি সেই জন্য দেবদেবী নয়, স্বর্গ নয়, পরম মোক্ষস্থান—যার রূপ বর্ণনার অতীত, কিন্তু প্রশান্তি নিবিড়ভাবে অনুভবযোগ্য। সাধকরা বলেন যে, দেবতা বা স্বর্গ কোন কিছুই স্থায়ী নয়। তাঁদের অবস্থান—তুলনামূলকভাবে আমাদের চেয়ে দীর্ঘতর এই যা। সুতরাং যা অমৃত নয়, তা সৌন্দর্যের আকর হতে পারে না। একজন তন্ত্রসাধক একবার আমায় এই অমৃতত্বের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলুম, যা মরে না, অমর, তাই অমৃত।

তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি মরণশীল নয়?

বলেছিলুম, ব্রহ্মণ।

—সত্য কি?

—ব্রহ্মণ। সে এক এবং অদ্বিতীয়।

—তাহলে এই দ্বৈত জগতের উদ্ভব কোথা থেকে?

আমি জবাব দিতে পারি নি।

তন্ত্রসাধক হেসে বলেছিলেন: ব্রহ্মণ থেকেই তার উৎপত্তি।

বলেছিলুম, অনেকে ভাবেন যে, উৎপত্তি বলে যা আমরা ভাবি তা আসলে কোন উৎপত্তিই নয়।

—তবে তা কি?

—মায়া।

—মায়ার স্বরূপ কি ?

—জানি না। অবর্ণনীয়।

তিনি বলেছিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎ (যা গতিশীল) এর অর্থ একমাত্র তন্ত্রসাধক ছাড়া আর কারো কাছেই পরিষ্কার নয়। যিনি এক তিনিই দুই। যখন নিজেরই মধ্যে তিনি নিশ্চল তখন তিনি পরম পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড ; যখন নিজেরই মধ্যে চঞ্চল, তখন সৃষ্টি, প্রকৃতি, জগৎ। এই ব্রহ্মাণ্ডও সহজাতগুণে কখনও স্বরূপ হচ্ছেন, কখনও বিকৃতরূপ হচ্ছেন, অর্থাৎ কখনও আত্মস্থ হচ্ছেন, কখনও মৃত্যু বরণ করেছেন। ধরতে গেলে জগতে কিছুই স্থির নয়। স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডও এই অর্থে স্থির নন। একবার তিনিই সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন, আর একবার তিনিই আত্মরূপে লয়প্রাপ্ত হচ্ছেন। আসলে অমরত্ব কোথাও নেই। অমর একমাত্র তিনিই যিনি এর স্বরূপ জানেন। দেহের মৃত্যু মৃত্যু স্বরূপ, সংস্কারের মৃত্যু অমৃত স্বরূপ। যার সংস্কারের মৃত্যু হয়, শুদ্ধ চৈতন্যের জাগরণ হয়, যিনি আত্মার যথার্থরূপ অবলোকন ক'রে সমস্ত রহস্যের স্বরূপ জানেন, তিনিই অমর। অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্যই অমরত্বের অধিকারী। এবং যাঁর চৈতন্য শুদ্ধ তাঁর দেহের মৃত্যু হলেও তিনি অমর, নইলে জগতে স্থায়ী কিছুই নেই। স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডও চিরকাল নির্গুণ পুরুষরূপে থাকেন না, সুতরাং তাকেই বা অমর বলি কি ক'রে ? অমরত্বটা একটা বোধ মাত্র। যথার্থ জ্ঞানই অমরত্ব। যে মৃত্যুর স্বরূপ জানে না তার যথার্থই মৃত্যু হয়। যে এর প্রকৃত অর্থ জানে তার দেহের রূপান্তর কখনই মৃত্যুর কারণ নয়। মৃত্যুর স্বরূপ জেনে মৃত্যুকে যিনি ভয় করেন না, তিনিই অমর। অনেক দেবতাই মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে জানেন, তাই তাঁদের অমর নাম দেওয়া হয়েছে। নইলে দৈহিক দিক থেকে দেবতারাও, মায় ঈশ্বর পর্যন্ত অমর নন। আবার মানুষও যখন সত্যের স্বরূপ জানতে পারেন তখন দেবচরিত্রে উন্নীত হয়ে আত্মিক অমরত্ব লাভ করেন।

এতসব গূঢ় তত্ত্বের অর্থ এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এ-সব

তত্ত্ব কথা নাকি পণ্ডিত ব্যক্তিরও বোধগম্য নয়। সাধনার দ্বারা যিনি এসব তত্ত্বের স্বরূপ অবগত না হয়েছেন, তিনি কিছুই জানেন না। তাই তো সামান্য একজন সাধক যখন আমারই সামনে বিরাট এক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন গীতার এই সামান্য শ্লোকটির অর্থ:

"অব্যক্তাদীনি ভূতানী ব্যক্ত মধ্যানী ভারত
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।"

তিনি জবাব দিতে পারেননি।

সাধক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অব্যক্ত কি?

পতিত ব্যক্তি বলেছিলেন, জন্মের পূর্বের অবস্থা।

—কোন্ জন্মের?

—দৈহিক জন্মের।

—কিন্তু এই স্থূল বস্তুগত দেহই তো দেহ নয়।

—তার বাইরে দেহ আছে নাকি?

—আছে।

—তার প্রমাণ?

তন্ত্রসাধক বলেছিলেন, প্রমাণ স্বচক্ষে দর্শন।

—আমি যদি বলি এ-সব বুজরকি?

সাধক বলেছিলেন: গতকাল আমার কি হয়েছিল বলতে পার?

পণ্ডিত ব্যক্তি: না।

সাধক: তোমার কি হয়েছিল আমি বলতে পারি।

—বলুন।

সাধক নির্ভুল বলেছিলেন।

সাধক আরও বলেছিলেন: আগামী কাল তোমার কি হবে তাও বলে দিচ্ছি।

—বলুন।

সাধক একটি কথা বলেছিলেন। তা যথার্থ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের অহংকার এরপরই ভেঙে যায়। এর

পর তিনি সেই তন্ত্রসাধকের কাছে আসেন, আত্মসমর্পণ করেন। তখন তন্ত্রসাধক তাঁকে অব্যক্তের যথার্থ স্বরূপ বলেছিলেন : 'ব্রহ্মণই হলেন একমাত্র অব্যক্ত। ব্যক্ত জগৎ লয়প্রাপ্ত হলে জগৎ সেই ব্রহ্মণে লীন হয়ে পুনরায় অব্যক্ত হয়। জন্মের আগের অবস্থা স্থূল চোখের কাছে অব্যক্ত হলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন সাধকের কাছে অব্যক্ত নয়। মৃত্যুর পরের অবস্থাও সূক্ষ্মস্তরে সাধকের দৃষ্টিগোচর। সুতরাং জন্মপূর্ব ও মৃত্যুর পরের স্থূল অবস্থা অব্যক্ত হলেও সূক্ষ্ম অবস্থা অব্যক্ত নয়। ব্রহ্মভূত না হওয়া পর্যন্ত সবই ব্যক্ত। তোমার গতকাল চলে গেছে বলেই তা চলে যায়নি, সূক্ষ্ম অবস্থাতে বেঁচে আছে। সাধক তা দেখতে পান। কর্মফল সূক্ষ্মভাবে তোমাকে ভবিষ্যতের জন্য যে ভাবে তৈরি ক'রে রেখেছেন স্থূল চোখে তা তোমার দৃষ্টি-গোচর না হলেও আমার চোখে দৃষ্ট। এমনি ক'রে স্থূল জন্মের আগে এবং স্থূল মৃত্যুর পরেও জীবের অস্তিত্ব আছে।'

এ সব তত্ত্ব হয়তো আমি বুঝি না, তবু আমার মধ্যে কেমন যেন একটা অনুরণন জাগায়, এবং এই জন্যেই স্বর্গ আমার লক্ষ্য নয়, অমরত্বই লক্ষ্য। স্বর্গ সম্পর্কে চিরাচরিত বিস্ময় আমার মধ্যে নেই। এজন্যেই বোধ হয় যে অংশে কাশ্মীরের বস্তুসত্তা বেশি ক'রে প্রকট, সে অংশ আমার কাছে আকর্ষণীয় নয়। মাঝে মাঝে কিছু কিছু ইঙ্গিত অমরত্বের গন্ধ ছাড়লে আকর্ষণ বোধ করছি, আবার সঙ্গে সঙ্গেই পার্থিব সত্তা সেই চিন্তাকে আঘাত করছে।

বাইরে যা আছে, ভেতরে তাও নেই। ভেতরে পরিপূর্ণ ভোগের চিত্র। গোলাম কজ্জরের সঙ্গে বোটের ভেতরে ঢুকে রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম। বাইরে থেকে বোটের ভেতর কিছুই আঁচ করা যায় না। ঢুকলে একে বোট বলে মনে করে কার সাধ্যি। কুষন চেয়ার, টেবিল, খাবার টেবিল, দু-একটা পত্রপত্রিকা, সম্পন্নগৃহস্থের ঘরে যে-সব আসবাবপত্র থাকে, সব আছে এখানে। এমন কি ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা পর্যন্ত।

প্রথমটা ডাইনিং রুম। ডাইনিং রুমের পেছনে দুটো থাকবার

রুম। এর পেছনেও একটা রুম। আমাদের স্থান হল মাঝের রুমে। দুটো খাট পাতা।

সব মডার্ন অ্যারেঞ্জমেণ্ট। সেনিটারি পায়খানা, শাওয়ার, গরম জলের টব, সব কিছুর ব্যবস্থা। কী নেই! এই বোটের মালিক গোলাম কজ্জর নিজে, অথচ সামান্য একটা দালালের মত যাত্রী ধরার জন্য তার সে কী বিনয়াবত ব্যবহার! এক কথায়, যে এ বোটের মালিক সে লক্ষপতি। অথচ টাকার জন্য মানুষ কী না করতে পারে!

বোটের পেছনে গোলাম কজ্জরের পরিবারের ব্যক্তিগত বোট; সেইখানেই যাত্রীদের জন্য রান্নাবান্না সব হয়।

জিতেনের খুব পছন্দ। তার ব্যক্তিগত চরিত্রের সঙ্গে এ মডার্ন অ্যারেঞ্জমেণ্টের সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার এসব জায়গায় গিয়ে ধরমশালায় উঠে আমি যে অভূতপূর্ব একটা মানসিক স্বস্তি ও শান্তির স্পর্শ পেয়েছি তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। যেন যুগ-যুগান্তর ধরে সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। কাশ্মীরের হাউস বোটের পরিবেশে থেকে অধ্যাত্ম জগতের সামান্যতম ইশারা পাবার কোন সম্ভাবনা আছে বলে আমার মনে হল না।

বাইরে বেশ শীত আছে। ঝিলমের উপর বলে শীতটা আরো বেশি বোধ করা যাচ্ছে। তবে বোটের ভেতর বিন্দুমাত্র শীত অনুভব করা যায় না। জিতেন বিছানার উপর আরাম ক'রে দেহ এলিয়ে দিল। কিন্তু ভেতরে বসতে আমার কিছুতেই মন চাইছিল না। চার দেয়ালের বন্ধনে চিরকালই আমার যেন কেমন অস্বস্তি। ফলে সিঁড়ি বেয়ে বোটের ছাদে উঠে গেলাম। বোটের ছাদ থেকে চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন: 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'। প্রভাত-সূর্যের নিচে বসেও সন্ধ্যাবেলায় ঝিলমের সে চিত্র অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

তবে ঝিলমের যে অংশে আছি সে অংশে তার আঁকাবাঁকা গতি লক্ষ্য করা যায় না। পান্নারঙের ঝিলম অনেকটা ঋজু ভঙ্গিতেই বয়ে চলেছে। ওপারে মোগল গার্ডেনের মত সজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী। এপারে শ্রীনগর শহর। শ্রীনগরে ইঁটের ব্যবহারের চাইতে কাঠের ব্যবহারই বেশি। শীত ও পাহাড়ের দেশে কাঠের ঘরবাড়িই বেশি হয়। দার্জিলিং-এ ঘরবাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে কাঠের ব্যবহারই বেশি দেখেছি। তবে দার্জিলিং-এর ঘরগুলি অধিকাংশই সবুজ। শ্রীনগরের অধিকাংশ ঘরবাড়ির রঙ গৈরিক। অথচ দার্জিলিং-এ কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার দিকে তাকালে অতীন্দ্রিয় জগতের একটা ছোঁয়া পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীনগরে সেরকম কোন ইঙ্গিত নেই। অথচ গৈরিকের মধ্যে ত্যাগ ও অধ্যাত্মতার স্পর্শ বেশি থাকাই স্বাভাবিক ছিল।

বাস্তব দৃষ্টিতে শ্রীনগর যথার্থই শ্রী-নগর অর্থাৎ শ্রীমণ্ডিত নগর। কাশ্মীর উপত্যকায় ঝিলমের উপর বিলম্বিত এই শহরের এত সুন্দর নাম কে দিয়েছিলেন? প্রশ্ন মনে আসতেই কাশ্মীরের ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়ের পাতা মানসনেত্রে একে একে খুলে যেতে লাগল যেন।

সমুদ্রতল থেকে পাঁচহাজার ফুট উঁচুতে এই কাশ্মীর উপত্যকা। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় উপত্যকা এটি। এই উপত্যকা আয়তনে ১৯০০ বর্গমাইল; দৈর্ঘ্যে ৮৪ মাইল আর প্রস্থে ২৫ থেকে ৩০ মাইলের মধ্যে।

ঝিলমের ঠিক বর্তমান স্থানটিতেই আদি শ্রীনগর শহর ছিল না। শ্রীনগরের প্রথম পত্তন করেন সম্রাট অশোক। তখন এর নাম ছিল শ্রীনগরী। ষষ্ঠ শতাব্দীতে দ্বিতীয় প্রবরসেন নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তার নাম হয় প্রবরসেনপুর বা প্রবরপুর। মুঘল আমলে এর নাম হয় কাশ্মীর। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে শিখরা কাশ্মীরের শাসন ভার পায়। তখন থেকে কাশ্মীরের রাজধানী আবার শ্রীনগর নামে পরিচিত হয়।

হিন্দু সংস্কৃতি কাশ্মীরের অন্দরে কন্দরে আজও স্মৃতি হয়ে লুকিয়ে

আছে। শ্রীনগরের দিকে তাকিয়ে ইতিহাসের বহু কাহিনী মনে পড়তে লাগল। এই হল কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীর দেশ। কত যুদ্ধ, কত প্রেম, কত বীভৎসতা, কত বৈচিত্র্যময় চিত্র চোখের উপর ভেসে উঠতে চাইল। বর্তমান শ্রীনগরের হৃৎপিণ্ড ভেদ ক'রে ইতিহাস যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে।

এখানেই রাজত্ব করেছেন ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়। এখানেই শাসক হয়েছিলেন নিষ্ঠুর হূণ সম্রাট মিহিরগুল। শাশ্বত যৌবনের অধিকারিণী চির প্রেমতৃষাতুরা রাণী দিদ্দা আর ভাগ্যহীনা শোকাতুরা রাণী কোটাও এখানেই তাঁদের বিচিত্র ইতিহাসের ছায়া রেখে গেছেন। কিন্তু এ-সবই বাহ্য। এ-সবই পার্থিব। জলে বুদ্বুদের মতই ক্ষণস্থায়ী।

দার্শনিক বের্গসঁ শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে একটি মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'Our wars and revolutions will count for little, but the steam engine with a number of inventions which accompanied it, will perhaps be spoken of as we speak of the old stone or chipped stone age of pre-historic time,' অর্থাৎ 'আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাস সময়ের বিচারে নিতান্তই তুচ্ছ, কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও তার সঙ্গে আর যে-সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছিল সম্ভবতঃ আগামী ইতিহাস তার কথা স্মরণ করবে, যেমন করে আজ আমরা প্রত্নপ্রস্তর বা নব্যপ্রস্তর যুগের কথা বলি।' কিন্তু আমি বলি এর কোনটাই থাকবে না। থাকবে একমাত্র নির্বিকার সত্য, ভারতবর্ষ যার সাধনা করেছে।

আমি ঝিলমের অপর পারে তাকিয়ে তার বহুবিস্তৃত পটভূমি বিচার ক'রে দেখতে চাইলাম—সেই অনন্ত সত্যের কোন ইঙ্গিত এখানে মেলে কিনা। কেমন একটা আশ্চর্য প্রকৃতি কাশ্মীরের, অতীন্দ্রিয়তার স্বাদও দেয় না, আবার পার্থিব উপভোগকেও তেমন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ক'রে তোলে না। অথচ কাশ্মীরী খানা, পোশাক-আশাক, চালচলন, সবই বর্তমানে ভোগবাদ দ্বারা প্রভাবিত। এ যেন শ্মশানের ডোমের মত

অবস্থা। মৃত্যুর মধ্যে থেকেও মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা না করা, মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে ভোগের সাধনা করা। কাশ্মীরের প্রকৃতি যতটা না ভোগবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে, মানুষ তার চাইতে অনেক বেশি এখানে ভোগবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

সকালের ব্রেকফাস্ট দিয়েই গোলাম কজ্জর আমাদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। প্রথম লক্ষ্য কাশ্মীরের কয়েকটি শালের কারখানা দেখানো। এটা যে কমিশন পাবার লোভে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সেটা বুঝতে বিলম্ব হল না।

কাশ্মীরে বস্তুসাধনার বড় কেন্দ্র এই শহরের দোকানপাট ও কারখানাগুলি। সেখানে পার্থিব ভোগলালসাপীড়িত ব্যক্তিদেরই ভিড় বেশি। বাঙালী, মাড়োয়ারী, গুজরাটি থেকে ইউরোপীয় পর্যন্ত। জিতেন এ-সবে নিতান্ত আকৃষ্ট হলেও আমি কোন আকর্ষণ বোধ করলুম না। জিতেন দুটো শাল কিনলেও আমি কিছুই নিলুম না।

কারখানা থেকে ফিরে এসেছিলুম বেলা বারটার মধ্যেই। গোলাম কজ্জর ডিনারের ব্যবস্থা ক'রেই রেখেছিল। এসেই খেতে বসে গেলুম।

কাশ্মীরের রান্নার স্বাদ সত্যিই ভাল। রসনার তৃপ্তির দিকে সর্ব প্রকারেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। দার্জিলিং-এর নেপালী রান্না, হরিদ্বারের সিন্ধি রান্না বা পুরীর আটকার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। দুটো মানসিকতার পার্থক্য রান্নাতেই ধরা পড়ে। হিন্দুদের ত্যাগের মানসিকতা নেপালী, গুজরাটি, হিন্দুস্থানী ও সিন্ধি সকলের রান্নার মধ্যেই। মুসলমানী ভোগের মানসিকতা কাশ্মীরের খাবারে। মোগলাই ভোগবাদ যেন এখনও এখানকার রান্নায় লেগে রয়েছে। এ রান্নায় উত্তেজনা আছে, প্রশান্তি নেই। আতপচাল আর কাঁচকলার পাশে বিরিয়ানী পোলাও প্রশান্তির পক্ষে অত্যন্ত দুর্বল।

পার্বত্য দেশ দার্জিলিং ও কাশ্মীরে হিন্দু ও মুসলমান মানসিকতার জন্য বিরাট ফারাক। উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্মীর বরপুত্রদের জন্য উন্মুক্ত

থাকলেও দুইয়ের স্বাদ ভিন্ন। হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী গোর্খাদের প্রাধান্য দার্জিলিং-এ। কুয়াশাচ্ছন্ন সবুজ পর্বতশীর্ষের পাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছায়া দার্জিলিংকে দিয়েছে একটি ত্যাগের স্পর্শ। কবি বা শিল্পীর দৃষ্টি সেটা এড়ায় না। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার-কিরীটের দিকে তাকালে কালিদাসের 'কস্মৈ দেবায় হাবিষা বিধেম' ভাব মনে আসে।

কাশ্মীরের পারিপার্শ্বিক ভরে আছে ভোগের আমন্ত্রণে। নবাব বাদশার ক্রীড়াধন্য এই কাশ্মীর তাঁদেরই লীলাভূমি। কাশ্মীরের রূপ আর রুচি দুইয়ের মধ্যেই তার স্পর্শ ছড়ানো। একদা হিন্দু সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র হলেও দিল্লী আগ্রার মত কাশ্মীরও দীর্ঘদিন মোঘলদের লীলাক্ষেত্র ছিল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিতে না নিতেই দেখি আমাদের বোটের পাশে একটি শিকারা এসে দাঁড়িয়েছে। গোলাম কজ্জর সেই শিকারাতে আমাদের শ্রীনগর শহরের আশ-পাশে ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করল। এ বিষয়ে আমার তেমন আগ্রহ না থাকলেও জিতেনের প্রচুর উৎসাহ। আমি কাশ্মীরে এলেও আমার দৃষ্টি পড়ে আছে ক্ষীরভবানী, মার্তণ্ড ও পাহালগাঁওয়ে যেখান থেকে অমরনাথের পথ চন্দনবাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেছে।

জিতেন শিকারাওয়ালার সঙ্গে টাকার ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়ে ঝিলমের বুকে শ্রীনগর শহর ঘুরে দেখবার ব্যবস্থা ক'রে ফেলল। গোলাম কজ্জর ফ্রেণ্ড, ফিলজফার ও গাইডের কাজ করল।

জলের প্রজাপতি শিকারা আমাদের নিয়ে অপরাহ্নে ঝিলমের বুকে ভেসে পড়ল।

ভূ-স্বর্গের অমৃতধারা হল ঝিলম। সমুদ্রতল থেকে পাঁচহাজার ফুট উঁচুতে এমন প্রশস্ত নদী কদাচিৎ চোখে পড়ে। অন্য কোন দেশে এমনটি নেই বোধহয়। শুনলাম, বসন্তে ঝিলমে নৃত্যচঞ্চল আবেগ থাকে। কিন্তু অক্টোবরে সে পাম্নাবরণ। তার গতিও নিতান্ত মন্থর। ঝিলমের দুই ধারে ঘন সবুজ বার্চ আর পাইন বন। এখন

এ-সবকে অদ্ভুত গৈরিক দেখাচ্ছে। অথচ শ্রীনগর শহর ত্যাগের হাতছানি দিয়ে ডাকে না।

ভেরীনাগের কাছে ১২০০০ ফুট উঁচু পীরপঞ্জালের গা থেকে একটি নির্ঝরিণী নেমেছে। সে-ই শেষপর্যন্ত ঝিলমের আকৃতি নিয়েছে। ভেরীনাগ এখনও দেখিনি। তবে শুনেছি সে নাকি অপরূপ। তবে তার অপরূপত্ব যত না আকর্ষণীয় হোক, নামটা আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়। 'নাগ' কথাটা আমার কাছে গভীর কৌতূহলের কারণ। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে কুণ্ডলিনী শক্তির কথা মনে পড়ে যায়। একদিন হয় তো 'নাগ' নামক স্থানে কুণ্ডলিনী সাধনাও হত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'। কিন্তু ঝিলমের বুকে বসে তার বক্রত্ব তেমন উপভোগ করা যায় না। ঝিলমকে একটা বঙ্কিম সর্পের মত দেখা যায় শঙ্করাচারিয়া হিলে উঠলে তবে। পরে আমার সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। ঝিলমের যত কিছু স্রোত, উদ্দামতা তা খানাবল শহর অবধি। তার পর থেকেই ধীরে ধীরে সে স্থির হয়ে এসেছে। খানাবল শহর থেকে বারমুলা, এই ১০২ মাইল পথ ঝিলমের গতি ধীর এবং স্থির।

শ্রীনগরের একপ্রান্তে ঝিলমের সঙ্গে এসে মিশেছে দুধগঙ্গা। সাদিপুরে যোগ দিয়েছে সিন্ধু আর মজঃফরাবাদে ঝিলম-এর উপর এসে পড়েছে কৃষ্ণ-গঙ্গা। এছাড়া আরও অনেক শাখানদী আছে ঝিলমের। বাঁ দিকে উল্লেখযোগ্য হল বাহারুর। ডাইনে ভিসও, রেমবিয়েরা, রামশী, শুকনাগ।

আঁকা বাঁকা ঝিলমের দুই তীরে অবস্থিত শ্রীনগর শহর। এই নদীর জন্য শ্রীনগরের যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বাণিজ্য পথকেও এ নদী সুগম করেছে। কারণ পাঁচহাজার ফুট পাহাড়ের উপর হলেও ঝিলম নৌ চলাচলের উপযুক্ত। সম্ভবত পৃথিবীতে এত উঁচুতে আর কোন নদী নেভিগেবল নয়। শ্রীনগর শহরে ঝিলমের উপর গড়া ন'টি সেতু আছে। এই সেতুগুলি সবই কাঠের। এগুলি কদল

নামে পরিচিত। সর্বাধুনিক সেতুটির নাম 'বাদশা কদল'। আমরা এই সেতুটির পাশেই ঝিলমে আছি।

বারমুলার পর থেকে ঝিলমের গতি আবার দুর্বার হয়ে উঠেছে। পাহাড় বেয়ে নেমে এপথে সে মর্ত্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঝিলমের জলপ্রপাত এখান থেকে প্রচণ্ড গর্জনে ভেঙে পড়ছে। এই উচ্ছল তরঙ্গস্রোত নিয়ে বারমুলা থেকে ছুটতে ছুটতে সে অবশেষে গিয়ে মিলেছে চেনাব নদীর সঙ্গে। ঝিলমের গতিপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫০ মাইল। এর মধ্যে ২৫০ মাইল পড়েছে ভারতবর্ষে। বাকী অংশ পাকিস্তানে।

আমাদের নিয়ে শিকারাটা ডান দিকে এগিয়ে চলল। সেই দিকেই বাকী ছটি সেতুর নিচ দিয়ে ঝিলম প্রবাহিত হয়েছে। এই ঝিলমের পাশেই বিলম্বিত হয়ে আছে সমস্ত শ্রীনগর শহর।

বাঁদিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে জনবসতি কম। সেদিকে অট্টালিকা নেই বললেই চলে। সমস্ত তীর ঘেঁষেই বোট বাঁধা আছে। মাটির উপর বাড়িঘর শ্রীনগরের লোকেদের কমই আছে। অধিকাংশই বোটে ঘরবাড়ি বেঁধেছে। কিছুসংখ্যক লোক থাকে কাশ্মীরের রাজবাড়ি অর্থাৎ বর্তমান এসেমব্লি হাউস ছাড়িয়ে আরও নিম্নপ্রবাহের দিকে। সেখানে মাটির উপরও যেমন ঘিঞ্জি, জলের বুকেও তেমনি বোটের পরে বোট।

এসেমব্লি হাউস পার হলেই দেখা যায় ঝিলমের নোংরা অঞ্চল। এর আগে কিছুদূর পর্যন্ত সুন্দর দৃশ্য। তারপরেই সৌন্দর্য ক্রমশঃ ঘনবসতি আর পরিচ্ছন্নতার অভাবে দৃষ্টিকটু হতে থাকে। তখন কাশ্মীরকে আর ভূ-স্বর্গ বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না। শিকারা করেও আর এগুতে ইচ্ছা করে না। পার্থিব সৌন্দর্যের এটাই ধারা। এই সৌন্দর্যের নেশায় অনেকদূর এগিয়ে গেলেই বোঝা যায় যে, আপাত সৌন্দর্যের আড়ালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক নোংরামি।

ঝিলমের দু-ধারে বহু সুসজ্জিত বোট, ঘরবাড়ি ও ফুলের বাগান দেখলাম। অনেক মসজিদও আছে, যেমন শাহ মসজিদ, শাহ

হামদান ইত্যাদি। এদের নিয়ে নানা গল্পকথাও আছে। চার নম্বর গেট ছাড়িয়ে আধ মাইল আগে জামা মসজিদ।

মসজিদের উপস্থিতি শ্রীনগরকে একটা ধর্মীয় ভাব দিয়েছে। মসজিদের গম্বুজের ক্রমশূন্যে আরোহণ তাকে একটা infinite suggestion-ও দিয়েছে। এ স্থাপত্যকলার পেছনের দর্শন সত্যিই প্রশংসা যোগ্য। সেই infinite suggestion মুয়াজ্জিনের দীর্ঘবিস্তার 'আল্লা' ধ্বনির মধ্যেও রয়েছে। তবে মুসলিম দর্শনে এই infinite-এর অনুভূতি কতটা আছে আমার জানা নেই। এইটুকু বলতে পারি যে, যাঁরা অধ্যাত্ম জগতে অসীমের ইঙ্গিত পান তাঁরা fanatic হতে পারেন না।

ঝিলমের বাম তীরে দারা শিকোহ প্রতিষ্ঠিত জাদুঘর আছে। সবার শেষে মহারাজ হরিসিংয়ের রাজবাড়ি। সেটাই বর্তমানে এসেমব্লি হাউস। এসব ছাড়া আছে ঝিলমের বুকে অসংখ্য শিকারা, পণ্যবাহী বোট আর কলকণ্ঠ রাজহংসের দল।

অকস্মাৎ একটা মসজিদের চুড়ো দেখে আমার মনে হল—এই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তো দরবেশ শ্রেণীর লোক, আউলিয়া শ্রেণীর লোকও আছেন। এঁরা তো হিন্দু বাউলদের মত আন্তর সাধক। অন্তরতম মনের সঙ্গেই তাঁদের কথাবার্তা। সেখানেই তাঁরা পরমাত্মার সাক্ষাৎকারী। সেই জন্য হিন্দু যোগীদের মত এঁদেরও ভূত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার 'দিল্লী দূর অস্ত্' কথা তো গিয়াসুদ্দীন তুঘলক সম্পর্কে নির্ভুলভাবে খেটেছিল। এরকম কোন সাধকেরও কি সাক্ষাৎ পেতে পারি না? হয়তো নিয়তি এ জন্যেই আমাকে কাশ্মীরে টেনে এনেছে।

কি পেলুম জানি না। আমার অন্তরের ক্ষুধা মেটার মত রসদ তো বস্তুভিত্তিক সৌন্দর্যের মধ্যে নেই। কিন্তু জিতেনকে দেখলাম যথেষ্ট প্রীত। এ সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছে।

সারাটা অপরাহ্ণ ঝিলমের বুকে শিকারাতেই কেটে গেল। ফিরে এসে আমাদের বোটের কাছে যখন নামলুম তখন দিনের আলো আর

নেই। বেশ শীত লাগছে। দেখি গোলাম কজ্জর আমরা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চা আর জলখাবার নিয়ে এসে হাজির।

ফিরে এসে আমার আর বেরুবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু জিতেন শ্রীনগর শহরের নৈশরূপ দেখবার জন্য ভারি ব্যাকুল বলে আবার বেরুতে হল। সে গেল সেণ্ট্রাল মার্কেটে।

সেণ্ট্রাল মার্কেটে দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। বাঙালী বলে জিতেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলল। কথায় কথায় বেড়াতে যাবার কথা উঠল। শোনা গেল ওরা যাচ্ছেন পাহাল গাঁও। জিতেনও ঠিক করল পাহাল গাঁও যাবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আগ্রহ অনাগ্রহ কোনটাই দেখালুম না। এ পর্যন্ত আমার অভিলষিত কিছুই পাইনি বলে আমার ক্ষোভ। ফেরার পথে শ্রীনগর ট্যুরিস্ট সেণ্টার থেকে পাহালগাঁওগামী একটা বাসেরও সিট রিজার্ভ ক'রে আসা হল।

জানি না পাহালগাঁও কি, তার দৃশ্য কিরকম তবে যেতে হলই। পরদিনে খুব ভোরবেলা গোলাম কজ্জর আমাদের ডেকে তুলল। আকাশে তখনও অজস্র নক্ষত্র জ্বলছিল ঝিলমের বুকে বোটে বোটে লাইট। সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে ট্যুরিস্ট সেণ্টার থেকে বাস ধরতে হবে। গোলাম কজ্জর ইতিমধ্যেই আমাদের জন্য টিফিনও তৈরী ক'রে দিয়েছে। সত্যি বস্তুজগতে উন্নতির জন্য মানুষের শ্রমের অভাব নেই। এর যদি সামান্য অংশও পরমার্থ সন্ধানে ব্যয় করা যেত তাহলে বোধহয় মানুষের সভ্যতা ভিন্নরকম হত।

সকাল ৬-১৫-এর মধ্যে ট্যুরিস্ট সেণ্টারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সকালবেলাতেই বেশ ভিড় জমে উঠেছে বাস স্ট্যাণ্ডে। অধিকাংশই বাঙালী। বাঙালার বেড়াবার শখ কত বাংলার বাইরে না গেলে বোঝা যায় না। কলকাতায় বারমাসের ভিড় দেখে মনে হয় বাঙালী কখনও বাইরে যায় না। এমন কি পুজোর সময়ও নয়। কিন্তু এ সময়ে কোন একটি বড় রেলস্টেশনে গেলেই বোঝা যাবে যে, বাইরে

যাবার হুজুগ তাদের কত ! বাস রিজার্ভ করতে গেলেও দু'মাসের লাইন পড়ে। কাশী থেকে হরিদ্বার, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, রাজস্থান, গুজরাট, অজন্তা, ইলোরা, মাদ্রাজ, কেরল, ওড়িশা, পুরী, ডালহৌসী, সিমলা, দার্জিলিং, রানীক্ষেত কোথায় বাঙালীর ভিড় নেই ! বাঙালীর মুখ বোধহয় শতকরা সত্তর ভাগ। শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও আছে।

এখানে দেখি সকালবেলাই গরম পোশাক পরে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে সবাই দাঁড়িয়ে আছে বাসে ওঠার অপেক্ষায়। কয়েকটা বাস ছাড়বে—কোনটা যাবে গুলমার্গ, কোনটা উলার হ্রদ, কোনটা সোনমার্গ, কোনটা বা ভেরীনাগ। দর্শকের রুচি অনুযায়ী টিকিট কেটে সবাই তৈরী হয়ে আছে।

আশ্চর্য লাগছে বাঙালী ছেলেদের। কেউবা পরেছে কাশ্মীরী ফেরান, কেউ পরেছে চামড়ার কোট। এ-সব পরে কী উল্লাস তাদের মধ্যে! বাইরে বেরিয়ে প্রাণের এক উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে যেন তাদের মধ্যে।

বাস নাম্বার খুঁজে আমরাও আমাদের নির্দিষ্ট স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালুম। সকালবেলার হিমেল হাওয়ার মধ্যে বাস এসে দাঁড়াল। তখন সবেমাত্র স্বর্ণাভ প্রভাতসূর্য ফুটে উঠেছে। বাইরে সুন্দর নিকোনো প্রকৃতি। সম্পূর্ণ অপরিচিত, অচেনা। দেখতে ভারি সুন্দর। সহজেই মন আকৃষ্ট হয়। কাশ্মীরের ঘরবাড়ির রঙ পোড়ামাটির। এ রঙ কাশ্মীরীদের পছন্দ কেন কে জানে ! বোধহয় বোটেই কাশ্মীরের প্রকৃত জীবন লুকিয়ে আছে বলে—সেখানেই কেবল রঙের বৈচিত্র্য। সব বাড়ির মাথা ছুঁচলো ভঙ্গিতে ঊর্ধ্বমুখী। বরফ পড়ে ছাদে যাতে ভার জমতে না পারে সেজন্যই এ ব্যবস্থা।

কাশ্মীরীদের প্রকৃতি অগোছালভাবে সুন্দর হলেও শহর মোটেও পরিষ্কার নয়। রাস্তাও প্রশস্ত নয়। কাশ্মীরীরা আকৃতিগতভাবে সুন্দর হলেও পোশাক পরিচ্ছদে বোধহয় তেমন সৌন্দর্য বিচার করে না। যেখানে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি সেখানে সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ কম থাকাই স্বাভাবিক।

বাস এগিয়ে চলেছে। চারিদিকে মাঠে মাঠে নতুন চাষের চেষ্টা চলছে। দু'একটা খেতে পক্বশস্য দেখা যাচ্ছে। কাশ্মীর উপত্যকার জমি যে উর্বর সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। অজস্র পার্বত্য নির্ঝরিণী জমিকে সব সময়ই উর্বর ক'রে রেখেছে।

শ্রীনগর থেকে প্রথম উল্লেখযোগ্য যে শহরে এসে বাস থামল, তার নাম পামপুর। পামপুরের জন্য যাত্রীদের তেমন উল্লাস নেই বলে এখানে বাস বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। বাস এসে থামল অবন্তীপুরে। 'পুর' অর্থে এখানে কোন প্রাসাদ নেই। শুধুমাত্র ছোট একটি জায়গা আছে অবন্তীপুর নামে। আছে অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে একটি ভাঙা প্রাচীন মন্দির। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মন্দির একটা নয়, দুটো ছিল—একটি বিষ্ণুমন্দির, আর একটি শিবমন্দির। আমি এখনো ঠিক স্পষ্ট জানি না দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বতন্ত্রভাবে আছে কি না। তবে ভক্তজনেরা বলেন, আছেন। আমাদের দর্শন এদের অস্তিত্বের উপর খুব বেশি নির্ভর করেনি। কিন্তু তন্ত্র নাকি স্পষ্টই দেখিয়ে দিতে পারে যে, দেবদেবীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তন্ত্র বা যোগ, অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এই হল সব চেয়ে বড় জিনিস। তন্ত্রক্রিয়া যে কিছুটা ভেল্কি দেখাতে পারে, তার প্রমাণ হিমালয়ের দুধ চটিতে. সোকারি-গোলির পাহাড়ে এবং কালীঘাটের মন্দিরে আমি পেয়েছি। সেই জন্যই এ রহস্য ভেদ করার উদ্দেশ্যে আমার এত আকুলতা। কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত না হলে এ নাকি সম্ভব নয়। সেই কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের পদ্ধতিই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কোন পথ পাচ্ছি না। রহস্যময়ভাবে দু-একজন অবতীর্ণ হলেও আবার তাঁরা সরে যাচ্ছেন। জানিনা আবার তাঁদের কোথায় পাব। এবারকার যাত্রায় এ পর্যন্ত নিষ্ফল অভিযান হয়েছে বলা যায়। দেবভূমিতেই যদি সাধুসন্তের দেখা পাইনি, কাশ্মীরে কি তাদের পাব ?

শিবমন্দিরটি অবন্তীবর্মনের গড়া। বিষ্ণুমন্দির তাঁর সিংহাসনে বসার আগেই তৈরি হয়েছিল। ইতিহাস বলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে মন্দিরটি আপনিই ভেঙে পড়ে।

পথে বেরিয়ে সময়ের হিসেব রাখে না কেউ। দেখবার কিছু আছে শুনলেই তরতরিয়ে নেমে পড়ে, সেটা তার দর্শনীয় হোক বা না হোক। অনেক ভ্রমণবিলাসী আছেন যাঁদের ভ্রমণবিলাসী না বলে ভোজনবিলাসী বলা যেতে পারে। তারা যেতে যেতে খান, ভ্রমণস্থলে গিয়ে নিসর্গসৌন্দর্য লক্ষ্য না ক'রে নিজেদের মধ্যে রসালাপে ব্যস্ত থাকেন। পুরীর সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরে অনেককে বাদাম চিবুতে দেখেছি আমি! ভাঙা মন্দির ঐতিহাসিককে টানে, টানে শিল্পী আর ধার্মিক ব্যক্তিকেও। এর কোনটার প্রতিই যাঁদের আকর্ষণ নেই, দেখি তাঁরাও এখানে নেমে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে কারো বা মুখ বিকৃত –'এর আবার দেখবার আছে কি?' কিন্তু যাঁদের দেখার আছে তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন।

শ্রীনগর থেকে বেরিয়ে প্রথম একটা প্রাচীন হিন্দু কীর্তি নজরে পড়ল। আশ্চর্য! কাশ্মীর একদিন নয়, দুদিন নয়, দীর্ঘদিন হিন্দুশাসন ও সংস্কৃতির পাদপীঠ ছিল। অথচ সেখানে কালেভদ্রে এখন দু'একটা প্রাচীন হিন্দুকীর্তি নজরে পড়ে। কিন্তু নামগুলোর মধ্যে এখনও হিন্দুপ্রভাব রয়ে গেছে।

অবন্তীপুরে বাস বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। অধিকাংশেরই ইতিহাস, শিল্প বা ধর্মের প্রতি তেমন আকর্ষণ নেই। সুতরাং বাস আবার ছাড়ল। আমাদের লক্ষ্য পাহালগাঁও হলেও, এ-বাসটা ট্যুরিস্ট বাস। আশে পাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলিও সে দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং এগিয়ে গিয়ে আবার কোথাও পিছিয়ে আসতে হবে। এর ফলে সময় লাগবে বেশি। এবার অবন্তীপুর থেকে বাস এসে থামল অনন্তনাগ। এই 'নাগ' শব্দ আমাকে কুণ্ডলিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও, এ অঞ্চলে এর অর্থ ঝর্ণার উৎপত্তিস্থল। ঝর্ণাধারাগুলো এঁকেবেঁকে সাপের মত চলে বলেই বোধহয় কাশ্মীরীরা এর নাম দিয়েছিল নাগ।

অনন্তনাগ শহরটা একেবারে ছোট নয়। রাস্তায় কাশ্মীরী শীত-বস্ত্রের দোকান আছে। চা জলখাবারের ভাল ব্যবস্থাও আছে।

আমাদের বাস এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। এবার একটু পিছিয়ে গিয়ে চলল আচ্ছাবল গার্ডেনের দিকে। শ্রীনগর থেকে আচ্ছাবল গার্ডেনের দূরত্ব চল্লিশ মাইল। স্বাভাবিক একটা ঝর্ণাধারার পাশে কোন এক মোগল সম্রাট এই উদ্যান তৈরী করেছিলেন। শুনতে পেলুম দেখবার মত এক উদ্যান এই আচ্ছাবল গার্ডেন।

সত্যি দেখবার মত বাগিচা। স্বাভাবিক ঝর্ণার জল বেঁধে ফোয়ারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঝখানে সরোবর। তার মধ্যে বিশ্রামকুঞ্জ। চারিদিকে অজস্র ফুলগাছ। নানা রঙবেরঙের ফুল। তবে কোন কুঞ্জই আধুনিক সাজে সজ্জিত নয়। এর মধ্যে যেন মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা আজও অক্ষত রয়েছে। বিশ্রামকুঞ্জে ও ঝর্ণার মুখের সিঁড়িতে প্রদীপ কুঠুরি একদা হয়তো এখানে সারারাত লক্ষ লক্ষ প্রদীপ শিখা ঝলমল করে উঠত। সত্যি দেখলে চোখ ফেরে না। আমার যেন মনে হতে লাগল এ বোধহয় কোন মৃত সুন্দরীর ফটো। সে আজ নেই, কিন্তু তার ফটো আছে। পার্থিব মানুষ সেই ফটো দেখে তার সৌন্দর্যের কল্পনা করবার চেষ্টা করে কিন্তু কখনও একথাটা মনে করবার চেষ্টা করে না যে, এ সৌন্দর্যের একমাত্র পরিণতি মৃত্যু, কারণ এ সৌন্দর্য বস্তুতান্ত্রিকতার নিরিখে পরিমাপ্য। লোকে এর ইতিহাস স্মরণ করে কিন্তু ইতিহাসের অঙ্গীভূত দর্শনীয় বা পঠনীয় বিষয় যে অস্থায়ী একথা ভাবে না। ব্যক্তিজীবন বা বস্তুজীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব মানুষকে এতটুকু দোলা দেয় না। আচ্ছাবল গার্ডেনের পেছনেও তেমনি একটা ইতিহাস আছে।

আচ্ছাবল গার্ডেন ছিল এক সময় কাশ্মীরের শাসকদের বাগানবাড়ি। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে রাজা অক্ষ এটা তৈরি করেছিলেন। তারই নাম অনুসারে এবং নাম হয় অক্ষবল সে নামই বিকৃত হয়ে পরে উচ্চারিত হচ্ছে আচ্ছাবল রূপে। মাঝখানে এর একবার নামবদলও হয়েছিল। শাজাহানদুহিতা জাহান আরা কাশ্মীরে বেড়াতে এলে এই বাগান তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটা ছিল ১৬৪০ খ্রীঃ। বাগানের পেছনে প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হয়। বর্তমানে যে বিশ্রাম

কুঞ্জ, ফোয়ারা বা বাঁধানো ঝর্ণাধারা দেখা যায় সে-সবই জাহান আরার নির্দেশে নির্মিত। জাহান আরার এক নাম ছিল সাহিবা মহল। তারই নাম অনুসারে এর নতুন নাম হয় সাহিবাবাদ। মোগল আমলে বাগানটি এ নামেই পরিচিত ছিল। মোগল রাজত্ব শেষে কাশ্মীরীরা একে পুরানো নামেই ডাকতে শুরু করে। একদিন এখানে পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষার নানা অভিব্যক্তি ঘটেছিল। আজ তা নেই; এবং সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য যেন আচ্ছাবল গার্ডেন আজও অতীত ইতিহাসের কঙ্কাল হিসেবে বর্তমান আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদের জীবাশ্ম বিচারের যে কৌতূহল ভ্রমণবিলাসীদের মনে সে কৌতূহলও নেই। দার্শনিকদের দিব্যদৃষ্টি তো তাদের মধ্যে অনুপস্থিতই। তারা বোধহয় এ-সব দেখে কিছুই ভাবে না, নিজেদের চিরন্তন ভোগের অধিকারী ভেবে শুধু ভোগ করতে চায়। যেন শাশ্বত কালের সাক্ষী হিসেবে তারা এ-সব দেখে চলেছে। নিজেরা এই সব বিষয়ের মত কখনও গতায়ু হবে না। মায়ার সত্যি এ এক আশ্চর্য খেলা। সত্যকে নগ্নভাবে উত্থাপিত ক'রেও দর্শককে তার যথার্থ চরিত্র জানতে দেয় না। অনিত্য মানুষ রোগাক্রান্ত। কামলা রুগীর মত সব কিছুকেই হলুদাভ দেখে।

আচ্ছাবলে প্রায় আধঘণ্টার মত দাঁড়াল বাস। এই আধঘণ্টায় ভ্রমণবিলাসীরা তাকিয়েই দেখল শুধু কোন কিছু বিশেষ করল না। তার পর এক সময় কোকরনাগের উদ্দেশ্যে বাস ছাড়ল। অর্থাৎ এবার আমাদের পেছনে দিকে দশ মাইল সরে আসতে হবে। সেখানে নাকি কয়েকটি দেখবার মত ঝর্ণা আছে

বাসের এই পশ্চাৎগতি দেখে আমার মনে হল মানুষের ইতিহাসও এমনিভাবেই এগিয়েছে। মানুষের সভ্যতা যেন তেলেবাঁশে ওঠার মত; এগিয়ে গিয়ে আবার পিছোতে হয়। এ গতিতে এগুতে থাকলে মানুষ কবে যে তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে কে জানে! মানুষের অগ্রগতির লক্ষ্য পূর্ণতা। সীমার বন্ধন অতিক্রম ক'রে অনন্তের সাক্ষাৎ লাভ করা। এ অভিযাত্রায় মানুষ কখনও এগিয়েছে কখনও

পিছিয়েছে। এক সময় মানুষ অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা স্মরণ ক'রে অধ্যাত্মতার চর্চা করেছে; বেদ বেদান্ত উপনিষৎ রচনা করেছে; আবেস্ত, বাইবেল ইত্যাদি লিখেছে। আবার পিছিয়ে গিয়ে লোকায়ত দর্শনে মনোনিবেশ করেছে, বস্তুচর্চা করেছে। মধ্যযুগে কুসংস্কার ছিল বটে, তবে মানুষ নিজের ক্ষমতাকে সবার উর্ধ্বে স্থাপন করেনি। তাদের ভাগ্য একটি অতীন্দ্রিয় শক্তির উপর নির্ভরশীল, একথা ভেবেছে। তাই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণরূপ ভক্তি-বাদের উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে আবার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুসর্বস্ব হওয়াতে মানুষ অতীন্দ্রিয় চর্চা ভুলে, অধ্যাত্ম চর্চা ভুলে বস্তুবাদের অধীন হয়েছে। বস্তুবাদের কঠিন আঘাত আবার হয়তো তাকে অধ্যাত্মতার দিকে ফিরিয়ে দেবে: যথার্থ যা শাশ্বত, মানুষ তারই দিকে মন ফেরাবে।

আধঘণ্টার মধ্যে বাস কোকরনাগে এসে পৌছুল। পাকা রাস্তা। বাস চলায় কোন অসুবিধা নেই। ভাল ভাবেই এল। এখানে কোন দেবমন্দির নেই অনন্তনাগের মত। ভক্তজনের কাছে এর কোন তীর্থমাহাত্ম্যও নেই। লোকে এখানে আসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য। এখানে আছে ছোট্ট একটি বাগান। স্বাভাবিক কাশ্মীরী ফুলে তা ভরে উঠেছে। মানুষের হাতের কাজের চাইতে প্রকৃতির স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তিই বড়

এই স্বাভাবিক বাগানের পাশে চুনাপাথরের পাহাড়। জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। কতগুলি ঝর্ণা আছে বোঝার উপায় নেই। পাঁচটি অন্ততঃ বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই। এই ঝর্ণার জল অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। লোকে তাই বলে কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ পানীয় তার সুরা নয়, আপেল বা কমলা নেবুর রসও নয়, কোকরনাগের জল। মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজল নাকি এই ঝর্ণার জল সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'এর জল পবিত্র, স্ফটিকস্বচ্ছ ও শীতল। ক্ষুধার্ত কোন লোক এই জল পান করলে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, সে পরিতৃপ্তি লাভ করে। এই পরিতৃপ্তির জন্য আবার সে ঐ

জল পান করতে চায়। মনে মনে ভাবলাম, কোকরনাগের ঝর্ণার জলের মত আত্মার স্বাস্থ্যপ্রদ কোন একটি ঝর্ণার দেখা যদি কাশ্মীরে পেতাম! কিন্তু এ পর্যন্ত সে-ধরনের কোন ইঙ্গিত আমার চোখে পড়েনি।

কোকরনাগ ছেড়ে বাস আবার এগিয়ে চলল। আচ্ছাবল, অনন্ত-নাগ হয়ে এবার তার গতি পাহালগাঁওয়ের দিকে। কাশ্মীরের রাস্তার দুই পাশে প্রকৃতির বিপুল সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে। ক্রমশঃ যেন প্রকৃতির সৌন্দর্য পথের দুই পাশে পাখা মেলছে। এবার যেন পার্থিব সৌন্দর্যের বাইরে কিছুটা অতীন্দ্রিয়তা দেখা দিচ্ছে। ঘণ্টাখানেক চলবার পর বাস এসে থামল মাত্তান-এ। মাত্তান হিন্দুদের কাছে পবিত্র তীর্থ। এখানে সূর্যমন্দির আছে।

এতক্ষণ কাশ্মীরে যে পার্থিব সত্তার উগ্রতা ছিল মাত্তান যেন তার চাইতে সামান্য একটু ব্যতিক্রম। ঝর্ণাগুলো ওখানে অদ্ভুত এক চিত্র তৈরী করেছে যেন। সূর্যমন্দিরের সামনে পান্নারঙের এক জলাশয় দাঁড়িয়ে। মুহুর্মুহু যেন সেখানে জলের রঙ পালটাচ্ছে। যেন সূর্যের সাতটি রঙ সেখানে স্পষ্টভাবে খেলা করছে। হাজার হাজার মাছ খেলে বেড়াচ্ছে এই জলে। এগুলোকে বলে ট্রাউট মাছ। এ মাছ কেউ খায় না। মাত্তানে মাছ মারা নিষিদ্ধ।

এই এতক্ষণে হিন্দুধর্মের একটা জাগ্রত স্পর্শ পেলাম। অনেককে দেখলাম মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষে সূর্যমন্দিরের অস্তিত্ব কম। একটি আছে ওড়িশার কোণারকে। আজ তা মৃত। মাত্তানের সূর্যমন্দিরে আজও রীতিমত পুজো হয়। আসলে সূর্যের নাম অনুসারেই এস্থানের নাম হয়েছে মাত্তান, অর্থাৎ মার্তণ্ড। সম্ভবতঃ ইরানের সূর্যপূজার রীতি অনুসারেই এদেশে সূর্যপূজা আরম্ভ হয়েছিল।

কেন যেন এখানে একটা দৈবী সত্তার গন্ধ পেতে লাগলুম আমি। মনে হল, কিছু একটা বিশেষত্ব আছে এ স্থানের। দানিকেন সাহেবও নাকি সেই বিশেষত্ব অনুমান ক'রে মাত্তানের সূর্য-

মন্দিরের চারপাশ পর্যবেক্ষণ ক'রে গেছেন। তাঁর অনুমান, পৃথিবীতে দেবতাদের অবতরণক্ষেত্রের মধ্যে মাত্তানও একটি।

মাত্তানের মন্দিরের পেছনে অনেকগুলি ভগ্ন প্রস্তর। যেন অতীত বিধ্বস্ত হয়ে সেখানে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে। কৌতূহলে সেই দিকে এগিয়ে গেলুম। কাছে গিয়েই বুঝতে পারলুম যে, পুরনো স্থাপত্য নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ অর্থাৎ প্রাচীন মার্তণ্ড মন্দিরেরই ধ্বংসাবশেষ

মাত্তানে বর্তমানে যে সূর্যমন্দির আছে তা নতুন গড়া। কাশ্মীরের মুসলিম শাসনকালে বোধহয় মাত্তানের প্রাচীন সূর্যমন্দিরটি ভেঙে-ফেলা হয়েছিল। ভেঙে পড়া পাষাণ-প্রাচীরের আকৃতি দেখে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, দেওয়ালের বন্ধন ছিল চতুর্ভুজ। এই চতুর্ভুজাকৃতি বন্ধনের মধ্যেই ছিল সূর্যমন্দির।

প্রথম এই সূর্যমন্দির তৈরী হয়েছিল—খ্রীষ্টীয় ৩৭০—৫০০ অব্দের মধ্যে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন নৃপতির আমলে মন্দিরের সংস্কার হয়। এই সংস্কারকদের মধ্যে ললিতাদিত্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি খ্রীষ্টীয় ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই মন্দিরকে নতুন ক'রে তৈরী করেছিলেন। মন্দিরের আসল চেহারা কি রকম ছিল আজ তা অনুমান করার উপায় নেই। তবে ঐতিহাসিকদের ধারণা—এ মন্দিরের ছাদ ছিল পিরামিডাকৃতি। পৃথিবী থেকে দেবভূমির দিকে হাত বাড়াবার উদ্দেশ্যেই বোধহয় পিরামিডগুলি তৈরী করা হত। পরবর্তীকালে মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শনের ঊর্ধ্বমুখী গম্বুজ সেই অনন্তের প্রতি সীমিত মানুষের অভিযাত্রার প্রয়াসের কথা বোঝাবার জন্যই তৈরী হয়েছে।

মাত্তানের প্রাচীন মন্দিরের দৈর্ঘ্য ছিল ৬০ ফুট এবং প্রস্থ ৩৬ ফুট। মন্দিরের প্রাচীরে ছিল ৮৪টি সুদৃশ্য স্তম্ভ। সে সব আজ আর নেই। ইতিহাস শুধু অতীতের স্মৃতি বহন ক'রে বেড়াচ্ছে।

মাত্তানে বেশিক্ষণ দাঁড়াল না বাস। পাহালগাঁও থেকে আজই যদি শ্রীনগরে ফিরতে হয় তাহলে কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়ালে চলবে না। ফলে বাস ছেড়ে দিল।

জিতেনকে দেখি ইতিমধ্যে কয়েকজন বাঙালী ভ্রমণবিলাসীর সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। আমার সঙ্গে কথা না বললেও তার চলে যাচ্ছে। আমার অবশ্য এতে সুবিধে হয়েছে এই যে, অন্তরের সঙ্গে কথা বলবার ব্যাপক সুযোগ পেয়ে যাচ্ছি আমি।

সমতলভূমি থেকে এবার ক্রমশঃ উপরে উঠছি। সুশ্রী উপত্যকা নিচে পড়ে থাকছে। সামনে ক্রমশঃ ঘন অরণ্য নেমে আসছে। এই প্রথম দূরে পাহাড়ের মাথায় সামান্য বরফ দেখতে পেলুম, খুবই সামান্য বরফ। গত শীতের অবশিষ্ট বরফ মাথায় ক'রে পাহাড়-গুলি দাঁড়িয়ে আছে আগামী বরফপাতের অপেক্ষায়। কিছুদূরেই দাঁড়িয়ে আছে পপ্‌লার কুঞ্জ। সেখানে সবুজ শ্যামলের ছড়াছড়ি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ক্রমশঃ যেন নিজের মহিমা বিস্তার করছে। মানুষের ভ্রান্তির উর্ধ্বে সৌন্দর্যের নিজস্ব চিরন্তনতা যেন কামনাহীন যথার্থ সম্পদের সৌন্দর্যে ভরে উঠছে। ধীরে ধীরে যেন অতীন্দ্রিয়তার গন্ধ পাচ্ছি। ক্রমশ যে গাঢ় হতাশা আমাকে চেপে ধরছিল তার অক্টোপাশের মতন বাঁধনটা যেন অনেকটা শিথিল হল। যেন ধূঁয়াময় শহরের চৌহদ্দি পেরিয়ে সুনির্মল বায়ুর জগতে প্রবেশ করলুম।

আমাদের বাঁ পাশে ছোট্ট একটি পাহাড়ী নদী চোখে পড়ল। প্রবল কলোচ্ছ্বাসে উপলখণ্ডের বুকের উপর দিয়ে ফেনপুঞ্জ তুলে বয়ে চলেছে। এর নাম নীলগঙ্গা। আধুনিক নাম লীডার নদী। ক্রমে ক্রমে তার কলোচ্ছ্বাস গর্জনে পরিণত হচ্ছে যেন।

আধুনিক নাম যাই হোক, নীলগঙ্গা নামটিই আমার বুকে গেঁথে গেল। কেন যেন আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা হল, অধ্যাত্ম মহাত্মা এখানে আছে, আছে, আছে। কিছু হয়তো বা এখানে পেয়েও যেতে পারি।

গিরিখাদ ধরে নীলগঙ্গা বয়ে চলেছে। তার দুই পাশে ঘন অরণ্য। বড় বড় উপলখণ্ডের বুকে বাঁধা পেয়ে ঝর্ণাধারা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। তবে নদীবক্ষ প্রকাণ্ড বলে

কিছুদূর এগিয়েই আবার তার মূলপ্রবাহের সঙ্গে একত্র হচ্ছে। এ যেন একটা ইঙ্গিত, সত্যের প্রতি একটা ইঙ্গিত। অর্থাৎ সৃষ্টির উৎস থেকে যে প্রবাহ অবতরণের পথে বিচিত্ররূপে ফুটে উঠে বিশ্ব-জগৎ তৈরি করেছে, তা মূলতঃ এক। বিভিন্ন ধারায় সেই প্রবাহ পরবর্তী কালে প্রবাহিত হলেও আবার তা কখনও না কখনও একত্রে মিলিত হবে। বিশ্বজগতের সমস্ত বৈচিত্র্যই যে সৃষ্টির এক সূত্রে বাঁধা সে কথা সকলেই অবহিত হবে। বিভেদের বৈচিত্র্য ঐক্যের চেতনায় উদ্বোধিত হবে।

নীলগঙ্গার পাশে পাশেই পাহালগাঁয়ের দিকে যেতে হয়। নদীর ধার দিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে আমাদের বাস এগিয়ে চলেছে। শ্রীনগর থেকে এখানে শীত অনেক বেশি। শ্রীনগরে উন্মুক্ত রোদের ছড়াছড়ি। কিন্তু এখানে কেন যেন আকাশে মেঘের আনাগোনা লক্ষ্য করলুম। রোদের তেজও কম। শীতের সময় নাকি পাহাল-গাঁওয়ে ভয়ানক শীত পড়ে। প্রকৃতি এখানে একটু খামখেয়ালী। হয়তো শীতের তেমন কড়াকড়ি নেই, কিন্তু অকস্মাৎ সে হিমশীতল মৃত্যুর রূপ ধারণ করতে পারে। বাসেও দেখলুম পাহালগাঁওয়ের এই খেয়ালী প্রকৃতির জন্য সবাই তৈরি হয়েই এসেছে।

এগিয়ে চলেছি। এ যেন প্রকৃতির নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্য। জনবসতিও খুব একটা চোখে পড়ছে না। কদাচিৎ দু'একটা পাহাড়ী গ্রাম দেখা যাচ্ছে। সে-সব গ্রামের চারদিকে চেরীফুলের গাছ। গ্রামের মানুষ কেউ চলেছে হেঁটে, কেউ বা ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে। মাঝে মাঝেই মেষপালকেরা তাদের মেষপাল নিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকাতেই মেষপালকদের প্রাচুর্য, কারণ পশমী বস্ত্র কাশ্মীরের একটি বড় ব্যবসার জিনিস।

দেখতে দেখতে আরও অনেক উপরে উঠে এল আমাদের বাস। পথের ধারে ক্রমশঃ ঝর্ণার সংখ্যা বাড়তে দেখা গেল। এগুলির উৎস হয়তো দু'একদিনের মধ্যে পাহাড়ী অঞ্চলের কোথাও বৃষ্টিপাত। পাহাড়ে এরকম ঝর্ণার উৎপত্তি অহরহ হয়, অহরহই তা মিলিয়ে

যায়। এই ঝর্ণাগুলির মধ্যে দু'একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রবল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তারাও তখন ক্ষীণ প্রবাহের অধিকারী, কারণ এদের উৎসে সঞ্চিত বরফের পরিমাণ তখন খুবই কমে এসেছে। ফলে ঝর্ণাগুলির প্রাণস্রোতে উচ্ছল জলপ্রবাহ নেই।

শীতের কামড় আছে বটে, তবে তা নির্মম নয়। কারণ জানালা খুলে বসে থেকে বাইরের প্রকৃতি দেখা যাচ্ছে। এর চাইতে সকাল সন্ধ্যায় হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে বেশি শীত পড়ে। শরৎ বোধহয় এতদঞ্চলে শীতের প্রবেশদ্বার। তাই সমস্ত বনস্থলিতে একটা আসন্ন শীতের ভয় লুকিয়ে আছে বলে মনে হল। যেন সকলেই অপেক্ষা করছে শীত কখন অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই আশঙ্কায়। তুষারপাত শুরু হলেই পর্বতশৃঙ্গে বরফ জমবে। মাঠঘাট সব বরফের চাদর পরে সাদা হয়ে যাবে। গাছের পাতাগুলো বরফের আচ্ছাদনে ঢাকা পড়বে। তখন এখানকার দৃশ্য হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এগিয়ে চলেছি। নীলগঙ্গার কলধ্বনি আরও স্পষ্ট হচ্ছে। অবশেষে আমাদের বাস এসে পৌঁছুল পাহালগাঁও। আগামী শীতের ভয়ে তখনো পাহালগাঁওয়ের ক্ষুদ্র উপত্যকাটি তার শ্যামলতা হারায়নি। অমোদের সামনে তিন দিক জুড়ে পাহাড়। পাহাড় শীর্ষে ভাল করে বরফ দেখা যাচ্ছে না। পথে আসতে দূর থেকে কোন কোন পাহাড়ের চুড়োতে বরফ দেখেছিলুম। পাহালগাঁও এসে সেটাও আর নজরে পড়ছে না। চতুর্দিকে পাইন, বার্চ আর চেনার গাছ। সবুজ ঘাসে ছাওয়া পাহাড়। ক্রমশঃ সবুজের আঙিনা পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে গেছে। ডানদিকে কয়েকটা বড় বড় রেস্তোরাঁ, বাঁয়ে সামনে বোধহয় রেস্টহাউস। রাস্তার গা ঘেঁষে বাঁ দিকে নীলগঙ্গা। তার কলকল ধ্বনি অনবরত শোনা যাচ্ছে। পাহাল-গাঁওয়ে সৌন্দর্য অঢেল। কিন্তু জনতার ভিড় নেই। নীরব নির্জন উপত্যকা। জোরে কথা বললে যেন নিজের কথার প্রতিধ্বনি চার দিক থেকে ফিরে আসে।

এখানে বেশ ঠাণ্ডা। চাদরটা ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিলুম। জিতেন তার নতুন বন্ধুদের নিয়ে মেতে আছে। সকলেই নিজেকে গরম পোশাকের আড়ালে উত্তপ্ত রাখবার চেষ্টা করছে। একটা রেস্টুরেণ্টে চায়ের অর্ডার দিয়ে সকলে সঙ্গে ক'রে আনা টিফিনের সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেল।

টিফিন শেষে অনেকেই দেখলাম পাহাড়ের উপরে উঠে একটি বিখ্যাত অধিত্যকা বা মিডো দেখতে এগিয়ে গেল। জিতেন তাঁর নতুন বন্ধুদের সঙ্গে বাইসরণ দেখার পরিকল্পনা ক'রে ফেলেছিল। আমায় বলল, চল। আমি বললাম, তোরা এগো। আমি যাচ্ছি। তখন নতুন এক স্থানের দিকে আমার দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল। জিতেনরা ঘোড়ার পিঠে চেপে বাইসরণের দিকে এগিয়ে গেল।

যে পথের দিকে আমার দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল সে পথ চন্দন বাড়ির পথ। আমি সেইদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। চন্দনবাড়ি ১১০০ ফুট উঁচুতে। এর পরই ১৩০০০ ফুট উঁচুতে শেষ নাগ। সেখান থেকেই পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীরা অমরনাথ যায়। আমার বাবাও অমরনাথ মহাতীর্থে এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে অমরনাথ তীর্থযাত্রার ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা শুনেছিলাম। তাছাড়া সেখানে তাঁর অলৌকিক অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। আসলে আমার অভিজ্ঞতার গভীর চেতনায় বার বার সেই স্মৃতিই বোধহয় আমাকে আমারই অজ্ঞাতসারে অধ্যাত্ম সত্যের সন্ধানে কাশ্মীর আসতে সাহায্য করেছিল। তাই জিতেন প্রস্তাব দেওয়াতে আমি সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলুম।

বাবার স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি ভাল লিখতে পারতেন না বটে, তবে বলতে পারতেন চমৎকার। বলার ভঙ্গীতে তাঁর কাহিনীতে এমন বর্ণনার জাল বিস্তারিত হত যে, উপন্যাসের বর্ণনাকেও তা হার মানিয়ে যেত। কতবার যে তিনি অমরনাথ যাত্রার কাহিনী আমাদের বর্ণনা ক'রে শুনিয়েছিলেন তার অন্ত নেই। শুনতে শুনতে

তার নিজের অভিজ্ঞতাও যেন আমাদের মধ্যে জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়ে গিয়েছিল।

চন্দনবাড়ি থেকে রওনা হলেই নাকি হরমুখ পর্বতের শৃঙ্গদেশ নজরে পড়ে। তুষারকিরীট পরে শ্বেত আলোর শুভ্র ছটায় সে নাকি চতুর্দিক উদ্ভাসিত ক'রে রাখে। গাছপালা ক্রমশই নিবিড় হয় পথও সংকীর্ণ হতে থাকে। বাড়তে থাকে পথের খাড়াই। সে খাড়াই ভয়ঙ্কর রূপ নেয় পিস্‌সুখাঁটি নামক স্থানে এসে।

সেই খাড়াই বা চড়াই অতিক্রম করবার পর নাকি আশপাশে আর কোথাও এক আস্তরণ ঘাসও চোখে পড়ে না। পথে পথে জমে থাকে কাঁচের মত কঠিন বরফের পর্দা। কখনও কখনও নাকি পায়ের নিচে বরফের স্বচ্ছ আস্তরণগুলি মচমচ করে ওঠে। শীতের প্রকোপও ভয়ানকভাবে বাড়তে থাকে।

কিন্তু শীত যতই বাড়ুক, হাওয়া যতই তাতার দস্যুদের মত শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক না কেন, পথের দৃশ্য নাকি অপূর্ব। রুক্ষ তাম্রাভ রুদ্রাক্ষের মত বন্ধুর গিরিগাত্র ভেদ ক'রে মাঝে মাঝেই নাকি পাহাড়ের কোণগুলি শৃঙ্গের আকারে বেরিয়ে এসেছে। একটা দুটো নয় শয়ে শয়ে। সেই শৃঙ্গ থেকে ক্ষীণরেখায় ঝর্ণাধারা নেমেছে। সে দৃশ্যের নাকি তুলনা নেই। আমি চন্দনবাড়ির পথে অজানা সেই পথের দৃশ্যকে মানসনেত্রে টেনে এনে উপভোগ করবার চেষ্টা করলুম।

বাবা বলতেন, এর পরই শেষনাগ নামক স্থান। সে নাকি এক অদ্ভুত জলাশয়। যেমন নিস্তরঙ্গ, তেমনই নিস্তব্ধ। এই জলাশয়ের পূর্ব দিকে পাহাড় গলে গলে তুষারস্রাব ঝরছে। রুপোর মত সাদা সেই গলিত হিমানী এসে পড়ছে শেষনাগের বুকে। দুধের সরের মত সেই শ্বেতশুভ্র তুষার হ্রদের নীলজলে ভেসে চলেছে। মাঝে মাঝে নাকি বড় বড় বরফের টুকরোও ভেসে বেড়ায়—দেখতে অনেটা পানসী নৌকোর মত। নীলাভ হ্রদের জলে সেই ভাসমান শ্বেতশুভ্র বরফ দেখলে ভুল হয়ে যায় যে, কেউ শরতের নীল আকাশে শ্বেতশুভ্র

ভাসমান মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে, না নিচে তাকিয়ে আছে। পড়ন্ত বেলায় সূর্যের ছটা যখন পূবের পাহাড়ের তুষার কিরীটে এসে পড়ে তখন নাকি সমস্ত অঞ্চলটাকেই মায়াময় অপরূপ কোন অপার্থিব দেশ বলে ভুল হয়। সেই রঙের প্রতিবিম্ব যখন শেষনাগের নীল হ্রদের বুকে এসে পড়ে তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাতীত সৌন্দর্যে সব কিছু ভরে ওঠে।

তবে শেষনাগের সৌন্দর্যও যেমন তার যন্ত্রণাও তেমনি। শেষনাগ যেন কাঁটার আড়ালে গোলাপ ফুল। তুলতে গেলে খোঁচা খেতে হবেই। শেষনাগে নাকি জল বরফ হয়ে থাকে। হাত পায়ের ও নাকের ডগা চর্বি দিয়ে ভিজিয়ে রাখলেও নাকি তৃষ্ণার্ত হাওয়ার আক্রমণ ঠেকানো যায় না। গায়ের চামড়া মোচড়াতে থাকে। পায়ের নিচে নাকি দুঃসহ যন্ত্রণা হতে থাকে। কারো কারো মাড়ির গোড়ার রক্ত উপরে ঠেলে ওঠে। রক্তের চাপও বেড়ে যায়। মনে হয় সূর্যটা মানুষের নাগালের মধ্যে এসে পড়লে তবে ভাল হয়।

অমরনাথ যাবার পথে সর্বোচ্চ শিখর হল বায়ুযান। এর চড়াই এত ভয়ঙ্কর যে, দুঃসাহসী অভিযাত্রীও পিছিয়ে আসতে পারে। শীত যেমন প্রচণ্ড বায়ুর প্রকোপও নাকি তেমন। দার্জিলিং-এর টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখার সময় যে শীতের কামড়, বায়ুযানের শীতার্ত বায়ুর আক্রমণ নাকি তার চাইতেও হাজারো গুণ বেশি মনে হয় কোন নিষ্ঠুর দৈত্য হিমেল কেশাগ্র বাড়িয়ে বার বার আঘাত করছে।

বায়ুযানের পরেই পড়ে সুবিশাল বরফাছন্ন এক দেশ। পাহাড়ী তরঙ্গ তুলে ঢালু পথ যেন পাতালের কোন অতল গহ্বরে গিয়ে ঢুকেছে। এই ভাবে নাকি সেই ঢালুপথ নেমে গেছে মাইল তিনেক নিচুতে—একেবারে পঞ্চতরণী নামক একটি স্থানে। অমরনাথ যাবার পথে এটাই নাকি শেষ নিশীবাসের চটি।

এখানে দুটি প্রবল স্রোতস্বিনী আছে। সবসময়ই নদী দুটি প্রচণ্ড তরঙ্গক্ষুব্ধ। এত প্রবল স্রোত যে, শীতও সেখানে জল জমিয়ে

বরফ তৈরি করতে পারেনি। অথচ এই নদীর স্রোত ছাড়া আর সর্বত্রই বরফ জমে সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। সেই নদী পার হতে গিয়ে বাবার পা দুটো নাকি অনেকক্ষণের জন্য অসাড় হয়ে ছিল। সেই জলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি মনে হয় হাজার বিছে এক সঙ্গে কামড়ে দিয়েছে।

ওপারে পঞ্চতরণীর কাছে বরফপাত কম। পাঁচটা নদী সেখানে নাকি একত্রে মিলেছে। এখানে অনেকেই পূর্ব-পুরুষদের উদ্দেশে ক্রিয়া করেন। বাবাও নাকি করেছিলেন। সমুদ্রতল থেকে এস্থানের উচ্চতা ন'হাজার ফুটের মত। বরফপাত যদিও কম তবু নাকি নদীর দুই তীরে এত বরফ স্তূপীকৃত হয়ে আছে যে, পাহাড়ের মত মনে হয় তাকে। দুই তীরে বরফ জমানো থাকলেও পঞ্চতরণীর নদীতে কিন্তু জল আছে। যদিও জলের গভীরতা বেশি নয়। স্রোত প্রবল। এত স্রোত যে বাবা স্বচক্ষে একজন ঘোড়াশুদ্ধ আরোহীকে ভেসে যেতে দেখেছিলেন।

পঞ্চতরণীর সামনেই আছে এক ধ্যানমৌন পাহাড়। তারই ওপাশে অমরনাথ। এখন নাকি নদীর বাঁকে বাঁকে নতুন পথ তৈরি হয়েছে। আগে এই বিশ হাজার ফুট উঁচু পথ অতিক্রম ক'রে যেতে হত।

পঞ্চতরণীতে এক রাত কাটাতে হয়েছিল বাবাকে। সঙ্গে বেশ বড় একটা দল ছিল। বিকেলবেলা সূর্যের আলোতে ভাল ক'রে পঞ্চতরণীর দৃশ্য দেখবার জন্য সবাই বহেরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ এমন সময় বিনা নোটিশে বৃষ্টি এসে হাজির। এমন অদ্ভুত ধরনের বৃষ্টি যে, চোখে না দেখে নাকি বিশ্বাস করা অসম্ভব। মেঘের বুক থেকে জলের বদলে শুধু শীলা পড়েছিল। এবং সেই শিলায় শিলায় সমগ্র প্রান্তরটি এমন অবিশ্বাস্য শুভ্রতায় ভরে উঠেছিল যে, সেই বরফের আলোতেই সমগ্র অঞ্চলে যেন মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলে উঠেছিল। আলো আছে বটে, তীব্র আলো, কিন্তু আলোতে কোন উত্তাপ নেই। যেন হিমশীতল এক সূর্য ঠাণ্ডা আলো ছড়াচ্ছে।

এত ঠাণ্ডা যে, মানুষের কল্পনার তা বাইরে। নিঃশ্বাসের হাওয়াও যেন বরফ হয়ে যাচ্ছে। বুকের ফুসফুসে গিয়ে পৌঁছুতে পারছে না। কয়েকটা কম্বল একবারে গায়ের উপর চাপিয়ে দিয়েও নাকি বাবার মনে হয়েছিল রক্তের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে।

শীত তো শীত, তার উপর হাওয়ার তাণ্ডব নৃত্য। নরখাদক জংলীরা যেমন ড্রাম পিটিয়ে শিকারে বেরয় তার চাইতে শতগুণ জোরে যেন ড্রাম পেটাচ্ছে হাওয়া। তিন চারটে কম্বল ভেদ ক'রেও সেই হাওয়ার উন্মত্ত চিৎকার কানের ভিতর এসে রীতিমত অত্যাচার করছিল। চটিতে রাত্রিবেলা কেউ নৈশ আহার গ্রহণ করতে পারেন নি। তার কারণ এত শীতে মুখের কাছে হাত উঠিয়ে ভোজ্যদ্রব্য গলধঃকরণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

বাবা অভিজ্ঞতার কথা অভিনয় ক'রে ক'রে এমন ভাবে বর্ণনা করতেন যে, আমরা যেন মানসনেত্রে সমস্ত কিছু স্পষ্টভাবে দেখতে পেতুম। কিন্তু আরো আশ্চর্য জিনিস নাকি অপেক্ষা করে ছিল বাবাদের জন্য। পর দিন ভোরবেলা সবাই বিছানা ছেড়ে উঠতে ভয় পাচ্ছিলেন। হাওয়ায় তাদের হাত পা সরছিল না। কিন্তু বাধ্য হয়ে যখন উঠলেন, তখন দেখেন—দৃশ্যপট আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দুর্যোগের এতটুকু আভাস নেই। ইস্পাতের ফলার মত নিষ্কলঙ্ক রোদ হাসছে। বরফের উপর দুষ্টু ছেলের দাঁতের মত সূর্যরশ্মি ঝিকিমিকি করছে।

ভোরবেলা বাবা এবং তাঁর দলবল পঞ্চতরণীর দক্ষিণ তীর ঘেঁষে অমরনাথের দিকে এগিয়ে গেলেন। সদ্য পড়া বরফের কাঁচগুলি পায়ের নীচে মচ্‌মচ ক'রে ভাঙতে লাগল। প্রথম দিকে পথ তেমন দুর্গম মনে হয়নি। তার পরই ভয়াবহ আকৃতি নিয়েছিল। দেখা দিয়েছিল আবার সেই দুরূহ খাড়াই। পথ এত সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল যে পা রেখে চলাই দায়। দু-একটা জায়গায় জীবনকে বাজি রেখে তবেই এগুনো গিয়েছিল। এই সংকীর্ণ পথ বেয়ে নিচে নামতেই একসময় তারা এসে পৌঁছেছিলেন অমরগঙ্গার কাছে।

এই অমরগঙ্গাই অমরনাথ গুহা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। অদ্ভুত নাকি সেই নদী, যেন ফ্রেমে ধরে রাখা একটা ছবি। নদীর অসংখ্য ঢেউ ঢেউ হয়েই আছে, তবে তরল নয় শীতে জমানো। নদীর স্রোতের ইশারা বুঝতে কোন ভুল হয় না, তবে তাও বরফে জমানো।

অমরগঙ্গার সে দৃশ্য নাকি অপূর্ব। বরফের নদীতে বরফের নুড়ি পড়ে আছে। চারদিকে বরফ ছাড়া আর কিছু নেই। পূব আকাশ থেকে সকালবেলার সূর্যরশ্মি সেই বরফের উপর পড়ে ঝলমল করছে। কোথাও পাথরে পাথরের সহজাত ধূসরতা নেই। বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে সমগ্র পাহাড় যেন সূর্যের সাতরঙের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। উপরে আকাশ নীল, স্বচ্ছ, নিস্তরঙ্গ। হাল্কা সাদা মেঘেরা পাল তুলে ভেসে বেড়াচ্ছে।

নিস্তব্ধ গিরিবর্ত্ম অমরনাথ। বরফের উপর সূর্যকিরণ পড়ে সহস্র-প্রভায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পায়ের তলায় বরফ, ডাইনে বরফ, বাঁয়ে বরফ। পাদদেশ থেকে শিখরদেশ, সর্বত্র নিষ্কলঙ্ক তুষারের শুভ্রতা। এত বরফ যে, দেখলে কোন একটি লোক আশ্চর্য না হয়ে পারবে না। বরফের যেন চিরন্তন সার্বভৌম অধিকার সেখানে। সেই চির শুভ্রতার রাজ্য অমরনাথে গিয়ে বাবা যখন পৌঁছুলেন তখন নাকি তাঁর ভিন্নরকম এক মানসিক অবস্থা। বাবা বলতেন, পার্থিব তুষ্ট কামনা বাসনার কিছুই সেখানে মনে স্থান পায় না।

অমরনাথের গুহামুখ নাকি সমুদ্রতল থেকে সতের হাজার তিনশ কুড়ি ফুটের মত উঁচু। কিন্তু যে গোলিপথে গুহায় প্রবেশ করতে হয়, তা গুহামুখের শীর্ষদেশ থেকে প্রায় হাজার ফুট নিচে। অমরগঙ্গা থেকে গুহাতে পৌঁছুতে হলে পাঁচশ ফুট উপরে উঠতে হয়। গুহার মুখটা প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মত চওড়া। গভীরতা প্রায় বিশ ফুট। গুহার মুখে লোহার ছড় দেওয়া রেলিং। তার ভেতরে স্বাভাবিক একটা বেদীর মত। বেদীটা সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা। সেই বরফের মধ্যখানে বেদীর পাশে গুহার দেয়ালে নাকি হেলান দিয়ে রয়েছে সেই তুষারলিঙ্গ। বাবা বলতেন, যেন সহস্র শক্তির একটা

বৈদ্যুতিক আলোতে গুহাটা জ্বলছে। লিঙ্গটি নাকি এত উজ্জ্বল যে, দেখলেই মনে হয় তার মধ্যে অতিপ্রাকৃত একটা কিছু আছে।

তুষারলিঙ্গের দুইধারে আরও দুইটি তুষারমূর্তি আছে। এর একটিকে বলে গণেশ আর একটিকে হরপার্বতী। সামনে বরফের বেদীতে একটি ছোট গর্ত, প্রায় এক ফুট চওড়া একটি বাটির মত। সেই বাটিতে নাকি গুহার ছাদ থেকে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ে।

ছাদটি প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু। ছাদের নানা স্থান থেকেই জল পড়ে। লিঙ্গমূর্তির মাথায় জলপড়ার মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, জল পড়েই তা তুষারপিণ্ডের আকার নেয়। সেই পিণ্ডও নাকি দেখতে অবিকল সেই মূল শিবলিঙ্গের মত। অন্যত্রও জল পড়েই বরফ হয়ে যায়। কিন্তু বাটির মত গর্তে যে জল পড়ে তা নাকি জলই থেকে যায়। তা আর বরফ হয় না।

এই শিবলিঙ্গ নিয়ে একটি কিংবদন্তী আছে। কিংবদন্তী এই যে, প্রতি শুক্লপক্ষে অমরনাথ লিঙ্গ বাড়তে বাড়তে পূর্ণতা লাভ করে, আবার কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় হতে হতে মাটির সঙ্গে প্রায় সমতলে মিশে যায়। বাবা শিবলিঙ্গ দেখতে দেখতে মনের মধ্যে সেই কিংবদন্তীর কাহিনীটি স্মরণ করছিলেন। হঠাৎ পাশে একটি শব্দ শুনতেই কেমন চমকে গেলেন। মনে হল, কে যেন কানের কাছে বলছেন, কি ভাবছিস?

চমকে উঠে ফিরে তাকাতেই বাবা দেখেন একজন ল্যাংটা সন্ন্যাসী। মাথায় শ্বেতশুভ্র জটা। মুখভর্তি শুভ্র তুষারের মত বিলম্বিত দাড়ি ও গোঁপ। সমস্ত শরীর পর্যন্ত যেন সাদা রঙের মত। অমরনাথ গুহার আশেপাশে সাদা সাদা পাথরের গুঁড়ো পড়ে থাকে। লোকে এই পাথরের গুঁড়োকে শিবের বিভূতি বলে। বাবার মনে হয়েছিল, সেই উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দেহ বোধহয় সেই বিভূতি দিয়ে গড়া। আপাদমস্তক কোন লোক এমন শ্বেতশুভ্র হতে পারে বাবা কখনও এরকম কল্পনার মধ্যেও আনতে পারেন নি। সেই শ্বেতশুভ্র মূর্তির

চোখদুটি নাকি টলটল সরোবরের মত। সেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছায়া পড়তে পারে। বাবার সঙ্গে চোখে চোখে হতে হাসলেন তিনি। সে হাসি তো হাসি নয় যেন ঝিলিক দেওয়া বিদ্যুৎ। তিনি বললেন, যা ভাবছিস সেটা শুধুই কিংবদন্তী নয় রে, যথার্থই সত্য।

বাবার মুখে যেন কোন কথা থাকল না। তাঁর মনের কথাও সন্ন্যাসীটি বুঝতে পেরেছেন! বাবা এই প্রথম লক্ষ্য করলেন, সন্ন্যাসীটির সারা দেহ থেকে ধূপের গন্ধ বেরুচ্ছে। শুধু তাই নয়, ধূপের কাঠ পুড়ে শেষ হয়ে গেল যেমন নিচে বিভূতির মত ছাই পড়ে—সন্ন্যাসীর শরীর দিয়ে নাকি তেমনই বিভূতি ঝরছে। বাবা পরে বলতেন, আমি তখন চিনতে পারিনি, আসলে উনিই জীবন্ত শিব। বাবার জীবনে সেই ঘটনাকেই তিনি সব চেয়ে বড় ঘটনা বলে মনে করতেন। এর পর থেকেই জীবনের গতিও তাঁর ঘুরে যায়। তিনি ছিলেন ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতের সন্ত্রাসবাদী দলের একজন। দু'একজন সাহেব-সুবা খুনও করেছিলেন। হঠাৎ তিনি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বাদ দেন। বুঝতে পারেন যে, ভারতের মুক্তি তার অধ্যাত্মজীবনের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে। সেই থেকে তিনি নিজেকে বেদ-বেদান্ত উপনিষদ অধ্যয়নে নিয়োজিত করেন।

বাবাকে সেই সন্ন্যাসীটি অমরনাথ শিবলিঙ্গের যথার্থ অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কেন শুক্লপক্ষে এই লিঙ্গ বাড়ে এবং কেনই বা কৃষ্ণপক্ষে কমে যায়, তার যথার্থ অর্থও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শিব-লিঙ্গই নাকি সৃষ্টির প্রতীক। অধ্যাত্মজগতে এর চেয়ে বড় সত্য আর নাকি নেই। আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রে যাকে পুরুষ এবং প্রকৃতি বলে আসলে মুলতঃ তা দুই নয়, একেরই ভিন্ন রূপ। শিব যখন প্রকাশিত হন তখনই তিনি প্রকৃতি, যখন আত্মস্থ হল তখন শিব। তাঁর প্রকাশের কাল হল জগতের উদয়কাল। তাঁর আত্মস্থ হবার কাল হল জগতের প্রলয়ের কাল। শিব যখন যথার্থ নিজের স্বরূপে, তখন নিষ্কল পুরুষ, অর্থাৎ যাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় নি। এই অবস্থা কোন জ্ঞান বা চৈতন্যের কাছে প্রকাশিত নয়।

এই জন্যই শিবের আদি মূর্তি কৃষ্ণশিব রূপে বর্ণিত। এই কৃষ্ণশিব বা স্থির নির্বিকল্প পুরুষের মধ্যে সহজাত কারণে আলোড়ন হয়। আলোড়ন হলেই নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান হয়। কৃষ্ণশিব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের সৎ অংশ তখন চিৎ হন অর্থাৎ শ্বেতশিব হন। এর পরই আত্মবোধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অপর সম্পর্কে বোধ জন্মে অর্থাৎ 'আমি' বোধ হলেই 'তুমি' বোধ আসে। তখন একের মধ্যে দুই দেখা দেয় অর্থাৎ শিবলিঙ্গ হয়, অর্থাৎ পুরুষের অঙ্গে প্রকৃতি ফুটে ওঠে। লিঙ্গের চতুর্দিকে গৌরীপট্ট দেখা দেয়। এই ভাবেই সৃষ্টি হয়। সেই গৌরীপট্ট থেকে একাত্ম তরঙ্গে সৃষ্টি বস্তুজগৎ হিসেবে, প্রাণিজগৎ হিসেবে দেখা দেয়। অনেকে একেই হংস বলেন। শ্বাস নেবার সময় শব্দ হয় হ, ছাড়ার সময় শব্দ হয় 'স'। শ্বাস ছাড়ার সময় তা দেহের ভেতর থেকে বাইরে আসে অর্থাৎ পুরুষ থেকে জগৎ ফুটে ওঠে। শ্বাস নেবার সময় তা নিজের শরীরের ভেতর ঢুকে যায় অর্থাৎ প্রলয় হয়। অমরনাথের শিবলিঙ্গের বড় হওয়া ছোট হওয়া সেই হংসেরই প্রতীক। এই জন্যই নাকি শিবের জটায় ক্ষীণরেখা দ্বিতীয়ার চাঁদ থাকে। মাইকেলের সেই যে কথা—'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে' সেই ক্ষীণ বঙ্কিমচন্দ্রও প্রতীকময়। চাঁদ কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হতে থাকে আবার শুক্লপক্ষে বেড়ে উঠে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রের এই লয় ও প্রকাশের মতই হল জগতের উৎপত্তি ও নাশের ইতিহাস। ললাটে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা ভারতীয় শিল্পীরা এই মহৎ তত্ত্বকেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

বাবা বলতেন, সেই সাধুই তাঁকে ভারতীয় দেবদেবীর নানা মূর্তির তান্ত্রিক ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন। বাবার কাছ থেকে বহুবার সে-সব কথা শুনেছি। সে-কথা আমার নানা গ্রন্থের নানা স্থানে আমি বর্ণনাও করেছি।

সেই সন্ন্যাসী বাবাকে অদ্ভুতভাবে অলৌকিক জগতের এক রহস্য দেখিয়েছিলেন। অকস্মাৎ তিনি তাঁর বাঁ হাত বাবার বুকে রেখেছি-লেন। সঙ্গে সঙ্গে বাবার সমস্ত দেহ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চমকে

উঠেছিল। বাবা অদ্ভুত এক জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন। অমরনাথের সেই শিবলিঙ্গ যেন মুহূর্তের মধ্যে কালো হয়ে গেল। তারপর প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে লাগল। তার দেহ থেকে তীব্রবেগে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে চতুর্দিকে একটা আলোর বৃত্ত রচনা করল, যেন গৌরীপট্টের মত। শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে সেই আলোকবৃত্ত তীব্র বেগে ঘুরতে লাগল। আলোটা যেন ঘূর্ণায়মান শনিগ্রহের মত। সেই আলোকবৃত্ত দেখতে ঠিক শনিগ্রহের বলয়ের মত। একসময় ঘুরতে ঘুরতে কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গটিও আলোময় হয়ে গেল। ক্রমশঃ সেই বৃত্ত বৃহত্তর হতে হতে মহাকাশে সাদা মেঘের কুয়াশা সৃষ্টি করল। সেই কুয়াশা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে উজ্জ্বল হীরকদ্যুতি গ্রহনক্ষত্র তৈরি হয়ে গেল। তারপর একসময় সেই লিঙ্গটি পর্যন্ত ভেঙে গিয়ে এত সব অসংখ্য আলোর টুকরো ছড়িয়ে পড়ল যে, কী বলবেন তিনি! প্রচণ্ড বেগে সেই আলোকণিকাগুলি একটি কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। এত প্রচণ্ড তার বেগ যে, তিনি সহ্য করতে পারলেন না। অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সেই অজ্ঞান অবস্থায় বাবা দেখলেন যে, জ্যোতির্ময় স্বচ্ছ শূন্যে পরিচিত অপরিচিত বহু মহাপুরুষের সূক্ষ্মদেহ ভাসমান। এই জ্যোতির্ময় স্বচ্ছ জগতের ওপাশে আরো সূক্ষ্ম এক স্বচ্ছ জগৎ যেন তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। সেই স্রোতের পথে বহুদিন গত পৃথিবীর নানা নরনারীর সূক্ষ্মদেহ তীব্র গতিতে ভেসে যাচ্ছে। তারপর বাবার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরতে সন্ন্যাসীটির আর দেখা পাননি বাবা। কিন্তু এরপর থেকেই অধ্যাত্মজগৎ সম্পর্কে তাঁর এক অদ্ভুত জ্ঞান জন্মেছিল। কালী, দুর্গা, শিব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবী সম্পর্কে তিনি অদ্ভুত নতুন তথ্য প্রকাশ করতে লাগলেন। বাবা নিজেও ভেবে দেখেছেন যে, কোথাও এ-সব তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি লেখাপড়া করেননি। কিন্তু যখন পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছেও এ-সব তত্ত্ব তিনি বর্ণনা করতেন তাঁরাও এর বিরুদ্ধে কোন তর্ক করতে পারতেন না।

কিছুদিন পরই বাবা ধ্যাননেত্রে জীবন্ত দেবদেবী দেখতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, দেবদেবীর মূর্তি শুধু যে একটা প্রতীক মাত্র, তা

নয়। অনুরূপ দেবদেবীর জীবন্ত মূর্তিও আছে। সৃষ্টির নানা স্তরে এবং গ্রহান্তরে তাঁদের অবস্থান।

বাবা মাঝে মাঝে মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আশ্চর্যভাবে বলতে লাগলেন। তা ফলতেও লাগল। ছোটবেলা আমরা দেখেছি, এ-জন্যে অনেকেই বাবার কাছে আসতেন। এরপর শেষজীবনে বাবা সংসার প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। সাধনা নিয়েই থাকতেন।

বাবার মুখে নানা আলোচনা শুনে ভারতের অধ্যাত্ম সত্য সম্পর্কে আমাদের বিশেষ রকম একটা ধারণা জন্মেছিল। এ-সম্পর্কে অদ্ভুত একটা বোধও জন্মেছিল। সেই জন্য এ-জগৎ সম্পর্কে আমাদের ভাইবোনেদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই একটা আকর্ষণ জন্মে গিয়েছিল। সেই আকর্ষণ আরো প্রবল হয় দুধচটির সাধু, হরিদ্বারের বাঙালীবাবা, কনখলের নাথপন্থী সন্ন্যাসী ও সোকরি-গোলির সাধুকে দেখে। ফলে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এবার এতটা পথ তীব্র আকাঙ্ক্ষায় পাড়ি জমালেও তেমন কোন সাধুসন্তের সাক্ষাৎ পাইনি, যাঁদের দর্শন মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র চিন্তার পটভূমিটাকে পালটে দিতে পারে।

অমরনাথ যাওয়া হবে না। চন্দনবাড়ির পথে মহাতীর্থের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে দেখলাম শুধু। হয়তো কাশ্মীরেও অলৌকিক রহস্যের কেন্দ্র আছে। কিন্তু আমার কাছে তার দুয়ার কখনও অবারিত হবে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলুম।

বহুদূরে মোক্ষধাম অমরনাথ থেকে এবার দৃষ্টি ফেরালুম পারিপার্শ্বিকের দিকে। পাহালগাঁওয়ের সুন্দর উপত্যকাতে মরশুমি ফুলের মত কিছু আগেই যে ভ্রমণবিলাসীর ভিড় জমে উঠেছিল তা কোথায় যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। নিস্তব্ধ কয়েকটি বাস শুধু দাঁড়িয়ে আছে, যাত্রী নেই। বাসের ড্রাইভাররা বুঝি পরিচিত কোন আরামদায়ক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছে। ঋতুকালীন পুষ্পের মত সময় এলেই আবার আত্মপ্রকাশ করবে। শুধু লীডার নদীর একটানা উচ্ছল কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে যাত্রীরা সব কোথায় উধাও হয়ে গেছে,

ভাবতে লাগলাম। মনে হল, বাইসরণের সবুজ অধিত্যকা দেখার জন্য সবাই বোধহয় সেদিকেই গেছে। ফলে আমিও এগিয়ে গেলাম।

যাত্রীদের অপছন্দ একটি ঘোড়া এবং তার সহিসই বোধ হয় সেখানে ছিল। সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে বললাম, বাইসরণ যায়গা ?

সে বলল, জী হুজুর।

বললুম, চল।

সে আমায় ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিয়ে পেছনে তাড়া লাগাল। শিক্ষিত ঘোড়া শেখানো নির্দেশ মত এগিয়ে চলল বাইসরণের দিকে।

ঘোড়ার পিঠে বাইসরণ যেতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। কিছুদূর অবধি পথ ভালই। ঢালুভাবে প্রশস্ত পথ পাহাড় থেকে নিচে নেমে এসেছে। আমরা উপরে উঠছি। চারদিকে ঘন সবুজ পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে সবুজ তৃণের প্রলেপ। এগুতে এগুতে মনে হয় আমরা তিনটি মাত্র প্রাণী কোন্ এক দূর অভিযানে চলেছি। অন্য কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নেই।

কিছুদূর এগুবার পরই পাহাড়ের খাড়াই আরম্ভ হল। ভাঙা কাঁকরভরা পথ। লাল মাটি। সামনের দিকে ঝুঁকে ভয়ে ভয়ে চলতে হয়। মনে আশঙ্কা জাগে ঘোড়াশুদ্ধ উলটে না যাই।

বন্য ঘোড়ার অদ্ভুত এক স্বভাব, পাহাড়ী খাদের ধার ঘেঁষে চলবে। প্রতিনিয়তই মনে হয় পাশের গভীর খাদে তলিয়ে যাব।

আরো কিছুদূর এগুবার পর পাহাড়ী পথই যেন হারিয়ে গেল। মনে হল লতাপাতার মধ্য দিয়েই ঘোড়াটি এগিয়ে চলেছে। কোন কোন পথ একেবারে খাড়া হয়ে উপরে উঠেছে। বাঁ দিকের খাদ ক্রমশই গভীর হচ্ছে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ অনভ্যস্ত পথে ভয়ে ভয়ে চলবার পর অবশেষে বাইসরণ এসে পৌঁছলুম।

বাইসরণ হল চতুর্দিকে পাহাড়বেষ্টিত এক খণ্ড সবুজ তৃণভূমি। এত মসৃণ, সবুজ আর গোলাকার তৃণগুচ্ছ যে, গ্র্যাসকাটার দিয়েও

এত মোলায়েম করে কাটা যায় না। এত মসৃণ যে, সুন্দর গলফ্‌ বা ক্রিকেট খেলার মাঠও হতে পারে। দূর থেকে যেন একখণ্ড ছবির মত মনে হয়। ভ্রমণবিলাসীরা রঙবেরঙের পোশাক পরে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে। মনে হয় যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কোন মরশুমী ফুল। অধিত্যকার বুকে নামতেই জিতেনের সঙ্গে দেখা। ওরা তখন ফেরার জন্য তোড়জোড় করছে। আমায় দেখে জিতেন বলল, এত দেরি ?

কেন যে এত দেরি, সে কথা আর জিতেনকে বললুম না। কারণ, বললেও হৃদয় দিয়ে সে তা শুনবে না। এ-সব শোনার মতন মানসিক কাঠামো নিয়ে সে জন্মায়নি। জিতেন বলল, আমরা যে এখন ফিরছি ?

বললুম, এগিয়ে যা। বাসে ওঠার মুহূর্তে ঠিক তোদের গিয়ে ধরব।

জিতেনরা তখন ফেরারই উদ্যোগ করছিল। নতুন বন্ধুদের সঙ্গে সে ইতিমধ্যেই বেশ জমিয়ে ফেলেছে। তাদের সঙ্গেই সে ফিরতে লাগল। ভোর বেলায় ধীরে ধীরে যেমন আকাশের বুক থেকে নক্ষত্ররা নিভে যেতে থাকে তেমনই যেন একে একে বাইসরণের বুক থেকে ভ্রমণবিলাসীরা উধাও হয়ে যেতে লাগল।

ভিড় কমলে অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধ নির্জনতা বাইসরণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন। তাতে এই ক্ষুদ্র অধিত্যকাটুকু আরো রহস্যময় হয়ে উঠল। চিরন্তন এক বসন্তের দেশ যেন বাইসরণ। শরতের দিনেও সেখানে পাহাড়ী ফুল ফুটে রয়েছে। চারদিকে পাহাড় বেশ উঁচু। আশ্বিনের সূর্য সেই পাহাড়ের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। তাতে সবুজের উপর পাতলা একটা কালো রঙের শেড পড়লে যেরকম দেখায় সেইরকম দেখাচ্ছে বাইসরণকে। যেন এক চিরগম্ভীর সবুজ অধিত্যকা আমাদের সামনে অপ্রগল্ভ যৌবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘোড়া থেকে নেমে সেই নরম সবুজের বুকে পা রাখলুম। সামান্য কথাবার্তাও যেন চারদিকে দেয়ালে আঘাত খেয়ে গমগম

করছে। দেখলে চোখ জুড়োয় বললেই হবে না, চোখের পাতায় যেন স্নিগ্ধ এক কাজলের রেখা এঁকে দেয় কেউ। রহস্যময় এক অবগুণ্ঠন টেনে সৌন্দর্য যেন মায়া ছড়ায়।

চতুর্দিকে সবুজ পাহাড়। নিচে সবুজ গালিচার বুকে পা দিয়ে আমি, আমার সহিস ও ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে। এই তিনটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখতে লাগলাম আমি। উত্তরপূর্ব কোণে পাহাড়ের ধূসর অরণ্যহীন মাথায় গত শীতের অবশিষ্ট বরফ জমে আছে। যেন তুষারেরা লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে বিশ্রাম নিচ্ছে। পর্বতশীর্ষে এত কাছ থেকে আগে আর কখনও বরফ দেখিনি। মৌন গাম্ভীর্য চারদিকে থমথম করছে। এ যেন রহস্যময় অলকাপুরীর একটা প্রবেশ পথ।

আমার মনে হল পৃথিবীতে কিছু কিছু স্থান আছে যাকে দেবতারা তাদের অবতরণ ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াকে দেখে সেরকম একটা স্থান বলে আমার মনে হয়েছিল। তিব্বতের মানস কৈলাসও নাকি তেমনই একটি ক্ষেত্র। কেদারবদ্রী আমি যাইনি—সেখানেও নাকি রহস্যময় মনোরম কুয়াশায় হিমালয়ের আঙিনায় দেবভূমির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাইসরণকে আমার তেমনই একটি স্থান বলে মনে হল। মনে হল, এটি যথার্থই সূক্ষ্মদেহী প্রাণীদের বিচরণভূমি। মানুষের অনধিকার প্রবেশ এখানে বন্ধ হলেই সেই সূক্ষ্মদেহীদের পদার্পণ ঘটে।

ইসলাম ও খ্রীষ্টানদের কিংবদন্তীতে জিন ও পরীদের সূক্ষ্ম অস্তিত্বের কথা আছে। এই সব লঘুদেহী আত্মারা মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারে। আধুনিক মানুষ এদের অস্তিত্বকে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিলেও আমার বাবা এদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। সেই বিশ্বাসের উত্তরাধিকার আমার মধ্যেও ছিল। আমার মনে হল, বাইসরণের এই প্রান্তর সেই পরীদের বিচরণক্ষেত্র।

সময় হাতে নেই। তাই মিনিট বিশেক পরেই বাইসরণ থেকে আমার ফিরতি যাত্রা শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস পাহালগাঁও

থেকে শ্রীনগরের দিকে ফিরতে শুরু করবে। সুতরাং হৃদয় মনে স্নিগ্ধ শিশিরের স্পর্শ অনুভব করলেও বিলম্বিত বুক পেতে সেখানে অপেক্ষা করা সম্ভব হল না। শুধু মনে হতে লাগল, দেবদেবীর সাক্ষাৎ না মিললেও বাইসরণ থাকলে হয়তো তাদের Messenger বা দেবদূতের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারত।

পাহালগাঁও থেকে ফিরে আসার পর পরদিন বেরুলাম ডাল লেক ঘুরে দেখতে। ডাল ইন্দ্রিয়বিলাসীদের জন্য একথা সবারই জানা আছে। আমার অভীষ্টের সাক্ষাৎ সেখানে পাওয়া কদাচ সম্ভব নয়। তবু জিতেন যখন আমার সঙ্গী. তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে জিতেনের অপর দুই নতুন বন্ধুর সঙ্গে পর দিন সারাদিনের মত পরিকল্পনা ছকে ডালে বেরুনো গেল। পাখাহীন জলের প্রজাপতি হল কাশ্মীরের শিকারা। হাল্কা রঙিন এমন পতঙ্গের মত নৌকো পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। সেই শিকারার গদিতে বসে জিতেন তার নতুন বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে নানা কাহিনীর চাট মিশিয়ে ডালের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে চলল। ফলে একভাবে নিজের মনের সঙ্গে কথা বলে ডাললেক উপভোগের সুযোগ পেলুম আমি।

ঝিলমে আমাদের বোট থেকে রওনা হয়ে মিনিট পনেরর মত লাগল ডাল লেকের মুখে এসে পৌঁছুতে। এখানে ডাল লেক তেমন প্রশস্ত নয়। বোধহয় কৃত্রিমভাবে কাটা ও লম্বা। জলও গভীর নয়। নিচে শ্যাওলা ও জলজ উদ্ভিদ। পূর্ববাংলায় শীতের টানে মাঠে ঘাটে জলের নিচে যে রকম শ্যাওলা জন্মে, ঠিক সেই রকম দেখতে। তবে এর কৃতিত্ব এইখানে যে, চারদিকে এ লেক পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। পাহাড়ের ছায়া পড়ে এ হ্রদ ভিন্ন এক রূপ নিয়েছে।

ডাল-এর পূর্বতীর বাঁধানো। সেখানে দোকান পসার, হোটেল, রেস্তোরাঁ, সরাইখানা সবই আছে। সবই আধুনিক সাজে সজ্জিত। এর কারণ এই যে, ডাললেক হল ভ্রমণবিলাসীদের স্বপ্নের জগৎ।

কাশ্মীরে আসে এখানেই তারা বিশ্রাম যাপন করতে। সুতরাং একে সাজিয়ে না রাখলে চলে না।

ডাল-এর পশ্চিম তীরে শ্রীনগর শহর। সেখানে ডালের ধারে ধারে সারি বাঁধা হাউস বোট। ডাল লেকের হাউসবোটগুলি বেশ বড়, সুন্দর আর সাজানো-গুছানো। লেক থেকে ক্যানাল কেটে ভেতরেও জল নেওয়া হয়েছে। সেখানেও বড় বড় বোট রয়েছে। কিছুদূর এগুলে দুধারেই বোট নজরে পড়ে। অজস্র শিকারা ডালের পুব পাড়ে অপেক্ষা ক'রে আছে। ইতিমধ্যেই বহু শিকারা জলে ভেসেছে। পার্থিব দৃষ্টিতে, পার্থিব আকাঙ্ক্ষায় যাঁরা ডাল লেককে দেখেন, তাদের কাছে ডালের শিকারা একক এবং অদ্বিতীয়। এই শিকারাগুলিকে দেখে কেন যেন বার বার আমার প্রজাপতির কথা মনে পড়ে। শিকারা হল হাল্কা ছোট নৌকো। মাঝখানে চাঁদোয়া। সামনে পেছনে কুশন। বসলেই মাথায় একটা নবাবী মেজাজ ও পার্থিব বিলাসের স্বপ্ন জাগে। বিবাহ বাসরের বর যেমন একদিনের বাদশা, তেমনই—এখানকার স্বল্প সময়ের শিকারা আরোহীরা মুহূর্তের জন্য ভুলে যান যে, তাঁরা কেউ অফিসের কেরানী, স্কুলের শিক্ষক বা কলেজের অধ্যাপক। এই ভ্রান্তিই হল পৃথিবীর মায়া, যা মানুষকে তার যথার্থ স্বরূপ থেকে আড়াল ক'রে রাখে।

আমাদের শিকারা এগিয়ে চলেছে। ক্রমশঃ প্রকৃতির নিজের হাতে তৈরী করা ডাল লেকের মধ্যে এসে পড়ছি। এখানে ডালের জল টলটল করছে। শীতে শুনেছি এখানে বরফের চাদর পড়ে। তখন আর শিকারা চলে না। লোকে বোধহয় এর উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে পারে।

ডালের উৎস কোথায় কে জানে! সম্ভবত চতুর্দিকের পর্বত শ্রেণীই ডালের উৎস। সেখান থেকে অজস্র ঝর্ণাধারা ডাল-এ জল সরবরাহ করে।

আমাদের শিকারা এগিয়ে চলেছে। সকলেরই মুখে পার্থিব উপভোগের আমেজ ও উল্লাসের ছায়া। এগুতে এগুতে আমাদের

শিকারা ছোট একটি পার্কের কাছে এসে থামল। পার্কের গায়ে নাম লেখ 'নেহেরু পার্ক'। নানা ফুলের চারা দিয়ে ইংরেজীতে লেখা। এখানে বড় রেস্টুরেন্ট আছে। এখান থেকেও অনেক শিকারা ছাড়ে। মোটর লঞ্চও আছে। কাশ্মীরে যারা ভোগবিলাসের অভিনয় করতে চায় তারা এখানে থামে। অপ্রয়োজনীয় বেশি দামে কফি খায়। জিতেনের ইচ্ছে ছিল এখানে নামে। কিন্তু তার নতুন বন্ধুরা দেখি অনেক বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন। অপ্রয়োজনীয় খরচ করতে তারা নারাজ। আমার এসব পশ্চিমী কায়দার বিলাসব্যসন মোটেই ধাতে সয় না। সুতরাং আমি তো রাজি নইই। সুতরাং দূর থেকে নেহেরু পার্ক দেখেই এগিয়ে চললুম আমরা।

নেহেরু পার্ক থেকেই ডাল হ্রদ বিস্তৃত হয়ে গেছে। এখন আর এর নিচে জলজ উদ্ভিদ দেখা যায় না। জল টল্‌টল্‌ করছে সাগরের জলের মত। সামনেই সুইমিং স্টেশন। বিলাসী লোকেরা সেখানে সাঁতার কাটে। এরকম সাঁতারে আমার আগ্রহ নেই। আসলে পশ্চিমী কায়দার কোন জিনিসই আমার মনের মত নয়।

ডালের বিস্তৃতি সত্যিই বিরাট। তিন দিকে পাহাড়। পশ্চিম দিকে ডালের পাহাড় উত্তর-পশ্চিমে ঘুরে গেছে। শ্রীনগরের এটা পেছনের দিক। সেখানেও অনেকদূর অবধি হাউসবোট বাঁধা। ডাইনের পাহাড়ের ছায়ার নিচে পথিকদের জন্য হোটেল ও হাউস বোট। কাশ্মীরের মহারাজার বাড়িও আছে এখানে। অধিকাংশ ইউরোপীয় বড় বড় পর্যটক ডালের উত্তর-পূব কোণায় পাহাড়ের ছাউনিতে গড়া রেস্টহাউসে থাকেন। ওদিকটা রাজামহারাজাদের জন্য। পৃথিবীকেই যারা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, পার্থিব বাসনা কামনার মূল্য যারা বেশী দেয়, তাদের দৃষ্টি সেই দিকেই বেশি। কিন্তু পার্থিব ঐশ্বর্যের আড়ম্বর যেখানে বেশি সেখানে অন্তত আমি নেই। যেখানে প্রশান্তি নেই, সেখানেও আমি নেই। আমার কাছে তুলসীতলার মাটির প্রদীপের মূল্য ঝাড়বাতি বা নিয়ন লাইটের চাইতে অনেক বেশি।

পাহাড়ঘেরা ডালের জলই এখানে আমার কাছে একমাত্র দর্শনীয় বিষয়, তার বাইরে মানুষের কৃত্রিমতার যতটুকু উপস্থিতি, তা আমাদের মত লোকের কাছে বেদনাদায়ক। আমার মনে হতে লাগল, মানুষের সভ্যতা সৃষ্টি হবার আগে নিরলঙ্কার ডাললেক যখন আপন নির্ভেজাল স্বাভাবিকতায় বিরাজ করত, তখন কোন কালের অকৃত্রিম প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তাকে যে চোখে দেখত সেই চোখে আজও তাকে দেখতে পেলে ডালের সৌন্দর্যের মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় সৌন্দের্যের স্বাদ পাওয়া যেত। কিন্তু মানুষের মেকী হাতের ছোঁয়া তার পবিত্রতা বহুলাংশেই ক্ষুণ্ণ করেছে।

আমাদের শিকারা ডালের বুকে ক্ষুদ্র একটি রঙিন দ্বীপ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে। সেই দ্বীপের নাম চারচিনার। অথৈ জল-রাশির বুকে ক্ষুদ্র একটি রঙিন দ্বীপ। যে-কোন মুহূর্তে জলের উচ্ছ্বাসে সে দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। নির্জন একাকিত্বে সেই দ্বীপ কী অসীম সাহসে যে এখনও জীবনের উন্মাদনা দেখাচ্ছে কে জানে! যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নিঃসঙ্গ মানুষেরই মত তার অবস্থান।

অথৈ জলরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র একটা রঙিন বিন্দুর মত ভাসতে ভাসতে চলেছি আমরা। বেশ লাগছে। পাহাড়ের ছায়ায় এইখানে ডালের সৌন্দর্য তবু মনকে বেশ টানছে। এগুতে এগুতে শেষ পর্যন্ত চারচিনার দ্বীপের কুলে এসে আমাদের শিকারা ভিড়ল। এবার ভাল ক'রে তার রূপ চোখে পড়ল। চারচিনার যেন দুর থেকে দেখা একটা জ্বলন্ত গ্রহের মত। কাছে গেলে পাহাড় পর্বত, খাদ সব চোখে পড়ে। আসলে এটাও ডালের বুকে একটি ব্যবসার কেন্দ্র। মেজাজী পথিকদের চিত্তহরণ করে চারচিনার। কফি খাওয়ানোর নাম করে তাদের পকেট কর্তন করে। এই ব্যবসায়িক সৌন্দর্যের প্রতি আমার অন্ততঃ কোন আকর্ষণ নেই। এ যেন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কলগার্ল। সাজানো গোছানো কিন্তু হৃদয়ের স্পর্শহীন।

চারচিনারের ইতিহাস জিতেনের নতুন বন্ধুদের জানা ছিল। সুতরাং প্রতারিত হবার ভয়ে তারা এখানে নামল না। আমি তাতে

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম। আমাদের শিকারাওয়ালা বাধ্য হয়ে চারচিনার ত্যাগ ক'রে আবার তার শিকারা ভাসাল।

জিতেনরা দেখছে আর কথা বলছে। শিকারা এগুচ্ছে আর আমি নিজের মনে ভাবছি ডালের যা নিজস্ব ইতিহাস, অর্থাৎ তার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি তা ভৌগোলিকদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এর উপর মানুষের যতটুকু কৃত্রিমতার ছাপ পড়েছে তার সবারই একটা কাহিনী অর্থে ইতিহাস আছে। সেই অর্থে চিনার দ্বীপেরও ইতিহাস রয়েছে। দুটি উল্লেখযোগ্য চিনার দ্বীপ আছে ডাল-এ। এগুলি স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম দ্বীপ। মধ্যযুগের শাসকেরা এগুলোকে গড়ে তুলেছিলেন। বড় দ্বীপটির নাম ছিল আগে সোনালংক বা সোনালী দ্বীপ। সোনালী দ্বীপে সম্রাট জয়নুল আবেদিন একটি তিনতলা প্রসাদ নির্মাণ করেছিলেন। দ্বীপটির পত্তন হয়েছিল ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে। বিপদের সময় যাতে নৌকো আরোহীরা এখানে আশ্রয় পায় সেইজন্য সম্রাট দ্বীপটি গড়েছিলেন। ভূমিকম্পের ফলে প্রাসাদটি নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি কুটির নির্মাণ করেছিলেন। সে কুটীরটিও আজ নেই। নাসিমবাগে দাঁড়িয়ে আজও নাকি দ্বীপটিকে চোখে পড়ে।

রূপালংক বা চারচিনার দ্বীপটির পত্তন করেছিলেন সুলতান হাসান শাহ্। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কাছেও দ্বীপটি খুব প্রিয় ছিল। বসন্তে এই দ্বীপটিতে অপরূপ ফুলের সমারোহ হয়। হাজার হাজার পাখি বাইরে থেকে এসে এই দ্বীপে নামে। আজও তারা নামে বটে, তবে ইতিহাসের ধূসর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া দ্বীপটিতে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য আর কিছু নেই। আসলে পার্থিব সম্পদের অহংকারে যে মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করতে চায় সে ইতিহাস মরণশীল মানুষেরই মত ক্ষণস্থায়ী। চিরন্তন সৌন্দর্যপিপাসুদের কাছে তার কোন মূল্য নেই। একথা পার্থিব চেতনার মানুষ স্মরণ করতে চায় না, তারা ক্ষণস্থায়ী ইতিহাসকে স্মরণ ক'রে তাদের অনিত্য কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করতে চায়। সেই জন্যই রাজনৈতিক ইতিহাসের আবেদন আমার

কাছে খুব একটা নেই। পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গিতে সৃষ্টিকরা তার শিল্প সাহিত্যও সেই কারণেই অর্থহীন। কিন্তু যে শিল্প চিরন্তনের সন্ধানে সত্যের রূপরেখা অঙ্কন করার চেষ্টা করেছে সে শিল্পের আয়ু দীর্ঘবিস্তার। মানবাত্মাকে মোক্ষের পথে পরিচালিত করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তা অমলিন। সম্ভবতঃ মোক্ষে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয়প্রাপ্ত হলেও সে শিল্পের মৃত্যু নেই। যথার্থ যে শব্দব্রহ্মণ তা থেকেই তার উৎপত্তি এবং সুক্ষ্মরূপে ব্রহ্মণেই তার স্থিতি। সেইজন্য যে প্রতীকে তার বাক্যগুলিকে গ্রন্থিত করা হয়েছে তাকে বলে অক্ষর অর্থাৎ যার ক্ষয় নেই। কিন্তু এত সত্ত্বেও চিরন্তনের প্রতি মানুষের আগ্রহ কৈ? ক্ষণস্থায়ী সুন্দরকে নিয়েই ব্যস্ত।

চারচিনার দেখে এ-সব ভাবতে ভাবতে আমাদের শিকারা এসে পড়ল ডালের বিপুল পরিধির মধ্যে। আমাদের সামনে একটা পাহাড় মতন। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে শঙ্করাচারিয়া হিল বা শঙ্করাচার্য পর্বত। কাশ্মীরের ইদানীং কালের লোকেরা বলে তখৎ-ই-সুলেমন অর্থাৎ সুলেমনের সিংহাসন। সুলেমন কথাটি এখানে এল কেমন করে ঠিক জানা যায় না। তবে 'সুলেমনের সিংহাসন' এই কথাটি খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশ' বছর আগেও ইরানদেশে চালু ছিল। তুর্কীস্তানে (বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত) এক বৌদ্ধ মন্দিরকেও সেখানকার লোকেরা 'তখৎ-ই-সুলেমন' বলত। এই সুলেমনের পেছনে অধ্যাত্ম ইতিহাস কি, সত্যিই তা বিচার্য বিষয়।

'তখৎ-ই-সুলেমন' কথাটির অর্থ স্পষ্ট না হলেও শঙ্করাচারিয়া হিলের উপর যে মন্দির আছে তার ইতিহাস দীর্ঘ। এই পর্বতের চূড়ায় প্রথম মন্দির গড়েন সম্রাট অশোকের পরবর্তী রাজা জলৌক। রাজতরঙ্গিণীর লেখক কহ্লনের মতে জলৌক ছিলেন প্রিয়দর্শী অর্থাৎ সম্রাট অশোকের পুত্র। ভারতবর্ষের ইতিহাসে জলৌকের নাম নেই, এই জন্যেই অনেকে মনে করেন যে, তিনি একজন স্থানীয় শাসক ছিলেন। তাঁর সময় আনুমানিক খ্রীষ্টের জন্মের দশ বছর আগে। জলৌকের সাতশ' বছর পরে মন্দিরটিকে নতুন ক'রে গড়া হয়,

গড়েন রাজা গোপাদিত্য। কিন্তু আঞ্চলিক ইতিহাসের বিভিন্ন রাজার নাম তলিয়ে গিয়ে এখন এ পর্বতটি শঙ্করাচারিয়া হিল নামেই পরিচিত। বোধহয় শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের কালে এখানে একটি মঠ তৈরি করেছিলেন। তিনি যে কাশ্মীরে এসে বৌদ্ধদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের পরাজিত ক'রে এতদঞ্চলে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইতিহাসে সে বিষয়ে উল্লেখ আছে। তবে বর্তমান পর্বতটি শঙ্করাচারিয়া হিল নামে পরিচিত হলেও শঙ্করাচার্য নির্মিত সে মন্দিরটিও আর নাকি নেই। তার ভগ্নবশেষের পাশে নতুন শিবমন্দির গড়ে দিয়েছেন কাশ্মীরের বর্তমান হিন্দু রাজারা।

ডাল লেক থেকে শঙ্করাচারিয়া হিলের দিকে দৃষ্টি যেতে আমার মনে কেন যেন ক্ষীণ একটা আশার আলো উঁকি দিল। হয়তো বা ওখানে কিছু থাকতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে স্থির ক'রে ফেললুম পরদিনই শঙ্করাচারিয়া হিল দেখতে যাব। জিতেনরা যদি না যায় আমি একাই যাব।

ডাল লেক থেকে হরিপর্বতকে আরও রহস্যময় দেখায়। এর পাদদেশে বিরাট এক প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। প্রাচীরের মধ্যে একটি দুর্গ। হরিপর্বত নাম শুনে ও তার রহস্যময় চিত্র দেখে সে সম্পর্কেও আমার মনে কেন যেন একটি কৌতূহল উঁকি দিল। কিন্তু পেছনের ইতিহাস যখন জানলুম তখন হতাশ বোধ করলুম। হরিপর্বত নাম হলেও তার উপর যে স্থাপত্য কীর্তি বর্তমান রয়েছে সেখানে হিন্দু অধ্যাত্মবাদের কোন স্পর্শ নেই। হরিপর্বতের প্রাচীর গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন সম্রাট আকবর। তাঁর সুবেদার ইউসুফ খাঁ এই প্রাচীর গড়ার দায়িত্ব নেন। এক কোটি পনের লক্ষ টাকা ব্যয় করেও সম্রাট আকবর এই কাজ শেষ করতে পারেন নি। শেষ করেন তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর। দুর্গ তৈরি হবার আগেই নাকি এখানে মনোরম প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল। মোগল বস্তুপ্রীতির এটি একটি স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত। বিলাসব্যসনে অনুরক্ত মোগলেরা স্বভাবতই

এখানে প্রাসাদের সামনে একটি বাগিচা তৈরি করেছিলেন। এই বাগিচা দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তক সম্রাট আকবরেরও খুব প্রিয় ছিল। জাহাঙ্গীর আরো মনোরম করে সাজান এই প্রাসাদকে। দেশ বিদেশ থেকে নানা চিত্রসম্ভার এনে প্রাসাদকে জাঁকিয়ে তোলেন। ফলে অধ্যাত্মতার কিছুমাত্র ছোঁয়া সেখানে নেই। পর্বত শীর্ষে এখন যে দুর্গ দেখা যাচ্ছে সেটা তৈরি করেন কাশ্মীরের আফগান শাসক আতা-মহম্মদ খাঁ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে। হরিপর্বতের রহস্যময় ছায়ার মধ্যেও আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর উপস্থিতির কোন সম্ভাবনা নেই দেখে মনে মনে আমি সত্যই ব্যথা পেলুম। এতক্ষণে আমার মনে হল অধ্যাত্ম সত্যের সন্ধানে কাশ্মীরে আসাই আমার ভুল হয়েছে। কাশ্মীরে যদি অতীন্দ্রিয় জগতের কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করা যায় তবে তা একমাত্র অমরনাথেই পাওয়া যেতে পারে। অথচ অমরনাথ যাবার প্রস্তুতি নিয়ে আমি আসিনি। এবারকার যাত্রা যে সম্পূর্ণ নিস্ফল হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিতান্তই হতাশ বোধ করলুম।

চারচিনার ছাড়িয়ে আমাদের শিকারা এগিয়ে চলেছে। মৃদু হাওয়ায় হ্রদের বুকে তরঙ্গ ফুটেছে। আমাদের একটি মাত্র নিঃসঙ্গ শিকারা। আর কোন ভ্রমণবিলাসীর শিকারা আজ এদিকে বেরয়নি। ঢেউয়ের তালে তালে আমাদের শিকারা নাচছে। একজন সাধকের মুখে শুনেছিলুম যে, সাধক যখন কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত ক'রে চক্র অতিক্রম করেন তখন থেকেই সমগ্র বিশ্বজগতের দেশটাকে (space) সমুদ্র সদৃশ বলে মনে হয়। ক্রমউর্ধ্বমুখী সাধকের সূক্ষ্মদেহ সেখানে এক ধরনের দোলা অনুভব করে। ঢেউয়ের বুকে তরণী যেরকম দোলে সেই দোল্ অনেকটা অনুরূপ। ডালের পরিধি ক্রমশঃ বিপুল হচ্ছে। মানসিক অবস্থা সেরকম থাকলে হয়তো সেই সূক্ষ্ম সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলা অনুভব করতুম। কিন্তু সেরকম কোন অনুভব আমার মধ্যে আসছে না।

আমাদের শিকারা ডাল ছাড়িয়ে নাগিন হ্রদের দিকে এগিয়ে

চলেছে। একই হ্রদের দুই অংশে দুই নাম। পশ্চিমে নাগিন পূর্বে ডাল। অনেকে দুটোকেই ডাল হ্রদ বলেন। পশ্চিম অংশে হ্রদের নাম নাগিন করেছিল কে, কেন, তার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। তবে নাগিনের বুকে একটা রহস্যময়তা আছে। সে রহস্যময়তা যথার্থই হয়তো অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে ভাবনাকে টেনে নিয়ে যেতে পারত যদি পারিপার্শ্বিকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর সৌন্দর্য-সম্ভারের এই প্রাচুর্য না থাকত। চতুর্দিকের বস্তুতান্ত্রিক আকর্ষণীয়তা নাগিনের মধ্যে অধ্যাত্মতার ক্ষীণ সম্ভাবনাকেও নাশ করে দিয়েছে। নাগ কথার একটা অর্থ তন্ত্রে আছে। যেমন ন + আগ = নাগ। সমুদ্রের ঢেউকে সেই অর্থে নাগ বলে। কারণ আপাত দৃষ্টিতে সমুদ্রের ঢেউকে অগ্রসরমান বলে মনে হলেও কার্যতঃ তা মোটেও এগোয় না। হাওয়া সঞ্চালিত ডালের বুকে সেই রকম ঢেউয়ের উত্থানপতন হয়। কিন্তু মূলত ডালের জল স্থির বন্ধনে আবদ্ধ। ডাল সমুদ্রের তুলনায় ক্ষুদ্র। সেই জন্য বোধ হয় ন + আগ = নাগকে এখানে নাগিন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাগিন অতিক্রম ক'রে শিকারা এগিয়ে চলেছে তীর লক্ষ্য ক'রে। সেখানে আছে দুটি মোগল উদ্যান—নিশাতবাগ আর শালিমার বাগ। ডালহ্রদের তীরে হজরতবাল মসজিদের আগে আরও একটি বাগিচা আছে, নাম নাসিমবাগ। শঙ্করাচারিয়া হিলের পুব দিকে আছে চশমাশাহী। এ যাত্রায় আমাদের দর্শনীয় হল শালিমার বাগ, নিশাতবাগ, নাসিমবাগ আর হজরতবাল মসজিদ।

নাগিনের কুলে শিকারা ফেরার পর আমরা প্রথম দেখলাম নিশাতবাগ। মধ্যযুগের ভোগবাসনার এ আর একটি নমুনা। ধাপে ধাপে হ্রদের ধার থেকে নিশাতবাগ উদ্যান উপরে উঠে গেছে। দুই ধারে মরশুমী ফুলের নকশা। মাঝে সবুজ লন। বড় বড় কয়েকটি ফলের গাছ। মাঝখানে পথ। পথের মধ্য দিয়ে নেমেছে ঝর্ণাধারা। সেই সেই ঝর্ণাধারার স্বাভাবিক প্রবাহ আজ আর নেই। অন্য দিকে নাকি এর গতি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিশাতবাগ তৈরি

করেছিলেন মোগল আমীর আসফ খাঁ। এ নামের অর্থ প্রমোদ কুঞ্জ। পার্থিব চিত্তবৃত্তির খোরাক হিসেবে এ বাগের সার্থকতা আছে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমার কাছে এখন আর এর কোন আকর্ষণীয়তা নেই। কিন্তু যাদের কাছে আছে তাদের কাছেও এসব চিত্তাকর্ষক জিনিস তৃপ্তিদায়ক কিনা সন্দেহ আছে। পার্থিব কোন স্পর্শ কোন সৌন্দর্যই আসলে তৃপ্তিদায়ক নয়। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান তাই ভেরীনাগ দেখে জাহাঙ্গীরকে বলেছিলেন, জীবন বড় ছোট জাঁহাপনা। সারাজীবনেও এ-সব দেখে তৃপ্তি হবে না। বস্তুতঃ ভোগের উপাদানে ভোগাকাঙ্ক্ষার কখনও তৃপ্তি হয় না। এই জন্যই পঞ্চ'ম'কারকে যারা স্থূল অর্থে ধরে নিয়ে তন্ত্রসাধনা করে তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। ভোগ ক'রে ভোগ বাসনার পরিতৃপ্তি অসম্ভব। বাসনা হল আগুন, ভোগের উপাদান ঘি। আগুনে যতই ঘি ঢালা যাবে ততই যে বেশি জ্বলে উঠবে। নির্বাপিত হবে না। আগুন নেভাতে হলে জল দরকার। অধ্যাত্ম সত্যই সেই জল। সুতরাং নিশাতবাগ আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে পারল না।

নিশাতবাগ থেকে একটা স্থানীয় বাসে এগিয়ে গেলুম শালিমার বাগ-এর দিকে। শিকারা ক'রেও শালিমার বাগ যাওয়া যায়, কিন্তু তত সময় আমাদের হাতে নেই বলে বাসেই গেলুম।

শালিমার বাগ ডালহ্রদের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। গেটে ফুল ওয়ালাদের কাছ থেকে কয়েকগুচ্ছ ফুল নিয়ে জিতেনরা ভেতরে ঢুকল। আমি নিলুম না। ফুলদানিতে ফুল রেখে বা ফুল দিয়ে দেবপূজা ক'রে পরিতৃপ্ত হবার মত মানসিকতা আমার নেই। এই জন্য বাংলার অধ্যাপকেরা যখন ভাবার্থ দেন: 'ফুল আপনার জন্য ফোটে না' আমি তার প্রতিবাদ করি। ভ্রান্ত কল্পনাবিলাসের এ একটি বিশেষ নমুনা। বোটানী যারা পড়েছেন, তারা জানেন যে, জগতের সৃষ্টিযজ্ঞে ফুলেরও বিশেষ একটা ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকা পালন করার জন্যই তার স্ফুটন। ফুলের জীবনও আছে। বৃন্তচ্যুত ক'রে তাকে ছিঁড়ে এনে বিলাস করা বা ভক্তি দেখানো হল মানুষের কাঁধ

থেকে জোর ক'রে তার মাথা ছিঁড়ে নিয়ে আফ্রিকার কোন আদিম জগতের মানুষের উল্লাস করার মত।

শালিমার বাগ অর্থ হল—ভালবাসার কুঞ্জ—Abode of love। এ কুঞ্জ তৈরি করেছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। পার্থিব অর্থে প্রেম বা ভালবাসার আসলে কোন স্থির ভিত্তি নেই। এ হল অতিরিক্ত কল্পনা বিলাসীর কল্পনা, সম্রাট শাজাহানের তাজমহলের মত। প্রেমকে জাদুঘরে সংরক্ষিত করার মানসে তিনি তাজমহল তৈরী করেছিলেন। কিন্তু নিজের হৃদয়ভূমিতে সে প্রেমকে তিনি অনড় ভিতের উপর দাঁড় করাতে পারেননি। তাই তিনি বৃদ্ধ বয়সে সামান্য কাঞ্চনবালার মত নর্তকীর প্রেমে পড়েছিলেন। তবুও মানুষের যেমন নকল সাহিত্য আছে, তেমনই নকল স্থাপত্যকলা ও অন্যান্য নিদর্শন আছে। শালি-মার বাগ সেই অর্থে নয়নমুগ্ধকর একটি বাগিচা হলেও চিরন্তনী নয়। এবং যা চিরন্তনী নয়, তার প্রতি বর্তমানে এখন আর আমার যেন আকর্ষণ নেই।

শালিমার বাগ দেখবার পর ফেরার বাসে নাগিন হ্রদের ধারে এসে আবার আমাদের শিকারায় চাপলুম। এবার জিতেন এবং তার নতুন বন্ধুদের মধ্যেই নাসিমবাগ দেখা নিয়ে মতান্তর উপস্থিত হল। এ পর্যন্ত কাশ্মীরের যে কয়টি বাগান তারা দেখেছে, তাতেই এ অঞ্চলের বাগানের নির্মাণকৌশল ও দর্শনযোগ্যতা সম্পর্কে তাদের মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে। নাসিমবাগ দেখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তাদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত তারা এই সুস্থ সিদ্ধান্তে এল যে, নাসিমবাগ দেখার আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তাদেব সিদ্ধান্ত শুনে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। স্থির হল যে, এবার ফিরতি যাত্রা শুরু করতে হবে। সুতরাং শিকারা হজরতবাল মসজিদ লক্ষ্য করে পাড়ি জমাল।

নাগিনে আরো রহস্যময়তা ফুটে উঠেছে ততক্ষণে। শরতের ছোট হয়ে আসা দিনের অপরাহু ম্লান ছায়া ফেলেছে নাগিনের বুকে। বিপুল জলরাশির বুকে আমাদের শিকারা নিঃসঙ্গভাবে ভেসে চলেছে।

হ্রদের সান্ধ্য তরঙ্গ ছলাৎ ছলাৎ ক'রে শিকারার নিচে আঘাত করছে। একা যদি বসে থাকতুম তাহলে এ অবস্থা অবশ্যই আমার মধ্যে ভিন্ন জগতের একটা স্বাদ এনে দিত। কিন্তু তা এল না জিতেন ও তার নতুন বন্ধুদের মুহুর্মুহু সিগারেট সেবনে ও অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপিত আলোচনায়।

ফিরতি পথে প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর আমাদের শিকারা এসে থামল হজরতবাল মসজিদের কাছে। মোগল স্থাপত্যশিল্পের আভিজাত্য ও কুশলতা হজরতবাল মসজিদে খুব সফলভাবে বিরাজমান। এর তুলনা ভারত বা পাকিস্তান আর কোথাও নেই। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে সমরখন্দ ও বুখারার স্থাপত্য-কলার সঙ্গে এখানে ভারতের স্থাপত্য কলার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটছে। মুসলিম স্থাপত্যকলায় বিশেষ ক'রে তার ধর্ম সম্পর্কিত স্থাপত্যকলায় অধ্যাত্মতার এক অপূর্ব ইঙ্গিত আছে। ধর্মজীবনে এরা কতদুর এই অধ্যাত্মতার অনুসরণ করে জানি না, কিন্তু এদের একটানা আল্লাহ্ ধ্বনি Infinite একটা Suggestion দেয়।

কোন ধর্মের প্রতিই আমার বিতৃষ্ণা নেই। তবে আমি যে সত্য সন্ধানে আঁকুপাঁকু করছি তার বিশেষ একটা ধারা আছে। এ সত্য কোন Sectarian outlook দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। এ সত্যের বৃত্তে সমগ্র মানবসমাজ বিধৃত হতে পারে। কিন্তু এ সত্যপথের যথার্থ সন্ধান মানুষ আজ বিস্মৃত হয়েছে। কয়েকজন মানুষই তার ধারা নিজেদের মধ্যে ধরে রেখেছেন। আমি তাঁদেরই খোঁজ করছি। কিন্তু এবারকার অভিযাত্রায় তাঁদের কারোই সন্ধান পেলুম না এটাই আমার বেদনার কারণ। হয়তো কাশ্মীরে আর তাদের সাক্ষাৎ পাওয়াও যাবে না। ক্ষুব্ধ চিত্তে হজরতবাল মসজিদ থেকে সন্ধ্যার ছায়ায় ছায়ায় আবার এসে শিকারায় চাপলুম। এবার আমাদের লক্ষ্য ডাল অতিক্রম ক'রে আবার সেই ঝিলম।

ঝিলমে ফিরে জিতেন তার নতুন বন্ধুদের নিয়ে পরিকল্পনা করে

ফেলল মানসবল, উলার হ্রদ, সোনামার্গ আর ভেরীনাগ দর্শনে বেরুবে। দুদিন তারা এ-সব দেখেই কাটাবে এ-সব দেখতে যথেষ্ট মনোরম। কিন্তু আমার যেন আর এ-সব দেখতে তেমন মন উঠল না। আমি ঠিক করলুম এই 'ফাঁকে' আমি একা একাই গিয়ে শঙ্করাচারিয়া হিলের উপর উঠব। আমার কেন যেন মনে হল ওখানে কিছু মিললে মিলতেও পারে।

পরদিন জিতেন যখন তার নতুন বন্ধুদের নিয়ে পূর্ব কল্পিত পথে বেরিয়ে পড়ল আমি তখন একটি ট্যাক্সি ধরে একাকী বেরিয়ে পড়লুম শঙ্করাচারিয়া হিলের উদ্দেশ্যে। 'শঙ্কর' নাম এবং সেখানে শিবের মন্দিরের অবস্থানই বুঝি আমাকে আকর্ষণ করছিল। আমার কাছে এ হিলের আকর্ষণ যে কারণেই হোক না কেন, অনেকের কাছেই এর আকর্ষণ ভিন্ন কারণে। শঙ্করাচারিয়া হিলের উপর থেকে শ্রীনগর শহরের পূর্ণ দৃশ্য দেখা যায় বলেই অনেক ভ্রমণবিলাসী এ পাহাড়ে বেড়াতে আসেন। তবে পাহাড়টি আপাতদৃষ্টিতে খুব বড় মনে না হলেও সবাই এর খাড়াই বেয়ে উপরে উঠতে ভরসা ও শক্তি পান না বলে এখানে ভিড় একটু কম। এ পাহাড়ের উপর গাড়ি ক'রে ওঠা সম্ভব নয় বলেই ভ্রমণবিলাসীদের তেমন আগ্রহ নেই। আমাদের মত অদম্য কৌতূহল যাঁদের আছে তারাই শুধু এখানে আসেন।

গত দু'দিন আকাশে মেঘের আনাগোনা থাকার জন্য কিছুটা শীত অনুভূত হলেও আজ সে মেঘ সরে গেছে, মাথার উপর সূর্য অফুরন্ত আলো ছড়িয়ে হাসছে। অক্টোবরের মধ্যাহ্নে শ্রীনগরের উপর গ্রীষ্মের সূর্যের মতই এ রোদ ক্লান্তিদায়ক। সেই রোদ মাথায় নিয়েই পাহাড়ে ওঠা শুরু করলাম।

শঙ্করাচারিয়া হিলে অরণ্যের শ্যামল আকর্ষণ বড় একটা নেই। পথের উপর নগ্ন প্রস্তরখণ্ড ছড়িয়ে আছে। অনেক জায়গায় শুধু পাথরের চাঁই ছাড়া আর কিছু নেই। পথ ভয়ানক রকমের খাড়া, কিছুদূর উঠলেই ক্লান্তি অনুভব করা যায়। একমাত্র পর্বতারোহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি বা মনের অসীম ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া

এভাবে এমন খাড়া পাহাড়ে আরোহণ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেককে দেখলাম কিছুদূর অবধি উঠেই বিশ্রাম নিচ্ছেন, আর তাদের উপরে ওঠার ইচ্ছে নেই। ছোটবেলা পাহাড়ের কোলে থেকেছি বলে পাহাড়ে ওঠা অভ্যাস আছে আমার। তাছাড়া শরীরও আমার হাল্কা। আমার এতে খুব একটা অসুবিধা হল না।

পাহাড়ে উঠছি। কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরো পড়ে আছে। তাতে পা পড়লে পা হড়কে নিচে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। পথের বাঁ পাশেই গভীর খাদ। যত উপরে উঠছি নিচে উপত্যকার চিত্র ততই সুন্দর হয়ে ফুটে উঠছে। এই বোধহয় Bird's eye view. পাখিরা বোধহয় এইভাবেই উপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে। শুনেছি সাধক যখন যোগমার্গে উর্ধ্বে ওঠেন তখন তিনি নাকি এমনই ভাবে নিচের পার্থিব জগৎ লক্ষ্য করেন। তবে এ-সব আমার শোনা কথা। বাস্তবে এ ধরনের কোন অভিজ্ঞতাই হয়নি। এ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্যই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

উপরে উঠছি। যতই উপরে উঠছি ততই বাঁ দিকের গভীর খাদ ভয়াবহ হয়ে দেখা দিচ্ছে। সে দিকে তাকালে ভয় করে। সম্ভবতঃ সাধকও এমনি উর্ধ্বদিকে ওঠার পথে একটা ভয় অনুভব করেন। সাধনার প্রথম পর্যায়ে Black hole নামে একটি স্টেজ আছে। বিন্দু ধ্যানের সময় বিন্দুর চতুষ্পার্শ্বে নাকি প্রথম সবুজাভ নীল বর্ণের এক বলয় সৃষ্টি হয়। সেই বলয়ের মাঝখানের অন্ধকার থেকে আবার নীল আলোর বলয় বের হয়ে আসে। একসময় সেই বলয়ের মাঝখান থেকে অন্ধকার এমন প্রবলভাবে সাধককে টানতে আরম্ভ করে যে, সাধক ভয় পেয়ে যান। সেই অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে তিনি সন্ত্রস্ত হন। তবে ভয় কাটিয়ে উঠে যাঁরা এই অন্ধকার গহ্বর পার হতে পারেন তাঁরা অনন্ত এক আকাশের view দেখতে পান। সেই অন্ধকার দেখে যিনি সাধনায় আর অগ্রসর হতে ভয় পান তাঁর আর অধ্যাত্ম সাধনা হয় না। শঙ্করাচারিয়া

পাহাড়ের বাঁ পাশে যে অভিযাত্রী এই খাদ দেখে ভয় পান তিনি আর উপরে উঠতে পারেন না। Black hole বা অন্ধকার গহ্বর দেখে সাধকের ফিরে আসার মতই তার অবস্থা হয়।

বাঁ পাশের খাদ দেখে আমি কোন ভয় পেলুম না। সেই খাদের ভীতিপ্রদর্শন উপেক্ষা করেই উপরে উঠতে লাগলুম। পথ ক্রমশই খাড়া হচ্ছে। কখনও বা ধরে ধরে কখনও বা হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয়। যতই উপরে উঠছি ততই যেন নিচের ডাল লেকটা পাহাড়ের গায়ের কাছে সরে আসছে। যেন অধ্যাত্মতত্ত্বপিপাসু উর্ধ্বযাত্রীর পায়ের কাছে অসার পার্থিব জগৎটা লুটিয়ে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের সেই যে কবিতা আছে, 'যখন ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা, হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে নিচুতে' যেন সেই রকম। তবে আমি তো উপরে উঠছি, তাহলে? একথা মনে হতেই আমার উপরে ওঠা আর রবীন্দ্রনাথের ওপরে ওঠার পার্থক্য বুঝতে পারলাম। পার্থিব সম্পদে যাঁরা উপরে উঠতে চান তাঁরাই আসলে নিচে নামেন। পার্থিব সুখ তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। অর্থাৎ হাজার পেলেও পার্থিব কোন পাওনা তাদের তুষ্টিবিধান করতে পারে না। কিন্তু যখন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা কেউ পরিত্যাগ করেন তখন পার্থিব সুখ সম্পদ অবান্তর প্রতীয়মান হয়, মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এবং যে জিনিসের কোন মূল্য নেই তাই সহজলভ্য। প্রয়োজনীয় জিনিসই মহার্ঘ্য।

আমার উপরে ওঠা একটা বিশেষ সত্যের সন্ধানে, যার পাশে শ্রীনগরের ভোগপিপাসা উদ্রেককারক সৌন্দর্যের কোন মূল্য নেই। সেই জন্য বোধহয় ডাল লেকও গুরুত্বহীন হয়ে পাহাড়ের নিচে এসে জড় হয়েছে মনে হচ্ছে। শঙ্করাচারিয়া হিলের শিব-মন্দির যদি যথার্থই অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্র হয়, তাহলে ডাল-এর পার্থিব সুখ-পিপাসা তার পায়ের কাছে এমন করেই লুটিয়ে পড়ার কথা।

উপর থেকে শ্রীনগরের আশেপাশের শস্যখেত, শূন্যমাঠ, সব

কিছুকে ছবির মত দেখাচ্ছে। সব পাহাড়ের উপর থেকেই সমতল ভূমিকে এমন দেখায়। ঝিলমকে দেখে মনে হচ্ছে, একটা বাচ্চা ছেলে ক্যানভাসের উপর নদীর একটা ছবি এঁকে রেখেছে। শ্রীনগরের পাশ দিয়ে বক্রগতিতে সে বয়ে গেছে। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা : 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।' সম্ভবত শঙ্করাচারিয়া পাহাড়ের উপর থেকেই তিনি ঝিলমের এই আঁকাবাঁকা স্রোত দেখেছিলেন।

শঙ্করাচারিয়া হিলের খাড়াই ভেঙে অনেক দূর ওঠার পর একটু-খানি জায়গায় সমতলভূমির মত আছে। একসময় সেখানে উঠে একটু বিশ্রাম নিলুম। তারপর আরও দুটি খাড়াই পার হলে তবে পথ একটু সহজ বোধ হল। শুনেছি অধ্যাত্ম পিপাসু সাধকের সাধনার পথও প্রথম দিকে এমন খাড়াই অর্থাৎ কঠিন। কিছুদূর অবধি নানা প্রতিবন্ধকতা, তারপর সেই প্রতিবন্ধকতা কেটে গেলে সবই তখন সহজ। সম্ভবতঃ পাহাড়ের ওঠার দুরূহ অংশটুকু পার হয়েছি।

শেষ দুটো খাড়াই পার হবার পর বাঁ পাশের গভীর খাদটাকে তেমন আর দেখা গেল না। বরং দু'একটা গাছগাছালি চোখে পড়ল, যেন আবার আলো দেখতে পেলাম। কাশ্মীরের সর্বত্রই বৃক্ষের প্রাচুর্য, কিন্তু কী আশ্চর্য! শঙ্করাচারিয়া হিলে তেমন গাছগাছালি নেই। তপস্বী যেমন নিরাভরণ অঙ্গে আপন সাধনায় মগ্ন থাকেন, এও যেন তেমনই। যেন শঙ্করাচারিয়া হিল কারো সাধনায় মগ্ন রয়েছে।

এগুতে এগুতে পথিমধ্যে দু'একজন নিম্নগামী হিন্দুস্থানী পর্য-টকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তারা আমাকে হুঁশিয়ার করে বলল, সাবধান বাবুজী, আগারি জুয়াড়ী হ্যায়। উ লোককো সাথ জুয়া মৎ খেলো।

জুয়াড়ী! মন্দিরের পথে জুয়াড়ী! ভাবতে কেমন আশ্চর্য লাগল। আবার তৎক্ষণাৎই মনে হল, এটা স্বাভাবিক। সাধনায় সিদ্ধির পথে সাধককেও নাকি এমন সব প্রলোভনে পড়তে হয়।

সেই প্রলোভন এড়াতে পারলে তিনি এগুতে পারবেন, নয়তে পতন অনিবার্য।

মনে সাহস নিয়ে অগ্রসর হলুম। আমি একা। জুয়াড়ীরা অকস্মাৎ ডাকাতের রূপও তো ধারণ করতে পারে! একটু ইতস্তত করতে যাচ্ছিলুম, আবার মনের মধ্যে সাহস আনলুম, না, কী আছে আমার সঙ্গে? নেবেই বা কি? ভয়ে পিছিয়ে যাব? সুতরাং এগুলাম। দেখলাম সামরিক বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী নামছে। তাদের পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেলুম। কিন্তু জুয়াড়ীর কোন সাক্ষাৎ পেলুম না। সম্ভবতঃ মিলিটারী দেখে তারা গা ঢাকা দিয়েছে। নির্বিঘ্ন পথ পেয়ে বরাবর উপরে গিয়ে উঠলাম।

পাহাড়ের চূড়ায় খানিকটা সমতল অংশ। সেখানে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। পাশে নতুন মন্দির। মন্দিরের পাশে ছোট একটি কুঠুরিতে শঙ্করাচার্যের মূর্তি।

মন্দিরটি শিবের। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দু'একজন সন্ন্যাসী দেখি ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। মন্দিরের চারদিকে উন্মুক্ত বারান্দা। আমি গিয়ে সেই বারান্দায় দাঁড়ালুম। কোন সাধুসন্ত নেই। মন্দিরের একজন পার্থিব পূজারী আনুষ্ঠানিক বিশ্বাস নিয়ে নামেমাত্র পুজো করে যাচ্ছে। তার সেই চেহারা ও মুখাবয়বে পার্থিব কামনা বাসনার ছাপ দেখে আমি রীতিমত মনঃক্ষুণ্ণ হলাম। বুঝতে পারলাম কাশ্মীরে আমার উদ্দেশ্য সফল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। বিষণ্ণ চিত্তে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে লাগলাম।

শিবের এই মন্দির থেকে চতুর্দিকের দৃশ্য অনাবিল স্বচ্ছতায় লক্ষ্য করা যায়। দেখা যাচ্ছে আঁকাবাঁকা ঝিলম এবং তার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পাহালগামাভিমুখী পথটি। নদীর ধারে কাশ্মীরের শস্যক্ষেত্র অনাবৃত পড়ে রয়েছে। ডাল হ্রদ প্রায় তিনদিকে ঘিরে রয়েছে শ্রীনগর শহরকে। ডালের পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম, সর্বত্র গগনচুম্বী পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের জন্যই ডালের সৌন্দর্য আরো খুলেছে। যেন একটা স্বপ্নের দৃশ্য। পার্থিব জিনিসের প্রতি যার

আকর্ষণ নেই, এমন ব্যক্তিরও এ-সব ভাল লাগবে। ডালের হাউস-বোটগুলি যেন চেনার, পাইন, পপলার আর লতাগুল্মের ঝোপঝাড়ের মধ্যে মাথাগুঁজে লুকিয়ে আছে। দূরে পটে আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে হরিপর্বতের মাথার উপরের মোগলাই দুর্গটি। কিন্তু এ স্বপ্নের দৃশ্যে আমার কোন আকর্ষণ নেই। শঙ্করাচারিয়া হিলে উঠে পার্থিব সৌন্দর্য নয় অপার্থিব সৌন্দর্যের ইঙ্গিত পাওয়াই ছিল আমার লক্ষ্য। কিন্তু তার ক্ষীণমাত্র সম্ভাবনাও দেখলুম না। ফলে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে নামতে লাগলুম।

জিতেনদের মনে অপার্থিব কোন বাসনা নেই। এই পৃথিবীর রূপরস গন্ধস্পর্শই তাদের লক্ষ্য। সুতরাং তারা পরদিন বেরিয়ে গেল ভেরীনাগ দেখতে। আমি সেই অবসরে আর একবার চেষ্টা করলুম কিছু পেতে। আমি বেরুলাম কাশ্মীরের অপ্রচলিত তীর্থ শারদা পীঠের দিকে। এই স্থানের আধুনিক নাম শার্দি।

দুর্গম পথ দিয়ে এই শারদা তীর্থে যেতে হয়। সেপোর হয়ে গেলে শ্রীনগর থেকে প্রায় ৯০ মাইল পথ। এখানকার পার্বত্য অঞ্চলে সঙ্কর জাতের মানুষ বাস করে। গণেশগিরি বা গণেশঘাঁটি হল শারদাপীঠের আসল নাম। শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ কাশ্মীরের চিন্তাধারা ও অধ্যাত্মনীতির পরিবর্তন ঘটাতে সর্বপ্রথম এই শারদাতীর্থেই এসেছিলেন। প্রচলিত প্রবাদ, এখানকার শারদা মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে শারদাদেবী তাঁকে বারণ করেছিলেন। কারণ, যৌনজ্ঞান লাভের জন্য, শঙ্করাচার্য কোন এক মৃত রাজার দেহ আশ্রয় ক'রে নারীসঙ্গম করেছিলেন। সুতরাং তাঁকে কলুষ স্পর্শ করেছে, শারদা দর্শনে তাঁর অধিকার নেই। কিন্তু শঙ্করাচার্য তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, যৌনজ্ঞান নিয়েছিলেন তিনি পূর্ণ জ্ঞানের জন্য। কারণ সকল-প্রকার জ্ঞানলাভ না করলে জ্ঞানে পরিপূর্ণতা আসে না। তা ছাড়া আত্মা চিরনির্মল, তাঁকে কলুষ কখনও স্পর্শ করতে পারে না। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্বদাই স্পর্শলেশহীন থাকে।

কাশ্মীরে প্রবেশ করলে বৌদ্ধপণ্ডিতেরা শারদামণ্ডলেই শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তর্কসভার আয়োজন করেন। কিন্তু তাঁরা যুক্তিতর্কে শঙ্করাচার্যকে হারাতে পারেননি। তর্কযুদ্ধে নিজেরাই হার মানেন। ফলে কাশ্মীর বৌদ্ধপ্রভাব মুক্ত হয়।

কাশ্মীরের শারদাবন অঞ্চল একটা দৈবশক্তিতে প্রবল, এরকম একটা ধারণা ছিল প্রাচীন হিন্দুদের মনে। পৌরাণিক নানা গল্পেই এ-সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই শারদাবনে এসে শাণ্ডিল্য মুনি নাকি ত্রিশক্তিরূপে শারদার সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। জনশ্রুতি—শঙ্করাচার্যও শারদাপীঠের গহ্বর থেকে আবির্ভূতা সরস্বতী, শক্তি ও দুর্গার সম্মিলিত রূপ দেখতে পেয়েছিলেন।

কাশ্মীরে যাঁরা বেড়াতে আসেন এখন আর তাঁরা শারদামন্দির পরিদর্শনে আসেন না। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর মত আজ শারদামন্দিরের অবস্থা। সুতরাং এখানে আসার জন্য তেমন বাসের ব্যবস্থা নেই। ব্যক্তিগত একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে আমি এখানে এসেছিলুম। সেই মূল শারদামন্দির এখন নেই। তার জমজমাট ভাবও নেই। তা নেই বলে আমার কাছে স্থানটিকে আরও রহস্যময় মনে হচ্ছে। কোথাও এখানে একটা দৈবসত্তার ক্রিয়া আছে বলে আমার মনে হতে লাগল। হৃদয়ে একটা উদ্বেল ভাব অনুভব করলুম আমি।

মূল শারদামন্দির প্রাকারবেষ্টিত। মন্দিরের পেছনে একটা উঁচু পাহাড় থেকে ঝর্ণা এসে নিচে নেমেছে, নাম অমরকুণ্ড। এই মন্দিরের প্রবেশপথ কোন দিক দিয়ে কেউ জানে না। এর উপর কালের বহু নির্মম আঘাত গেছে। মানুষের অত্যাচারও কম যায়নি। এখন পশ্চিমদিক দিয়ে প্রবেশপথ।

এ মন্দির সম্পর্কে যে শুধুমাত্র কিংবদন্তীতেই গল্প আছে তা নয়। নানা লিখিত কাহিনীতেও আছে। ঐতিহাসিক ও কবি কহ্লন দ্বাদশ শতাব্দীতে শারদামন্দিরের ইতিহাস দিয়েছেন। তাতে অনুমান, এ মন্দিরের বয়স দু'হাজার বছরের কম নয়। এই শারদা থেকেই কাশ্মীরের আর এক নাম শারদাস্থান।

আস্তে আস্তে পরিত্যক্ত মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলুম। মন্দিরের অভ্যন্তর খুবই ছোট, তবে ছায়াচ্ছন্ন। এখানে জাঁকজমক নেই, কিন্তু প্রশান্তি আছে। পরমপুরুষের নিজস্ব পরিধিতে তেমন চাকচিক্য কিছু নেই, প্রশান্তিই বেশি। সেই জন্য আমার বেশ ভালো লাগল। আমি মনে মনে কোন এক দৈব করুণার স্পর্শ কামনা করতে লাগলুম। শুনেছি দৈবশক্তিসম্পন্ন মানুষেরা লোকচক্ষুর অগোচরে থাকতেই ভালবাসেন। কিন্তু এই নিভৃত ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশেও কোন আবির্ভাব আমি লক্ষ্য করলুম না। হয় তো এবার আমার ভাগ্যে কোন মহাপুরুষের করুণা নেই। আমি সে আশা পরিত্যাগ ক'রে মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ দেখতে লাগলুম।

মন্দিরের অভ্যন্তরে কোন বিগ্রহ নেই। একটি চতুষ্কোণ সিঁদুর-চর্চিত শিলা আছে। এমন ক'রেই শাক্তপীঠে সতীমায়ের নানা অঙ্গাংশ শিলিভূত আকারে সংরক্ষিত আছে। সর্বত্রই তা কষ্টিপাথরের আকারে বিদ্যমান। তবে শারদাপীঠের পাথর কষ্টিপাথর নয়, রুক্ষ, কয়েক ইঞ্চি পুরু।

আজ এ শিলাখণ্ডের কোন গুরুত্ব নেই বটে, তবে এই শারদা শিলাখণ্ডকে কেন্দ্র ক'রেই কাশ্মীরের অগণিত যুগের ইতিহাস বা রাজনীতি, সব। আজ যাকে কাশ্মীরবোলি বলা হয় অর্থাৎ কাশ্মীরের নিজস্ব ভাষা, তার মূল নাম হল শার্দিবোলি বা শারদামণ্ডলের ভাষা। তার ভিত্তি, গঠন ও নির্মাণ হল আগাগোড়াই পুরনো ধরনের সংস্কৃত।

শারদাদেবীর মূল একখণ্ড শিলা হলেও একদিন অন্যান্য পীঠ-স্থানের মত এখানেও মূর্তি ছিল। অলবিরুনী তাঁর বিবরণীতে এই মূর্তির কথা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'মহাসিন্ধুনদের পথে বোলর গিরিশ্রেণীর মধ্যে আছে এক দারুমূর্তি, শারদা সরস্বতী।' কাশ্মীরের অন্যতম আর এক কবি কহ্লণ, বিহ্লণের আগেই একাদশ শতাব্দীতে শারদা প্রসঙ্গ বর্ণনা ক'রে গেছেন। তিনি বলেছেন, রাজহংসেশ্বরীর মত সুবিশাল মূর্তির পেছনে আছে, স্বর্ণমণ্ডিত চালচিত্র। মধুমতি

গঙ্গার স্বর্ণরেণুকণায় সেই মূর্তি বিধৌত। তিনি বিশ্বভুবনের দিকে জ্যোতির্ময়তা বিকিরণ করছেন। নিত্য তিনি স্ফটিক স্বচ্ছতায় উজ্জ্বল।'

কিন্তু হিন্দুকাশ্মীরের, বৌদ্ধ কাশ্মীরের মর্ম যেখানে রয়েছে সেখানে এসেও আমি মনে মনে যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিলুম তার কিছুই পেলুম না। সত্যি সত্যি একটা বেদনা বোধ হল নিজের মধ্যে। হঠাৎ মনে হল, সবসময়েই যে মানবদেহে কোন মহাপুরুষ এসে পথ নির্দেশ করবেন, তা তো নয়! অনেক সময় বিশ্বপ্রকৃতিতে লিখিত অনুচ্চারিত ভাষাও তো পথনির্দেশ করতে পারে? শারদামণ্ডলের প্রশান্ত গম্ভীর ছায়ায় হয়তো বা সে ইঙ্গিতই লুকিয়ে আছে। কিন্তু বার বার চতুর্দিকে তাকিয়েও পারিপার্শ্বিকের মৌনভঙ্গ করে সে ইঙ্গিতের অর্থ আমি স্পষ্ট ক'রে নিতে পারলুম না। মহাপুরুষদের মুহূর্তের করুণায় আমার মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মেছে বটে, তবে গুহ্যবিদ্যার স্বরূপ প্রকাশের জন্য যে ক্ষমতা দরকার সে ক্ষমতা আমার ভিতর জেগে ওঠেনি। তার জন্য আরও করুণা দরকার। সেই করুণা পাবার আশাতেই তো আঁকুপাঁকু করছি। কারও সহায়তা না পেলে তা সম্ভব নয়। জানি না কোথায় কি ভাবে সেই করুণা আমি পাব। হয়তো এ যাত্রায় সে ভাগ্য আমার নেই। কাশ্মীরে হয়তো কোন মহাপুরুষ সে করুণা দেবার প্রয়োজনে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে নেই। ফলে অনেকক্ষণ শারদামন্দিরের পারিপার্শ্বিক নানা ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার পর হতাশ চিত্তে ফেরার জন্য তৈরি হলুম।

শারদামন্দির থেকে যখন ঝিলমে আমাদের বোটে ফিরে এলুম তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। ফিরে দেখি জিতেন অনেক আগে এসেই বিশ্রাম নিচ্ছে। আমায় দেখেই বলল, দারুণ মিস করলি কিন্তু। ভেরীনাগের তুলনা নেই। সে আমাকে ভেরীনাগের বর্ণনা শোনাতে লাগল। ভেরীনাগই নাকি ঝিলম নদীর উৎস। ভেরীনাগেরে সামনে আকাশ-ছোঁয়া গিরিশ্রেণী, বাঁ পাশে আপেল বাগান,

চারদিকে পাইন, বার্চ আর আরণ্যক হিমালয়ের অসংখ্য ফুলের মেলা। সে দৃশ্য নাকি অতুলনীয়। কিন্তু এ সুযোগ নষ্ট করার জন্য আমার আর কোন আফসোস দুঃখ নেই। কাশ্মীরের কোন দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য না হলেও আমার আর কোন দুঃখ নেই, কারণ আমি বুঝেছি যে, এখানে কোন স্থানেই আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নেই। একমাত্র অমরনাথেই হয়তো তার সাক্ষাৎ পাওয়া যেত, কিন্তু এযাত্রা সেখানে যাবার আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

জিতেন বলল, আগামী কাল ওরা গুলমার্গ যাবার পরিকল্পনা করেছে, আমি যাব কিনা। এবার আর আমার নিজস্ব কোন অভিরুচি নেই। কোথাও যে আমি যা খুঁজে বেড়াচ্ছি তা পাব না এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ফলে যে-কয়দিন আর শ্রীনগর আছি, জিতেনের সঙ্গছাড়া হতে চাইলুম না। বললুম, যাব। জিতেন বলল, আমাকে না পেয়ে কাল গুলমার্গ যাবার জন্য বাসের টিকিট ওরা বুক করে রেখেছিল। আমার জন্য একটি অতিরিক্ত টিকিটও কেটে রেখেছিল, না গেলে ফেরত দিত। আমি যাব শুনে সে নিশ্চিন্ত হল।

পরদিন খুব ভোরবেলা রওনা হলুম গুলমার্গের পথে। অকারণ আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়কে আর আমি উদ্বেল করলুম না। সহজভাবেই চলতে লাগলুম। গুলমার্গের বাস ধরা হল সেণ্ট্রাল মার্কেটের কাছ থেকে।

গতকাল বিকেল থেকেই আকাশে কিছু কিছু মেঘ দেখা দিয়েছিল। ভোরবেলা দেখলুম বৃষ্টি পড়ছে। সামান্য বৃষ্টিতেই দেখি শ্রীনগরের আবহাওয়া পাল্টে গেছে। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। এত শীত অকস্মাৎ পড়তে পারে আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। আবহাওয়া দেখে বেশ ঘাবড়ে গেলুম। আমার তো কাশ্মীরের কোন স্থানের প্রতি আর তেমন আগ্রহ নেই। বেশ বুঝতে পেরেছি যে, যা খুঁজছি এখানে তা পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া গুলমার্গ কোন তীর্থস্থান নয়। হেন কথা কেউ কখনও শোনেনি যে,

এখানে কখনও কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। জিতেনও দেখলাম কেমন একটু দ্বিধায় পড়েছে। শেষপর্যন্ত গোলাম কজ্জর সাহস দিল : ঘাবড়াইয়ে মাৎ বাবুজী, আচ্ছাই হোগা। গুলমার্গমে জরুর বরফ গিরা।

জিতেন বলল : যাবি ?

বরফ দেখার কেমন একটা যেন গোপন ইচ্ছা মনের মধ্যে ছিল। একটু ভেবে বললুম, চল।

জিতেন বলল, হ্যাঁ। তুষারপাত দেখার জন্যেই তো গুলমার্গ যাওয়া। সুতরাং একটু কষ্ট হলেও যদি তুষারপাত দেখা যায়।

সুতরাং বেরুলাম। শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ যেতে হলে প্রথম যেতে হয় বাসে করে টানমার্গে। টানমার্গ শ্রীনগর থেকে ২৪ মাইল দূরে। সমুদ্রতল থেকে টানমার্গের উচ্চতা ৭০০০ ফুটের চেয়ে কিছু কম। আজ শ্রীনগরের হাওয়া যেন গায়ে বিঁধছে। ভ্রমণবিলাসীদের প্রায় প্রত্যেকেই সাতসকালেই বেরিয়েছে। নানা জায়গায় বেড়াতে যাবে। পার্থিব সৌন্দর্যের মোহ যাদের আছে তাদের উৎসাহের অন্ত নেই। কেউ কেউ মাথায় কাশ্মীরী ফেজ পরেছে। বোধহয় আমিই একমাত্র বাঙালী, নির্ভেজাল বাঙালী। গায়ে গরম কট্‌সউলের পাঞ্জাবি, ভেতরে উলের সোয়েটার। নিচে গেঞ্জি, গলায় সেণ্ট্রাল মার্কেট থেকে কেনা পাঁচ টাকা দামের মাফ্‌লার। সবার উপরে কাশ্মীরী শাল। দেহের ঊর্ধ্ব অঞ্চল আমার সংরক্ষিত। এত কিছু চাদর, পাঞ্জাবি, সোয়েটার জড়াবার পর শীতার্ত বায়ুর সেখানে প্রবেশাধিকার থাকে না। ধুতিরও শীত নিবারণের ক্ষমতা আছে। পাতলা ধুতিতেও দেখছি নিম্নাঙ্গ যথেষ্ট নিরাপদ। কিন্তু পায়ের পাতায় ঠাণ্ডা লাগছে, কারণ পায়ে রয়েছে স্যাণ্ডেল। এর মধ্যেই বিশেষ কৌশলে এক জোড়া সুতির মোজা পরে নিয়েছি। কিন্তু শীতের আক্রমণ তা ঠেকাতে পারছে না। বিষাক্ত বিছের মত দুর্বল স্থান পেয়ে হিমেল হাওয়া সেখানে যেন দংশন করছে। ঐ অবস্থাতেই গাড়িতে চাপলুম।

বাসস্ট্যাণ্ড থেকে গাড়ি ছাড়ল ছটার মধ্যে। এগিয়ে চললুম টানমার্গের দিকে। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। দেখে মনে হয় কুয়াশা পড়ছে। প্রত্যেকটি জানালার মুখে কাঁচের সাটারগুলি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাঁচের ফাঁক দিয়ে দুই পাশের দৃশ্যকে দেখা যাচ্ছে। পথ ততটা আঁকাবাঁকা নয়। সমতলভূমির উপর দিয়ে বরাবর এগিয়ে চলেছি। দুইধারে পাইন, চেনার আব পপলার গাছ। কাশ্মীরের এই বৃক্ষশ্রেণী পথের সৌন্দর্যকে সহস্রগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে ভূ-স্বর্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললুম! উপত্যকার চতুর্দিকই পার্বত্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মাঝখানে ফুলফল শোভিত উপত্যকা। গতির মধ্যে সে দিকে তাকিয়ে বেশ ভালই লাগছে। প্রকৃতির রঙের উপর মনের কল্পনা রঙ ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছে।

শুধু আমাদের বাস নয় প্রাইভেট কার, জীপ, অন্যান্য বাস, সব চলেছে টানমার্গের দিকে। পার্থিব স্থানের জন্য মানুষের ব্যাকুলতা কতদূর এ দেখলেই বোঝা যায়। গুলমার্গের পথে কেউ মোক্ষের সন্ধানে চলেনি, চলেছে নয়নতৃপ্তিকর সৌন্দর্যের সন্ধানে।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বাস এসে থামল টানমার্গে। বাসের ভেতর থেকে তখনও বুঝতে পারিনি বাইরে কি চলেছে। বাইরে ঝির্ঝির্ বৃষ্টি তখনও ঝরে চলেছে। হাওয়া হিমশীতল। শরীর যেন কেটে নিতে চায়। অমনোযোগী ছেলের উপরে নিষ্ঠুর হেডমাস্টারের বেতের মত শীতের হাওয়া যেন আছড়ে পড়ছে। ভাল করে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলুম। মাফলারও কানে জড়ালুম। কিন্তু অসহায় পায়ের পাতাদুটো মার খেতে লাগল।

দেখি সব যাত্রীই শীতে কাঁপছে। এবার আর বাসের মধ্যে কাঁচের সাটার টেনে দিয়ে শীত ঠেকানো যাবে না। এবার প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যেন কোন তুর্কী সুলতানের হারেম হল গুলমার্গ। সহস্র সহস্র তাতার দেহরক্ষিণীর মত শীতার্ত হাওয়া সেই পবিত্র হারেম রক্ষা করছে।

কিন্তু সৌন্দর্যের আকর্ষণ তো রমণী নারীর আকর্ষণের চেয়ে কম নয়। জীবন বিপন্ন ক'রেও যেমন প্রেমিক পুরুষ অভীষ্ট রমণীর উদ্দেশ্যে হারেমে অভিসার করে, সৌন্দর্যবিলাসীরাও তেমনই তাদের কামনার মোক্ষধাম গুলমার্গের দিকে এগিয়ে চলেছে।

গুলমার্গে ওঠার প্রবেশ পথে সারি সারি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। সহিসেরা যাত্রী দেখামাত্র ঘোড়াসমেত যেন তাদের উপর লাফিয়ে পড়ছে। আমার মনে হল, পায়ে জুতো না থাকলে এই শীতে ওপরে ওঠা অসম্ভব। পাশের একটি ঘরে পাহাড়ে ওঠার জন্য বিশেষ এক ধরনের জুতো ভাড়া পাওয়া যায়। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে এক জোড়া জুতো নিলুম। এত ভিড় যে, এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। এই বিশৃঙ্খলাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ঘোড়াওয়ালারা। যে যাকে পারছে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করে দিয়েছে। জুতো নিয়ে ফিরে এসে জিতেন আর তার নতুন বন্ধুদের দেখতে পেলুম না। ইতিমধ্যে পাঁচ সাতজন ঘোড়াওয়ালা আমার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন। একটা ঘোড়া এসে আমার পাশে আমাকে ধাক্কা মেরে দাঁড়াল। কোনরকমে সামলে নিলুম। দেখি আর একজনও অনুরূপ ভাবে এগিয়ে আসছে। জীবিকার জন্য মানুষের কী নির্মম সংগ্রাম। উত্তরোত্তর এ সংগ্রাম যেন বেড়েই চলেছে। বাড়বেই, মানুষ যতদিন পর্যন্ত না মোক্ষের পথ অনুসরণ করবে, এ সংগ্রাম বাড়বেই। মানুষের বাসনা কামনা মানুষকে ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। তার নিরাকর্ষণ চিত্ত তাকে প্রশান্তি দান করে। দুটো পয়সার জন্য সহিসদের মধ্যে এমন বিশৃঙ্খল প্রতিযোগিতা দেখে কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল। বললুম, আমি হেঁটেই উপরে যাব, ঘোড়া লাগবে না। ঘোড়াওয়ালারা থমকে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে আরেক বিড়ম্বনা। ধুতি চাদর পরে ছিলুম বলে স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা হয়েছিল যে, আমি পাহাড়ে উঠতে পারব না। কয়েকজন তাই এসে চেপে ধরল, চলিয়ে বাবুজী হাম গাইড হোগা।

বললুম, গাইড। কিসের গাইড!

—আপকো হেল্প করনে পড়েগা।

—কোন দরকার নেই।

—লাগেগা বাবুজী, আপ সাকেগা নেই।

খুব কঠিনভাবে ওদের প্রতিরোধ করলুম। ঘোড়াওয়ালাদের মত ওরাও থমকে দাঁড়াল। মানুষের বিচারবুদ্ধি যে খুবই সীমিত তাতে সন্দেহ কি? দেহের চেয়ে মনের শক্তি অনেক বড়, অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। মনের চেয়ে আত্মিক শক্তি আরো বড়।

আমাকে উপরে ওঠাতে সাহায্য করার তোড়জোড়ে যখন ভাঁটা পড়েছে এমন সময় দেখি একটি বৃদ্ধ ঘোড়াওয়ালা আমার দিকে এগিয়ে এসেছে। মুখে উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ নেই। বৃদ্ধের গায়ে ছিল মোটা এক পশমী কম্বল। শীতের আক্রমণে আমি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি দেখে সে নিজের কম্বলখানি খুলে দিয়ে আমায় বলল: 'বাবুজী, বহুৎ জাড় লাগতা হ্যায়? তব্ এ লিজিয়ে।' আপাদমস্তক আমার সর্বাঙ্গে সে তার কম্বলটি চাপিয়ে দিল। বেশ আরামদায়ক কম্বল। পাহাড়ী গরীব লোকেদের শীত রুখবার একমাত্র অস্ত্র। সত্যি হিমেল হাওয়ার কামড়ে শরীর যেন কেটে যাচ্ছিল। কম্বলটা গায়ের উপর পড়াতে আরাম বোধ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে পছন্দ হয়ে গেল। বললুম, চল, তোমার ঘোড়ায় যাব।

প্রশান্ত হাসি হেসে ঘোড়াওয়ালা আমাকে তার ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিয়ে চলতে আরম্ভ করে দিল।

শত শত যাত্রী চলেছে গুলমার্গের দিকে। সেখানে তারা কি পাবে কে জানে! সাময়িক তাদের নয়ন তৃপ্ত হবে। আবার তাদের পার্থিব কামনা বাসনার কলকল্লোলে নেমে এসে ক্ষতবিক্ষত হতেই হবে। যে পথ এসকলের উর্ধ্বে প্রশান্তি দান করে সে পথ এটা নয়। তবু চলেছি।

বহু যাত্রী দেখি পায়ে হেঁটেও চলেছে। কিন্তু পায়ে হাঁটা অসম্ভব হয়ে উঠছে। বৃষ্টিতে পাহাড়ী পথ পিচ্ছিল হয়েছে। জুতোর নিচে আঠার মত ডেলা ডেলা মাটি কামড়ে ধরছে। পা ভারী হয়ে উঠছে।

তবুও এরা চলেছে। সংসারের ভারবহন ক'রে নিয়ে মানুষ যেমন চলে, ঠিক তেমনি। এদের মধ্যে সখ ক'রে কেউ পায়ে হাঁটছে, কেউ কৃপণ বলে, কারও বা সঙ্গতি নেই বলে। যে দার্জিলিং বা কাশ্মীর সাধারণ মানুষের কল্পনার বাইরে ছিল, সভ্যতার কল্যাণে আজ তা তাদের নাগালের মধ্যে। কিন্তু খরচ তাদের সংক্ষিপ্ত ক'রে চলতেই হয়।

যতই উপরে উঠছি, হাওয়ার কামড় যেন ততই বাড়ছে। তুষারের গুহা ভেঙে যেন উন্মাদ হাওয়া এই অক্টোবরেই বেরিয়ে পড়েছে। গরম জামা-কাপড় পরেও সবাই কাঁপছে। কম্বলের ফাঁক দিয়ে হাওয়া ঢুকে পা দুটোকে আমার যেন অবশ ক'রে দিতে চাইছে। রক্ত জমাট বাঁধবার উপক্রম। এত শীত জীবনে কখনও অনুভব করিনি। দার্জি-লিং-এ বহুবার গিয়েছি, অবশ্য গ্রীষ্মে। সেখানে সাধারণত অক্টো-বরের কাশ্মীরের চাইতে বেশী শীত। তবে বৃষ্টি নামলেও সেই শীত এমন পাগলামো শুরু করে না। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের শীতও এর কাছে কিছু নয়। শীতের প্রচণ্ডতার কথা এযাবৎকাল শুধু বইয়েই পড়েছি, এবার অনুভব করতে পারছি। গুলমার্গে কি পাব জানি না, তবুও এগিয়ে চলেছি।

টানমার্গ থেকে গুলমার্গের দূরত্ব চার মাইল। পথ বেশ প্রশস্ত। কিন্তু বড় চড়াই। অনেক জায়গায় প্রায় খাড়াখাড়ি উঠতে হয়। এ জন্যে ঘোড়ায় চড়তে অনভ্যস্ত অনেক যাত্রীই ভয়ে আঁতকে ওঠে। তবে মনের জোর থাকলে ভিন্ন কথা। মনের জোরে সবই সম্ভব।

যতই উপরে উঠছি পাহাড়ের সৌন্দর্য ততই খুলছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির কুয়াশায় শ্যামল অরণ্যকে কৃষ্ণবর্ণ দেখাচ্ছে। তাতে আমার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অনুরণন বোধ করছি। মানুষের গভীর অভ্যন্তর তারই কাছে অজ্ঞাত। কিসের অনুরণন আমি যেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

দূরে বার্চ গাছ দেখা যাচ্ছে। পথের দুধারে পাইন আর পপ্‌লার। লতাপাতা ও নাম-না-জানা বৃক্ষের শেষ নেই। মাঝে মাঝেই চড়াই পড়ছে। অনেকেই সেই চড়াই ভাঙতে ভয় পাচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে

ব্যালান্স রাখতে পারছে না বলে আর্তভাবে চিৎকার করে উঠছে। এদের মধ্যে অনেকে হয়তো গৃহের দ্বিতল পর্যন্ত ওঠেনি।

আমার সহিস জিজ্ঞাসা করল, তক্‌লিফ হোতা হ্যায় বাবুজী? বললুম, না। তবে পায় বড় কামড়াচ্ছে।

শুধু যে পা, তাতো নয়। হাতের যে অংশ অনাবৃত সেখানেও হিমশীতল হাওয়ার তাড়নায় অবশ বোধ করছি। বুঝতে পারলুম হাতে গ্লাভ্‌স পরে আসা উচিত ছিল। অনেকেরই হাতে দেখলুম গ্লাভ্‌স।

চলতে চলতে মনে হল—সহিসগুলো যাত্রী ধরার জন্য যতই অসভ্যতা করুক না কেন, আসলে এই দরিদ্র পাহাড়াগুলো বড় ভাল। মানুষ মূলত এখনও ভালই আছে। শিল্পসভ্যতা জীবিকার এমন এক বাধ্যতামূলক পরিবেশ তৈরি করেছে যে, মানুষের যথার্থ পবিত্র সত্তা তাতে চাপা পড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির নিজস্ব জগতে প্রবেশ করে পাহাড়া সহিসের মধ্যে যেন নিজস্ব নির্ভেজাল সত্তা ফুটে উঠেছে। আমার কথা শুনে বৃদ্ধ সহিস ঘোড়া থামিয়ে—কম্বল দিয়ে আমার পায়ের পাতা দুটো ঢেকে দিল। কিন্তু এ অবস্থাতে জীনের রেকাবাতে পা দিয়ে চলা সম্ভব নয়। বারে বারেই পায়ের উপর থেকে কম্বলটা পড়ে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল মৃত্যুর হাত যেন পা-দুটো ছুঁয়ে যাচ্ছে। তুষার-মৃত্যু কী যে ভয়ঙ্কর বুঝলুম।

পীরপঞ্জালের মহিমা ক্রমশই বাড়ছে। উত্তুঙ্গ হিমেল হাওয়া ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছে। কখনও কখনও দু'একটি পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে জমানো বরফ দেখা যাচ্ছে। যাত্রীদের অনভ্যস্ত চোখের উপর বরফ আশ্চর্য সৌন্দর্য নিয়ে নামছে যেন। এই সুনির্মল শুভ্রতার মধ্যে কী একটা যেন আছে যা আমার অতীন্দ্রিয়ের প্রতি আকর্ষণের সঙ্গে অনেকটা খাপ খায়। কেন যে এরকম হয় কে জানে। ঐ শুভ্র তুষার-স্বচ্ছতাই আমাকে টানতে লাগল।

শেষপর্যন্ত হিমেল হাওয়ার মধ্য দিয়ে গুলমার্গ এসে পৌঁছুলাম।

পাইন ও পপলার বেষ্টিত সবুজ এক ময়দান গুলমার্গ। মেঘের ছায়ার নিচে সবুজের বন্যা যেন গাঢ় হয়ে উঠেছে। তাতে একটি রহস্যময়তা ফুটে উঠেছে। আসলে মেঘের ছায়ার নিচে সব সময়ই কেমন যেন একটা রহস্যময়তা আছে। বোধহয় মেঘের ছায়ায় একটা বিরহের সুর ফুটে ওঠে। এই জন্যই বুঝি কালিদাস এই বর্ষার প্রারম্ভেই মেঘদূতের যক্ষের বিরহ-বেদনার চিত্র আঁকতে চেয়েছিলেন। আসলে এ বিরহ যে নরনারীর বিরহ, তা নয়, চিরন্তন এক বিরহের সুর রয়েছে এখানে। এই বিরহই পূর্ণতার অভাবের বিরহ।

কিন্তু এত সব চিন্তার অবসর যেন গুলমার্গে নেই। এত হিমশীতল তীব্র হাওয়া দিয়েছে যে, শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসছে। দাঁতে দাঁত চেপে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছি। কোন কিন্তু চিন্তা করার অবসর নেই। দেখছি সবাই ছুটছে পাশের একটি রেস্টুরেণ্টে। গরম চা দরকার এক্ষুনি। নইলে হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। ফলে আমিও ছুটে গেলুম সেই দিকে। কোট প্যাণ্টের আভিজাত্য, ধুতি চাদরের দারিদ্র্য কিছুই মানছে না শীত। সকলকেই পাগলা কুকুরের মত কামড়ে ধরেছে। প্রায় দৌড়ে রেস্টুরেণ্টে ঢুকে গেলুম।

ভেতরে অগ্নি-চুল্লি জ্বলছে। শীতের দিনে কাশ্মীরের ঘরে ঘরে এই অগ্নি-চুল্লি জ্বলে। টানমার্গে ঘোড়ওয়ালাদের মধ্যে যাত্রী ধরার জন্য যেমন বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল, অগ্নি-চুল্লির ধারে আসার জন্যও যাত্রীদের মধ্যে দেখি তেমনি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। উপায় নেই, সেই ভিড় ঠেলে শেষ পর্যন্ত আমিও গিয়ে অগ্নি-চুল্লির ধারে দাঁড়ালুম। দেখলুম, প্রায় আগুনের মধ্যে হাত ঠেলে দিয়ে জিতেন কাঁপছে। দাঁতে দাঁত লেগে ঠক্‌ঠক্‌ করছে তার। আমাকে দেখে কাঁপতে কাঁপতে বলল, কোথায় ছিলি? কোন জবাব না দিয়ে আগুনের মধ্যে আগে হাত ঢুকিয়ে দিলুম। শরীর তখন আমারো কাঁপছে। আমি বিশেষ করে বার বার আমার পা, দুটি সেঁকে নিলুম। আশ্চর্য, তবুও যেন রক্তের মধ্যে কিছুতেই উত্তাপ জাগছে না। মুঠি মুঠি ক'রে দুই হাতে আগুন ধরতে পারলে যেন ভাল হত।

কিন্তু দীর্ঘ সময় ভরে নিরুপদ্রবে অগ্নিচুল্লির ধারে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ ইতিমধ্যে অগ্নির স্পর্শ পাবার জন্য অন্যান্য যাত্রীর মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে, ফলে কিছুকাল পরেই জায়গা ছেড়ে দিতে হল। পাশের এক টেবিলে গিয়ে বসলাম। জিতেনও উঠে এল, বলল: উঃ! এত শীত ভাবতে পারিনি!

বললুম, গরম কিছু খা।

এমন সময় বয় এসে সামনে দাঁড়াল: চা অউর কফি?

বললুম, কফি।

বসে থাকা যাচ্ছে না, হাত পা কাঁপছে। প্রত্যেকেরই অবস্থা সার্কাসের সঙের মত। কাউকে দেখে যে কেউ হাসবে সে উপায় নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বয় কফি নিয়ে এল। তাড়াতাড়ি ট্রের দিকে হাত বাড়ালুম। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, কাপে কফি ঢেলে মুখে যে ওঠাব এমন হিম্মত থাকল না। হাত কাঁপছে, মুখে ওঠাতে ওঠাতেই কফির কাপ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আরো, আরো বেশী গরম কফি দরকার। ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে কফি খেতে লাগলুম।

জিতেনকে বললুম, কি করবি এবার?

সে বলল, কি আর করব, এখন ফিরতে পারলে বাঁচি।

—বাইরে ঘুরে কিছু দেখবি নে?

—মাথা খারাপ!

—'তবে বোস, আমি আসছি।' মনের মধ্যে অসীম শক্তি সংগ্রহ ক'রে আমি এসে বাইরে দাঁড়ালুম! কিছু যদি নাই দেখব তাহলে এলুম কেন। তাছাড়া এই ভয়ঙ্করের মধ্যে সৌন্দর্যের একটা ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যেতে পারে, যে স্বাদ পার্থিব চিরাচরিত বাসনা কামনাপিষ্ট স্বাদের চাইতে ভিন্ন। সুতরাং বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখি চাদর গায়ে জড়িয়ে মাঝবয়সী একজন মাড়োয়ারী ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছেন। তাঁর কণ্ঠে শুধু এক শব্দ: আরে বাপ্‌ মর গিয়া। আমায় দেখে তিনি বললেন:

ইয়ে কোন দেখনেকো চিজ হ্যায় ?' আরে বাপ্ মর গিয়া, মর গিয়া হুম।'

পৃথিবীতে দেখবার যে কি আছে কে জানে ? একজনের কাছে যা দর্শনীয়, আর একজনের কাছে তা আকর্ষণের বিষয় নাও হতে পারে। আসলে দর্শনীয় বিষয় একটিই আছে যা আমরা দর্শন করতে চাইনে। প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য পার্থিব বিষয়ই বার বার দেখলে দর্শনীয়তা হারিয়ে ফেলে, শুধু শুনেছি একটিই তার অনন্ত আকর্ষণ হারায় না, সে হল সত্য, যার মধ্যে সত্য শিব ও সুন্দর একত্রে রয়েছেন, অধ্যাত্ম সত্য-সন্ধানীরা যাঁকে ধরার জন্য সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে সংসার বিরাগী হয়েছেন। আমি তো তাই চেয়েছিলুম, তার অসামান্য ইঙ্গিত পাবার জন্যই তো ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু এবার আমার ভাগ্য বিরূপ।

ছায়াচ্ছন্ন গুলমার্গে আজ যেন কিছু দর্শনীয় নেই। সবুজ ময়দান তার শুধু একারই নেই, বাইসরণেরও আছে। গুলমার্গ মানে পুষ্পোদ্যান, অথচ এখানে ফুলও নেই এখন। শীতের দিনে গুলমার্গের বিশেষ আকর্ষণ বরফ। অথচ বরফও পড়েনি। আসতে আসতে পথে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দূর গিরিশৃঙ্গে মাঝে মাঝেই বরফ দেখছিলাম। অদ্ভুত তার আকর্ষণ। গুলমার্গে কাছ থেকে সেই বরফ দেখব আশা করেছিলুম। না দেখে মর্মাহত হলুম। হঠাৎ পাশে কয়েকজনকে বলতে শুনলুম, খিলেনমার্গে নাকি বরফ পড়েছে। অদ্ভুত একটা কৌতুহল ভেতরে যেন লাফিয়ে উঠল আমার। ঘোড়াওয়ালা আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললুম, চল খিলেনমার্গ যাব।

ঘোড়াওয়ালা বলল, খিলেন মার্গ বহুৎ দূর হ্যায় বাবুজী।

—কেত্না দূর ?

—কম সে কম দু'হাজার ফুট খাড়াই তো হোগা।

—কত সময় লাগবে ?

—ঘণ্টাভর তো জরুর।

বললুম, তবে কোন চিন্তা নেই, চল।

জিতেন ইতিমধ্যে বাইরে এসেছিল। তাকে আমার পরিকল্পনার কথা বলতেই সে যেন আঁৎকে উঠল। আমার দিকে একবার শঙ্কিত দৃষ্টি ফেলে সে তৎক্ষণাৎ রেস্টুরেন্টের মধ্যে ঢুকে গেল।

আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলুম। আবার যাত্রা শুরু হল। এবার সঙ্গী খুব কম। তুষারপাত দেখার নেশায় বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম দেখা গেল। তিনটি তরুণকে দেখলুম খিলেনমার্গে বরফ দেখতে এগিয়ে চলেছে।

পাইন অরণ্যের পাশ দিয়ে খিলেনমার্গের দিকে রাস্তা গেছে। এ রাস্তা তত ভাল নয়, ভাঙাচোরা। কিন্তু অনিবার্য আকর্ষণ যেন সামনে টানছে। সুতরাং এগুতে থাকলুম। এ ধরনের পাহাড়ী রাস্তায় ঘোড়ার পিঠে চড়া অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে যেটা অস্বস্তির কারণ সেটা হল পড়ে যাওয়ার ভয়। কিন্তু আমার লঘু দেহে ভারসাম্য রাখতে তত অসুবিধা হচ্ছিল না বলে সে অস্বস্তি ততটা আমায় কাবু করতে পারেনি। তবে পায়ে শীতের কামড় ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক মনে হচ্ছিল।

অরণ্যপথে আমরা দু হাজার ফুট উঁচুতে চলেছি। রক্ষা শুধু এই টুকুতে যে, এপথ উন্মুক্ত নয়। ঘন অরণ্যে আবৃত। সুতরাং শীতার্ত হাওয়া অরণ্যের গায়ে বাধা পাচ্ছিল বলে শীত একটু কম ঠেকছিল। যাত্রী কম থাকার জন্য পথটাকে অত্যন্ত নির্জন মনে হচ্ছিল। মেঘের ছায়া আর অরণ্যের ছায়া কেমন একটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। সেই অন্ধকারের রহস্যময়তার মধ্যে কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ আছে। সবাই মুখ বুজে চলেছে। একটু শব্দও নেই। সামনেই বরফের এক অদ্ভুত রাজ্য দেখতে পাবার নেশা রয়েছে সবার মধ্যেই।

অবশেষে চলতে চলতে এক সময় খিলেনমার্গ এসে পৌছুলুম। বরফ কোথায়? বরফ নেই। নিঃসঙ্গ একটা পাঞ্জাবী চায়ের দোকান দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকল আইয়ে বাবুজী, চা পিও। ক্লান্তি আর হতাশা ছুটোই তখন আমাদের চোখে মুখে। সুতরাং নেমে একটু চা

খেয়ে নিলুম। তারপর আবার ঘোড়ার পিঠে চাপলুম। ছায়া ছায়া ভাব কাটেনি। দু-একজন যাত্রী নিঃশব্দে উপর থেকে নিচে নেমে আসছিল। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলুম যে, কিছুদূরে সামনেই তুষারপাত হচ্ছে। আকাশে সূর্য আর দেখা যাচ্ছে না। দিন আছে কি নেই, সেটাই অনুমান করতে পারছি না। কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগল।

সামনেই বরফ পড়ছে শুনে আশায় বুক বেঁধে এগোচ্ছিলুম। দশ পনের মিনিট চলার পরও বরফের কোন লক্ষণ দেখতে পেলুম না। কুয়াশা যেন আরও জমাট বেঁধে উঠছে। বেশ অন্ধকার তখন। নিজেকেই যেন ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। শুধু অনুমান করা যাচ্ছে যে, পায়ের তলায় ভূমি অনেক সমতল। আশেপাশে আর কোন খাদ নেই। বোঝা যায় যে, আর একটি অধিত্যকায় এসে পৌছেছি। কিন্তু বরফ কই ? মনে হতে লাগল যে, বরফ কোথাও নেই। অন্ধকার আরো জমাট বেঁধে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন চির এক নিশীথ রাত্রির জগতে এগিয়ে চলেছি। অন্তবিহীন এ কুয়াশা আর শেষ হবে না। গভীর একটা হতাশা যেন জড়িয়ে ধরল। মনে হল, কোন আশাই নেই। এমন সময় হঠাৎ একটি আলোর ঝলমলানি চোখের উপর এসে পড়ল। দেখলুম, বরফ, আমাদের সামনে বরফ।

আর একটা উপত্যকায়—পাহাড়ের তুঙ্গদেশ থেকে আরম্ভ করে নিচে পর্যন্ত চাদর বিছিয়ে বরফ পড়েছে যেন। জায়গাটার নাম এলা-পাথর। খিলেনমার্গ থেকে আরো হাজার খানিক ফিট উঁচুতে।

পায়ের তলায় তুলোর আঁশের মত বরফ পড়ছে। থোকা থোকা বরফ। ঘোড়ার পায়ের নিচে চপ্‌চপ্‌ করছে সেই বরফ। ঘোড়া-ওয়ালা তার ঘোড়া থামালো। ঘোড়া আর এগুবে না। কারণ পা হড়কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। সেখানে তিনচারশ গজ দূরে ঘাসের উপর মোলায়েম বরফ পড়েছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সেই দিকে এগিয়ে চললুম।

আশ্চর্য ! সূর্য না থাকলেও বরফের প্রান্তরটা যেন আলোকিত

হয়ে আছে। বরফ লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলুম। বোধহয় অনেকটা উঁচুতে এসে পড়েছি। শরীর হালকা বোধ হচ্ছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে, কারণ হাওয়া বেশ পাতলা এখানে। এজন্য আমার সঙ্গে যে দু'একজন যাত্রী ছিল তারা আর এগুলো না। সেখানে দাঁড়িয়েই তুষারপাত দেখতে লাগল। কিন্তু ঐ উজ্জ্বল শ্বেতশুভ্র আলোর অদ্ভুত এক আকর্ষণ যেন। আমি মুগ্ধ বোধ করলুম। দুনিবার এক হাতছানি আমাকে ঐ আলোর মধ্যে টানতে লাগল। ঐ নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতার রাজত্বের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে আমার যেন শান্তি নেই। আমি এগিয়ে চললুম। এগিয়ে চললুম বটে, শরীরে যেন শক্তি নেই। কী একটা অদ্ভুত আকর্ষণ যেন শরীরের শক্তি শুষে নিয়েছে। ইচ্ছে মত পা ফেলা যাচ্ছে না। যেন একটা জলের চাপ দেহের ভারকে হালকা ক'রে দিয়েছে। সামনে ঢালু পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি গাছ দাঁড়িয়ে। গাছের পাতায় পাতায় বরফ পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন থোকায় থোকায় জুঁই ফুল ফুটে আছে। অবশেষে ভারহীন দেহ নিয়ে সেই শ্বেতশুভ্র বরফের রাজ্যে গিয়ে পা রাখলুম। থোকায় থোকায় হালকা বরফের আঁশ পড়ছে, যেন রহস্যময় কোন স্বর্গের হাসি ঝরে পড়ছে পৃথিবীর বুকে। মনে হল, পার্থিব কামনা বাসনার ভাব এ দেহের মধ্যে আর নেই। এক হালকা আনন্দের শিহরণে দেহ যেন আমার ভাসছে। আশে পাশে আমার কেউ নেই। তবু যেন নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছে না। যেন অকারণ এক আনন্দের প্রবাহ এখানে, পূর্ণ আনন্দের প্রবাহ। যেন শ্বেতশুভ্র নির্মল চৈতন্যের জগৎ এই তুষারের দেশ। কিন্তু অকস্মাৎ এরই মধ্যে কি একটা নড়ে উঠতে দেখে আমি যেন চমকে গেলুম। শুভ্রতার রাজ্যে শ্বেতশুভ্র আর একটি জিনিস যেন নড়ছে। কি ওটা? ভাববার আগেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। একটি লোক। বোধহয় আমার দিকে পেছন ফিরে তুষারপাতের খেলা দেখছিল। ফিরে তাকাতেই বুঝতে পারলুম। কিন্তু কি আশ্চর্য। কী অসম্ভব লোক! যে শীতে কাঁপতে কাঁপতে সবাই প্রায় দেহদুর্গ রক্ষার জন্য সমস্ত রকম সম্ভাব্য পশমী বস্ত্র

জড়িয়ে নিয়েছে, সেই শীতেও শুধু মাত্র সুতীর সাদা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে লোকটি নির্বিকার। ঐ তীব্র শীতেও যেন এতটুকু প্রতিক্রিয়া নেই লোকটির। মুখে এতটুকু যন্ত্রণার লক্ষণ নেই। কে এই লোকটি? মুখ যেন চেনা চেনা লাগছে! কোথায়, কোথায় দেখেছি এঁকে! হঠাৎ মনে পড়ে গেল। পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর যাত্রা করার সময় বাসে এঁকেই দেখছিলুম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। এখনও মুখে সেই তেমনি হাসি লেগে। আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছেন, যেন কত কালের চেনা। আমি অবাক হলুম। ভদ্রলোকটি কে? তিনি কিন্তু হাসতে হাসতে এবার নামতে লাগলেন। নামতে নামতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। অদ্ভুত, ভদ্রলোকটির দেহের মধ্যে যেন একটা উত্তাপ আছে। আমি সেই উত্তাপ অনুভব করতে লাগলুম, যেন তার নিজেরই ব্যক্তিত্বের উত্তাপ। আশ্চর্য! ভদ্রলোক স্পষ্ট আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, কেমন লাগছে? কি বলতে চেয়েছিলুম জানি না। আমার মুখ দিয়ে অকস্মাৎ কেন যেন বেরিয়ে এল: হাল্কা।

ভদ্রলোক বললেন: উপরে উঠলে এমনি হাল্কা মনে হয়। আপনি তো অনেক উপরে উঠবেন।

কথাটার সঠিক অর্থ তখনও ধরতে পারিনি, তাই বললুম, না তো।

ভদ্রলোক যেন নিবিড় বিশ্বাসে বললেন, উঠবেন।

বললুম, আর ওঠবার সময় কই?

তিনি বললেন, সময় নিশ্চয়ই তৈরি ক'রে নেবেন।

তাঁর এ হেঁয়ালীর অর্থ না বুঝতে পেরে চুপ ক'রে গেলুম। ভদ্রলোক বললেন, আপনি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছেন না?

বললুম, অনেকটা তাই।

ভদ্রলোক গভীর চোখে আমার উপর দৃষ্টি ফেলে কি দেখলেন, তারপর বললেন, যা খুঁজছেন, তাতো ভেতরেই রয়েছে, বাইরে ছোটাছুটি করছেন কেন?

যেন চমকে উঠলুম আমি, কি বলতে চান উনি!

আবার হাসলেন ভদ্রলোক : কি বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ?

—আমি ঠিক···

—কেন, আপনি তো সাপ খুঁজছেন।

আমার মুখে কোন কথা থাকল না। সারা শরীর যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল। কি বলব ভাবতে না পেরে নির্বাক হয়ে গেলুম।

ভদ্রলোকটি বললেন, যা সহজ, তাকে এত জটীল ক'রে দেখছেন কেন ?

ভদ্রলোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

তিনি বললেন, আসন প্রাণায়াম নাক টেপাটিপি, কিছুই করতে হয় না সে সাপকে দেখতে হলে। সে কুণ্ডলিনীরূপে রহস্যময়ী বটে, তবে একটু জাগাতে পারলেই সহজ গতি। সহজভাবে তাঁকে দেখবার চেষ্টা করুন।

আমার মুখে সত্যই কোন কথা নেই। বিস্ময়ে যেন অভিভূত হয়ে গেছি।

তিনি বললেন, আপনার ভেতরে অনেক জিনিস আছে, এবার জানবার চেষ্টা করুন।

এই প্রথম প্রত্যুত্তরে আমার কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরল : কি ক'রে জানব ?

–চোখ বুজে দুই ভুরুর মাঝখানে তাকান।

—তাহলে ?

—দেখবেন সেখানে ছোট একটি স্ফুলিঙ্গের মত বিন্দু।

চুপ ক'রে থাকলুম।

ভদ্রলোকটি বললেন, সেই বিন্দুই হল সব। ধরা ছোঁয়ার অতীত, কিন্তু অস্তিত্ব। এই বিন্দুই হল সব কিছুর উৎস। বজ্রযানী বৌদ্ধদের বজ্র। আপনি চোখ বুজে ভ্রূমধ্যে তাকালেই বিন্দু দেখবেন। তারপর বিন্দুর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার চেষ্টা করলেই

দেখতে পাবেন—এত ক্ষুদ্র বিন্দু কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কত বিশাল। প্রকৃত-পক্ষে অন্তহীন অনন্ত। এই বিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকলেই সাপ এসে আপনিই ধরা দেবে। দেশ বিদেশে ঘোরার আর দরকার কি? ভেতরেই যখন সব রয়েছে, তখন এই কষ্টের প্রয়োজন কি? এ সাপকে বাইরে খুঁজলে পাওয়া যায় না! নিজের ভেতরেই গুটি সুটি মেরে লুকিয়ে থাকে।

বার বার ভেতর থেকে আমার একটি শব্দই যেন ধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল ধন্য, ধন্য। এ জন্যই বুঝি আমার কাশ্মীর আসা। সমস্ত শ্রমকে সার্থক মনে হল। বুঝলুম, তুষারের তুর্নিবার আকর্ষণ আমাকে বার বার ডাকছিল কোন! কি একটা যেন বলতে গেলুম ভদ্রলোককে, অকস্মাৎ দেখি তর্‌তর্‌ করে অনেকটা এগিয়ে গেছেন তিনি। খুব দ্রুত পেছনে ছুটবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু হাল্কা দেহটা যেন আমার দৈনন্দিন পার্থিব নিয়মকানুনের বাইরে চলে গেছে। ফলে যত তাড়াতাড়ি পা ফেলা সম্ভব, ততটা পারলুম না। ভদ্রলোকটি যেন দেখতে দেখতে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। এলাপাথরের কুয়াশার ঘন আবরণের মধ্যে তাঁর আর কোন হদিস পাওয়া গেল না। বুঝতে পারলুম—মহাপুরুষ ব্যক্তিদের মধ্যে উনিও একজন। অন্য তিনজন মহাপুরুষকে যে-ভাবে পেয়ে হারিয়েছিলুম, এঁকেও তেমনি ভাবে হারালুম। আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ ও ধিক্কার দুইই জানালুম।

তুষারশুভ্র বরফ চারপাশে ঝক্‌ঝক্‌ করছে। দেখলে অনন্তকাল তাকিয়ে দেখা যায়। কিন্তু দেখার আর কোন আগ্রহ নেই তখন আমার। যা দেখতে বেরিয়েছিলুম এ যাত্রায় তা পেয়ে গেছি। ফলে আর তুষারপাত দেখার জন্য দাঁড়ালুম না। যা দেখলুম তাই স্মৃতির মণিকোঠায় চিরকাল সঞ্চিত থাকবে। ফলে এলাপাথরে আর না দাঁড়িয়ে নিচের দিকে নামতে লাগলুম।

আবার সেই পথ। আবার সেই কুয়াশা। আবার সেই শীত, খিলেনমার্গ—অবশেষে টানমার্গ। শ্রীনগরে যখন ফিরে এলুম তখন

গাঢ় সন্ধ্যা। বৃষ্টি নেই, কিন্তু শীত আছে। বেরিয়েছিলুম বৃষ্টির কুয়াশাঢাকা পথে। শ্রীনগরে ফেরার পথে ফিরলুম আলো ঝলমলে রাস্তা দিয়ে। যেন আমার মনের আশাআকাঙ্ক্ষার আলোতেই শ্রীনগর জ্বলজ্বল করছে, আমার প্রাপ্তির আনন্দে তার বিষাদ যোগ কাটিয়ে উঠেছে।

পাঁচ

জীবনে কখনও কখনও এমন মুহূর্ত আসে যা জীবনকে ঘুরিয়ে দেয় বা নিয়ন্ত্রিত করে। এলাপাথরের ঘটনাও যেন আমার জীবনে সেইভাবে কাজ করল। ভাগ্য বোধহয় এ জন্যেই আমাকে ঠেলেঠুলে কাশ্মীর নিয়ে এসে'ছিল, নইলে আমি যা খুঁজে মরছি, কাশ্মীরে তো তা পাবার কোনরকম সম্ভাবনাই ছিল না। তবু কিছু একটা পেলাম। কে এই ভদ্রলোক জানি না। সন্দেহ নেই তিনি যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। নইলে যে শীতে মানুষ মরে যাচ্ছে সেই শীতে শুধুমাত্র পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে কেউ বরফ দেখতে যায়!

ভদ্রলোকের মধ্যে যে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে সন্দেহ নেই। অনেক লোক আছেন শুধুমাত্র পণ্ডিত, ভারতীয় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ, তাঁরা উপদেশ দিলে ভাল লাগে না। কিন্তু অনেকের কথা ভাল লাগে। এ ভাল লাগার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। আমি একজন তরুণ যোগসাধকের কাছ থেকে অদ্ভুত এক গল্প শুনেছিলুম। শ্যামাচরণ লাহিড়ীর কোন শিষ্যের কাছ থেকে তিনি যোগ সাধনা রপ্ত করেছেন। অধ্যাত্ম বিষয়ে তাঁর গুরু একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত এক পণ্ডিত ব্যক্তি এ নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক করতে আসেন। পণ্ডিত ব্যক্তিটি আধঘণ্টা একটানা লেকচার দিয়ে যান। কিন্তু গ্রন্থ রচয়িতা নীরব থাকেন। তাঁর এই নীরবতা পণ্ডিত ব্যক্তিটি লক্ষ্য করেন। বলেন, আমি এতক্ষণ অনেক বললুম, আপনি তো চুপ ক'রে আছেন। একটি কথাও বলছেন না?

গুরু বললেন, শুনছি।

—এবার আপনি বলুন।

গুরু হেসে বললেন, এতক্ষণ তো ধার করা রেকর্ড বাজালেন, এবার নিজের রেকর্ড একটু বাজান, শুনি। তারপর আমার কথা বলব। পণ্ডিতের মুখে আর কোন কথা থাকল না। আসলে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাত্ম সাধনা তো তিনি করেন নি।

আসলে যে কোন ব্যাপারেই বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে কেউ authority বলে গণ্য হন না। অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা মানুষের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। কথামৃতের কথা যথার্থই অমৃতহ্রদস্নাত। আমার মনে হল এই ভদ্রলোক নিজের রেকর্ড তৈরি করতে পেরেছেন। অমৃত হ্রদে তিনিও স্নান ক'রে উঠেছেন। সেই জন্যই তাঁর সামান্য একটি কথা আমার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে।

এরপর কাশ্মীরে আমার যে ক্লান্তি ছিল তা যেন মুহূর্তের মধ্যে উবে গেছে। বিমর্ষতা কাটিয়ে জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত হতে পেরেছি আমি। কাশ্মীরের কাছে নতুন কিছু প্রার্থনা ছিল না আমার। যা খুঁজতে বেরিয়েছিলুম কেন যেন মনে হতে লাগল, তা পেয়ে গেছি। শুধুমাত্র সাধুসন্ত দর্শন করলেই হবে না, নিজে সাধনা করতে হবে। যেন সেই সাধনার চাবিকাঠি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন ভদ্রলোক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল এ চাবি দিয়ে ঘরের দরজা খুললেই যা খুঁজছি তা পেয়ে যাব। এর পর হঠাৎ কাশ্মীরের অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখে নিলুম, যেমন চশমাসাহী, যুশমার্গ প্রভৃতি। জিতেন শ্রীনগরে কিছু কেনাকাটা করল, আমার হাতে টাকা নেই, কেনার ক্ষমতাও নেই, তবু ওর সঙ্গে গেলুম, তারপর যথাসময়ে একদিন কাশ্মীর দর্শন সমাপ্ত ক'রে ফিরে এলুম কলকাতায়। মনে হল এবার কিছু নিয়ে এসেছি। হুথচটিতে সর্প সম্পর্কে যে কৌতূহল জাগরিত হয়েছিল, সোকরি গলিতে ও কালীঘাটে এ বিষয়ে যা জেনেছিলুম,

তা শুধু বাইরে থেকেই জানা। এবার যেন মনে হল, আমার নিজের ভেতর থেকেই এসব পাব।

তখনও অধ্যাত্মজগতের কোন নিয়মকানুন জানতাম না। খাওয়া-দাওয়ার পর ধ্যান করতে নেই এ সব বোধ ছিল না। পরে এ সম্পর্কে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বালীর সাধক জ্যোতিষী ননীগোপাল ভট্টাচার্য। তাঁর সম্পর্কে আমার নানাগ্রন্থে আমি লিখেছি। এ সব গ্রন্থ পাঠ করে নানা জনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের অভিযোগ যে, তাঁরা তেমন কিছু দেখতে পাননি। এর কারণ এই যে, সাধকরা সবার কাছেই তাঁদের অধ্যাত্ম শক্তির পরিচয় দেন না। নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া তাঁরা তাঁদের অধ্যাত্ম ক্ষমতা প্রদর্শন করেন না। নামের জন্য, অহংকারের জন্য তাঁরা এ কাজ করেন না। এই সংযমই অনেকের কাছে তাঁদের রহস্যময় করে রাখে। সে কথা এখন থাক, যা বলেছিলুম, তাই বলি,

কলকাতায় ফিরে উৎসাহের আতিশয্যে প্রথম রাত্রিতেই সেই শক্তিশালী ভদ্রলোকের নির্দেশে আমি ধ্যানে বসলুম। খাওয়া-দাওয়ার পরে, যখন সব নির্জন হয়ে আসছে, এই মুহূর্তে পদ্মাসন ক'রে আমি চোখ বুজলুম। দুই ভুরুর মধ্যে আমি সন্ধান করতে লাগলুম, কোথায় আছে বিন্দু। চোখ বুজলেই যে একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত আলোর ফুলকি দেখা যায় এবিশ্বাস আমার ছিল না। কিন্তু আমি সত্যিই আশ্চর্য হলুম। দেখি বহুদূর থেকে গাঢ় নীলবর্ণের একটা জ্যোতি বিন্দুরূপে ফুটে উঠে বড় হতে হতে আমার দিকে ছুটে আসছে। সেই বিন্দু আরও বৃহত্তর আলোক বৃত্ত রচনা করছে, তার মধ্যে ফুটে উঠেছে ঘন জমাটবাঁধা অন্ধকার। সেই অন্ধকার থেকে আবার একটি বিন্দু ফুটে উঠে আরও বৃহত্তর আলোর রচনা করেছে। তার মধ্যেকার অন্ধকার থেকে আবার নতুন বিন্দু বেরুচ্ছে। অদ্ভুত, এমন কখনও ভাবিনি, চিন্তা করিনি। অপরিসীম জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল মনের মধ্যে। এটা কি? প্রত্যেক মানুষই কি চোখ বুজলে এই বৃত্তাকার নীলজ্যোতি দেখতে পায়?

আশ্চর্য আকর্ষণ যেন সেই জ্যোতির্বৃত্তের। সেদিকে মানসনেত্রে তাকিয়ে থাকলে কেমন একটা নেশা জন্মে যায়। অন্য তো কোন রূপ নেই তার, অন্য কোন দর্শনীয় জিনিস নেই, অথচ কী তীব্র আকর্ষণ। পতঙ্গকে যেমন অগ্নিগোলক আকর্ষণ করে এ যেন সেই রকম। অদ্ভুত নেশায় রাতের পর রাত সেই নীল জ্যোতির্বৃত্ত দর্শনের জন্য ব্যয় করতে লাগলাম। রোজই যে, একই সময় একই ভাবে সেই বৃত্তাকার জ্যোতি মানসনেত্রে ফুটে উঠতে লাগল, তা নয়। কোন দিন চোখ বুজেই যদি তার ইঙ্গিত না পাওয়া যায় অপরিসীম যন্ত্রণা বোধ হয়। মনে হয়, ব্যর্থ, ব্যর্থ, সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ, যদি না সেই বিন্দু দর্শন হয়। কেন যেন ঈশ্বরের করুণা বঞ্চিত মনে হয় নিজেকে। আর একথাটা মনে আসতেই অদ্ভুত এক যন্ত্রণা হতে থাকে। জেদ চেপে যায়। দেখতেই হবে, যে ক'রেই হোক দেখতে হবেই। অনন্ত প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকি সামনে অনন্ত অন্ধকারের দিকে কখন বিপুল অন্ধকারের বুকে সেই স্নিগ্ধ নীল জ্যোতির রেখা ফুটে উঠবে এই আশায়।

বসছি। রাত্রি নীরব হলেই সকলের অজ্ঞাতসারে ধ্যানে বসছি আমি। তাকিয়ে থাকছি মহা শূন্যের দিকে কখন তার আবির্ভাব হবে এই প্রত্যাশায়। এরই মধ্যে হঠাৎ কয়েকদিন যাবৎই মনে হতে লাগল পদ্মাসনে রাখলেই শরীরটা কেন যেমন দুলতে থাকে। ঝুলাতে দুলতে যেমন আনন্দবোধ হয়, এ যেন ঠিক সেই রকম। অদ্ভুত এক আনন্দ বোধহয় সেই দোলানিতে। শরীরটাকেও হাল্কা মনে হয়।

কোথায় যেন আমার ভেতরেই একটা রেকর্ড ছিল। সেই নীল জ্যোতির্বৃত্ত যেন তার উপর পিনের কাজ করতে লাগল। কোথাও ভেতরে সুপ্ত আকারে হয় তো ছিল কতকগুলি অভিজ্ঞতা। একে একে তা ফুটে উঠতে লাগল। কেন যেন মনে হল, শুধু রাতে কেন, ভোরে ব্রাহ্মমুহূর্তে ধ্যান করলেও তো হয়। শুনেছি, এসময়ে দেবতাদের মর্তের আবহাওয়ার বিচরণের সময়। কিন্তু কিছুতেই তা

হয়ে উঠল না। কে যেন ভেতর থেকে বলতে লাগল, তার চেয়ে বরং ভোরবেলা হাত মুখ ধুয়ে, প্রাতঃকৃত্য সেরে, স্নানটান করে এক-বারে বোস। তাই বসলুম।

সকালবেলা আলোর বিন্দু যেন তাড়াতাড়ি এসে গেল। তারপরই ছড়িয়ে পড়ল। কিছুদিন আগে রাতে যেমন নীল জ্যোতির্বৃত্ত সিগা-রেটের ধুঁয়ার কুণ্ডলীর মত রিঙ তৈরী করত, সে রকম নয়। এ যেন অনিঃশেষ এক আলোর ধুঁয়া ছেড়ে দিয়ে সামনের স্পেসটাকে আলোর রশ্মিতে ছেয়ে দিতে লাগল। শুধু তাই নয়, মনে হল, আমার শরীরটা খুব হাল্কা। সেই জ্যোতি দেখে ভাসতে ভাসতে আমি উপরে উঠছি। চোখ বুজেই তখন হাতড়ে হাতড়ে দেখি, আমি আমার আসনেই আছি কিনা। অদ্ভুত এক অবস্থা। যদি বন্ধ চোখে মনকে নিচের দিকে ঠেলে দিই, তখন এক রকম অভিজ্ঞতা, আবার উর্ধ্বে মানসনেত্র ছড়িয়ে দিলে আর একরকম চিত্র। পাশে মনোনিবেশ করলে সেখানে আর একরকম ভাব।

গম্ভীর অন্ধকার থেকে যে জ্যোতির্বৃত্ত ফুটে উঠে এতদিন আমাকে শিহরিত করছিল, ধীরে ধীরে সে জ্যোতির্বৃত্ত যেন হারিয়ে যেতে লাগল। তার বদলে আসতে লাগল আলো, নানা বর্ণের নানা তরঙ্গের আলো। তবে সেই আলোর আকাশের মধ্যে মাঝে মাঝেই সন্ধ্যাকাশের তারার মত উঁকি দেয় একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু। যেন ছোট্ট একখণ্ড উজ্জ্বল হীরের মত তা জ্বলজ্বল করে।

যে আলো দেখতে লাগলাম, সে যেন শুধুমাত্র আলো নয় আলোর আকাশ। একটা হাল্কা পাখির মত আমি উড়ছি। উড়ছি নয় শুধু, উঠছি। একটা শঙ্খচিল যেমন পাক খেতে খেতে উপরে ওঠে, তেমনই উঠছি। আকাশের বহুস্তর ভেদ করছি, আর আনন্দ পাচ্ছি। আকাশের যেন শেষ নেই, আকাশের ওপারে আকাশ। আলোময় অনন্ত আকাশ। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর আলোর আকাশের অনন্ত বিস্তার। যত উঠছি, আলোর দীপ্তিও যেন তত বাড়ছে। আলোর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম ভাবনা

হচ্ছে। যেন এক অভূতপূর্ব আনন্দধারায় আকাশ প্লাবিত হয়ে আছে।

জ্যোতির্বৃত্তের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে একি অদ্ভুত আকাশ আমার মানসনেত্রে ফুটে উঠেছে। অসামান্য একটা জ্যোতিবন্ধনের মধ্যে যে এত বড় একটা আকাশ লুকিয়ে ছিল আগে ভাবতে পারিনি। বৃত্তাকার এই জ্যোতিই কি তবে কুণ্ডলিনী শক্তি? যা অনন্তকে মায়ার বন্ধনে সীমিত ক'রে রাখে? অথচ এই বন্ধনের মধ্যেই অসীম রয়েছে?

নীল জ্যোতি বৃত্তের মধ্য দিয়ে প্রথম দিকে যে জমাটবাঁধা অন্ধকার দেখা দিত, প্রথমত তার ভেতর থেকে বেরুতো জ্যোতির্বিন্দু। পরে মনে হত সেই অন্ধকারের ওপারে মহাবিশাল এক আকাশ আছে। পরিমাপহীন সে আকাশ। তার এক দুর্বোধ্য আকর্ষণ। সেই আকাশ যেন চৌম্বক আকর্ষণে ভরা। শুধু টানে, টানে আর টানে। এক এক সে টান এত প্রবল মনে হয় যে, প্রতিরোধ করার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলি। এক দুর্নিবার আকর্ষণে কে যেন টেনে নিয়ে চলে। প্রথম প্রথম কেমন যেন ভয় করত সেই টানের মুখে। নিজেকে হারিয়ে না ফেলি এই ভয়ে মুহূর্তের মধ্যে চোখ মেলে তাকাতাম, ধ্যান ভেঙে যেত। ভয় করছে, অথচ দুর্নিবার আকর্ষণ। এ অদ্ভুত দ্বন্দ্বের সত্যি কান তুলনা নেই। এই টানা পোড়েনের মধ্যেই অকস্মাৎ একদিন এমন এক টান বোধ করলুম যে, নিজেকে আর জ্যোতির্বৃত্তের এ পারে ধরে রাখতে পারলুম না। মুহূর্তের মধ্য যেন সেই রহস্যময় অন্ধকার ভেদ ক'রে ওপারে গিয়ে পড়লুম। সত্যিই বিশাল আকাশ ওপারে। অযুতকোটি গ্রহনক্ষত্র নিয়ে সে অন্তহীন আকাশ যেন হাসছে। তার বিরাট বিশাল ব্যাপ্তিতে সত্যি দিশেহারা হবার উপক্রম। ক্ষুদ্র নীড়ের বন্ধন কাটিয়ে একটা পাখির ছানা আকাশের স্বাদ প্রথম যে রকম পায়, যেন সেই রকম ভাব।

এরপরই শরীর যেন হাল্কা হচ্ছে আমার। এখন আর জ্যোতিবৃত্তের তোরণ ভেদ ক'রে আকাশের ছাড়পত্র পেতে হয় না। যেন অবাধ বিচরণের নাগরিক অধিকার পেয়ে গেছি এখানে। মানস

নেত্রে সেই আলোর আকাশ ধরা দেয়। আমার মনে হয় যে, হাল্কা হয়ে গেছি। দেহটা উপরে উঠছে। কখনও কখনও পরীক্ষা-মূলকভাবে হাত দুটোকে উপরের দিকে তুলবার চেষ্টা করতেই মনে হচ্ছে, আপনিই যেন সে উঠে যাচ্ছে। হাতদুটো যেন পাখির ডানা, হাওয়ায় ভাসছে। জলের মধ্যে দেহ ছেড়ে দিলে জলের চাপ যেমন দেহটাকে উপরে ঠেলে তোলার চেষ্টা করে, যেন তেমনি ভাব।

আর একটা জিনিস যেন আমাকে বেশি অবাক করছে। কখনও কখনও সামনের আকাশটিকে সূক্ষ্ম কাঁচের মত মনে হচ্ছে। তার মধ্যে জীবন্ত কতকগুলো মানুষের মুখ ভেসে উঠছে। এরা কারা। কাদের মুখ, কে জানে। জীবনে হেন মুখ আগে কখনও দেখিনি। সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য বোধ করলুম যখন নিজেকেই দেখতে লাগলুম। আমার দিকে আমি যেন পেছন ফিরে নয় তো পাশ ফিরে বসে আছি। পাশ থেকে আমার কান, গাল, নাকের ডগা, ঠোঁটের কিছু অংশ সব দেখা যাচ্ছে। যেন সামনে এক আশ্চর্য আয়না। আয়নায় লোক নিজেকে দেখে মুখোমুখি। এ আয়নায় দেখা যায় পিছন দিক, পার্শ্ব-দিক।

অনন্ত বিশাল ব্যাপ্তির আকাশটাকে যেন ক্রমশঃ বড় বেশি সাদাটে দেখাচ্ছে। যেন জলহীন পাতলা মেঘের আবরণে ছাওয়া আকাশ। মেঘ তো নয় যেন জ্যোতির্ময় ধূম্রপুঞ্জ এ আর এক অদ্ভুত জ্যোতির্ময় আকাশ। পাতলা কাঁচ দিয়ে ঘেরা ঘরের মধ্যে বাইরের আলো প্রবেশের চেষ্টা করলে সেই কাঁচকে যেমন দেখায়, আকাশটাও যেন অনেকটা সেইরকম। অতি উজ্জ্বল অথচ শুভ্র মেঘের মত। অদ্ভুত একটা আনন্দ-হিল্লোল যেন সেখানে প্রবাহিত হচ্ছে।

নিজের এই ক্ষুদ্র দেহ বন্ধনের মধ্যে এমন আশ্চর্য জিনিস আছে ভেবে অবাক বোধ করছি। সত্যি এ হেন অভিজ্ঞতায় আমি যেন বিভ্রান্ত। এতদিন দেহটা দুলছিল। যেন এমন কোন আসনের উপর বসে আছি যার ঊর্ধ্বভাগ গোলাকৃতি। তাই সেখানে বসে থেকে দুলছি। এখন আবার নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। দোলানি থেমে

গেছে। মনে হচ্ছে কি যেন একটা সমস্ত দেহকে উপরে টানছে। আমার শরীরটা যেন রবারের টিউব। তাতে বায়ু পূর্ণ হয়ে আমাকে বেলুনের মত উপরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। চোখ বুজলেই যেন চেতনা মহাবেগে ঊর্ধ্বে লাফিয়ে উঠছে। স্তরের পর স্তর ভেদ ক'রে উপরে উঠে যাচ্ছি যেন। আকাশটা যেন অসংখ্য স্তরে সাজানো। স্তরে স্তরে আকাশের এক একটা আবরণ খসে যাচ্ছে আর ভিন্নতর একটা আকাশের দৃশ্য দেখছি। এক এক স্তরে যেন এক এক রকম অভিজ্ঞতা। এক একটা স্তর পার হবার পর আর এক ধরনের অন্ধকারের স্তর আসছে বলে মনে হয়। সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে কেমন ভয় ভয় করে। কিন্তু সেই অন্ধকারের স্তর ভেদ ক'রে নতুন আকাশে পড়তেই কেমন একটা আনন্দ শিহরণ পাচ্ছি। ক্রমশঃ যেন আকাশ বেশি আলোয় ভরে উঠছে। এই আলোর রশ্মি যত তীব্র, আনন্দের ঝর্ণাধারাও যেন তত বেশী। ক্রমশঃ আকাশের শ্বেত ধুম্রপুঞ্জ যেন ছিঁড়ে ফুঁড়ে যাচ্ছে। কোদালে মেঘের মৌজের মত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শ্বেত ধুম্ররাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে ভাসছে। এক কড়াই দুধে ছানা কাটালে যেমন নীলজলের বুকে টুকরো টুকরো সাদা ছানার ডেলা ভাসতে থাকে, তেমনি যেন সমস্ত আকাশটাই মাঝে মাঝে ছানা কাটা হয়ে যাচ্ছে। আর সেই সাদা মেঘের ফাঁকে অনন্ত ইঙ্গিত নিয়ে নীল আকাশ উঁকি দিচ্ছে। আর এরই মধ্যে আশ্চর্য একটা শব্দ উঠছে যেন ভেতর থেকে—অ-উ-ম, অ-উ-ম। সমগ্র মহাকাশ যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই শব্দে, গম্‌গম্‌ করছে। গুহার মধ্যে শব্দ করলে যেমন প্রতিধ্বনি গমগম করতে থাকে, সেইরকম। অদ্ভুত এক উন্মাদনা যেন সেই শব্দের মধ্যে। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছি।

অদ্ভুত আর এক অভিজ্ঞতা হল। সকালবেলা একদিন জানালার ধারে ধ্যানে বসেছি। প্রভাত সূর্যের আলো বাইরে ঝলমল করছে। চোখ বুজতেই মনে হল সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ঘনতরলাকৃতি রক্ত-সমুদ্র। ধীরে ধীরে সেই রক্তবর্ণ আকাশ ফেকাসে হয়ে আসতে

লাগল। তার বুকের মধ্যে ছোট সবুজাকার একটি বৃত্ত ফুটে উঠল। সেই বৃত্তের প্রান্তভাগ থেকে অজস্র সবুজ রশ্মি ছড়াতে লাগল। ছড়াতে ছড়াতে একসময় সমস্ত আকাশটাকে ছায়া ছায়া, জলো জলো করে দিল তারপর সেই জল জল ভাবটা কেটে গিয়ে শ্বেতশুভ্র মেঘমণ্ডিত শরতের আকাশ উঁকি দিতে লাগল যেন। আলোক দীপ্ত আশ্চর্য সেই উজ্জ্বল আকাশ। আমি অবাক বিস্ময়ে অভ্যন্তরের দিকেই তাকিয়ে থাকলুম।

ঠিক এই যখন অবস্থা, তখন আমার এক বিশেষ বন্ধু আমাকে নিমন্ত্রণ জানাতে এল। তাঁদের বাড়িতে মানসিক ৺কালী পুজো হচ্ছে। উচ্চ-কোটির একজন সাধক পুরোহিত নাকি পুজো করবেন। আমি যেন যাই।

ভিন্নজগৎ সম্পর্কে আমার তখন বিরাট একটা কৌতুহল জাগরিত হয়েছে বটে, তবে তখনও পুজো পার্বণ সম্পর্কে আমার মনে তেমন একটা আগ্রহ জন্মায় নি। কারণ, কোন এক শাস্ত্রগ্রন্থে আমি একবার পড়েছিলাম যে, অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে তপজপ ও মূর্তিপুজো হল নিকৃষ্ট স্তরের সাধনা। তখন পর্যন্ত অনেকগুলো বই পড়ে দেব-দেবীর মূর্তি সম্পর্কে আমার এই ধারণাই হয়েছিল যে, এগুলো আসলে এক একটি ভাবের প্রতীক। যে ধরনের দেবদেবী আমরা পুজো করি, আসলে সে রূপে তাঁদের কোন অস্তিত্ব নেই। ৺কালী পুজো মূলতঃ শক্তিপুজো। এই ৺কালী মূর্তি হল এক অব্যক্ত রহস্য থেকে যে-ভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল তারই এক ভাবমূর্তি। বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাস একটি প্রতীকের মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে মাত্র। সেই প্রতীকেরই আমরা পুজো করি। অন্তর্জগতে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করে ব্যক্ত থেকে সেই অব্যক্ত অবস্থায় পৌঁছুতে পারাটাই অধ্যাত্ম সাধনার মূল কথা। এ-সব পুজো আর্চার কোন মূল্য নেই। স্থূল মনকে কোন রকমে বিশ্বাসে আটকে রাখার জন্যই মূর্তির কল্পনা করা হয়েছে। মূলতঃ সবই মহাশূন্য। সেইজন্য যাঁরা নিরাকার ঈশ্বরের সাধনা করেন তাঁরাও এক ধরনের প্রতীক সামনে

রেখে নেন। যেমন মুসলমানেরা মক্কাকে তাদের লক্ষ্যস্থল হিসেবে ধরে নিয়ে সেই দিকে মাথা রেখে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান। তাদের মসজিদ-এর গম্বুজ ক্রমশ উর্ধ্বে উঠে গিয়ে অনন্তের প্রতি অনিঃশেষ ইঙ্গিত দেয়। তাদের দীর্ঘবিস্তার আজান-ধ্বনিও সেই অসীমকেই ইঙ্গিত করে। খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের কোন মুর্তি না রাখলেও, ক্রুশকে সামনে রাখে। তাদের গীর্জাও উর্ধ্বদিকে গগনচুম্বী। গীর্জার বেল ঢং ঢং করে যে দীর্ঘবিস্তার শব্দের তরঙ্গ তুলে তাও অনন্তের প্রতি নির্দেশ দেয়। হিন্দুদের মুর্তিও তেমনই একটা সত্যের প্রতি ইঙ্গিত মাত্র। সেই অর্থে ৺কালী মুর্তিও বিশেষভাবে ইঙ্গিতবহ। এই ৺কালী মূর্তিও অব্যক্ত স্থির 'এক' থেকে ব্যাখ্যার অতীত ভাবে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল সেই আলোড়নজাত সৃষ্টির ইতিহাস। পুকুরের বুকে ঢিল পড়লে যেমন বৃত্তাকার ঢেউ উঠে ক্রমশঃ বিস্তারিত হয়, সেই 'একে'র বুকে ঢেউ উঠে তেমনি স্থিরকে অস্থির করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। যখন 'এক' থেকে 'দুই' হচ্ছে, তখনই কালের উদ্ভব—কারণ তখনই গতি জন্ম লাভ করে। 'দুই' ছাড়া গতির স্বরূপ বোঝা যায় না। আলোড়ন-এর ফলেই একের পরিপ্রেক্ষিতে দুইয়ের চলমানতা। এই গতি থেকেই সময়ের সৃষ্টি। সময়কে বলে কাল। যে আলোড়ন থেকে এই কালের সৃষ্টি, কাল সেই শক্তিরূপ আলোড়ন থেকে জাত বলে শক্তি হল কালের জননী, যাকে কালী বলা হয়। যদিও তরঙ্গ-এর ক্রমবিস্তার বিকশিত হয়েছে, তবুও সেই বিকাশ কয়েকটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এ হল কোয়াণ্টাম প্রসেসের মত। শক্তি তরঙ্গের এই বৃত্ত হল একান্নটি। এই জন্য যে শক্তির ফলে বিশ্বজগতের সৃষ্টি সেই শক্তিকে একান্নক্ষরা বলা হয়। এবং যেহেতু এই শক্তি বিকশিত হয় বৃত্তাকারে, সেই জন্য তিনি বৃত্তকা শক্তি নামেও পরিচিতা। এই একান্নটি তরঙ্গকে বোঝাবার জন্য ৺কালীর গলায় পঞ্চাশটি মুণ্ডমালা দেওয়া হয়েছে এবং হাতে একটি। তরঙ্গকে আমাদের ভাষায় বলে বর্ণ। ইংরেজীতে বলা যায় Vibration. এই বর্ণগুলি যে প্রতীকে ধরা পড়েছে তার নাম অক্ষর। বস্তুত এক

একটি অক্ষর এক একটির শক্তি-তরঙ্গের বা Vibration-এর প্রতীক। সেই জন্য এক এক ভাবে তাদের উচ্চারণ করার পদ্ধতি। Vibration গুলি সূক্ষ্মতম অবস্থা থেকে স্থূল পর্যায়ে নেমে এসেছে। একান্নতম Vibration-এর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ তরঙ্গ দৃষ্টিগোচর নয়। বস্তুত বিজ্ঞানেও ঘটনা সেই রকমই। শব্দ ও আলো, Vioration জাত। আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য আলো ও শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দ Vibration-এর তারতম্যহেতু। কুড়িহাজার ফ্রিকোয়েন্সির শব্দই আমরা শুনতে পাই। এর কম বা বেশি নয়। তাই বলে যে এর কম বা বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতে শব্দ নেই তা নয়। আছে। ভিন্নতর প্রাণী তা শুনতে পায়, যেমন কুকুর। এই জন্য তন্ত্রমতে শব্দও নানা পর্যায়ের—পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী। এর মধ্যে প্রথম তিনটি স্তরের শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের শ্রুতিগ্রাহ্য নয় কিন্তু বৈখরী পর্যায়ের শব্দ শ্রুতিগ্রাহ্য। আলোর ক্ষেত্রেও কুড়িহাজার ফ্রিকোয়েন্সির আলো দ্রষ্টব্য। কম বা বেশি নয়। বস্তুজগতেরও তেমনি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি আছে। তরঙ্গের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়েই তা বস্তু আকারে দেখা দেয়। কালীর হাতের একান্নতম মুণ্ডটি সেই নির্দিষ্ট তরঙ্গ বা পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি করেছিল। এই বর্ণকে মুণ্ডদ্বারা বোঝানোর অর্থ এই যে, দেহের মধ্যে মুণ্ডতেই প্রাণ শক্তির সব কিছু সুপ্ত আকারে থাকে। দেহের সঙ্গে যুক্ত হলেই তা প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করে। তরঙ্গের এই সুপ্ত অবস্থা বোঝাবার জন্যই মুণ্ডের কল্পনা করা হয়েছে। একান্নতম তরঙ্গই 'অণু' সৃষ্টি করেছিল। সেই অণুগুলির পারস্পরিক যোগাযোগেই (Permutation এই পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতের সৃষ্টি। একান্নতম মুণ্ড ৺মায়ের হাতে থাকার অর্থ সেখান থেকেই সৃষ্টি ব্রত্ররূপ নিচ্ছে। হাত হল সূত্র কর্মের প্রতীক।

এই যে শক্তি, তিনি নিজস্ব নিয়মেই জগৎ পালন করেন ও ধ্বংস করেন। এই জন্য তাঁর দুই হাতে পালনের প্রতীক (বর ও অভয়) এবং এক হাতে সৃষ্টির প্রতীক (মুণ্ড) ও আর এক হাতে ধ্বংসের প্রতীক (খড়্গ)। শক্তির বিস্তার মানুষের কল্পনার অতীত,

সেইজন্য কোন বসন অর্থাৎ সীমার দ্বারা তাঁকে আবদ্ধ করা হয়নি, তিনি দিগ্‌বসনা। তাঁর বর্ণ কালো, কারণ তিনি রহস্যময়ী সে রহস্য ভেদযোগ্য নয়। তাই আমাদের কাছে অন্ধকার বা কৃষ্ণবর্ণ স্বরূপ। যে 'এক' থেকে এই শক্তিতরঙ্গের সৃষ্টি, সেই 'এক'ই হলেন শিব। তিনি শক্তির পায়ের নিচে মৃতপ্রায়। এটাই স্বাভাবিক, কারণ, যখন সেই উৎজাত শক্তি ক্রিয়াশীলা হন, তখন উৎস নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। আণবিক বিস্ফোরণের সময়ও এই খেলাই চলে। যে অণু বিস্ফোরিত হয় তার কেন্দ্র নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। সেই নিষ্ক্রিয় কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে শক্তিতরঙ্গ খেলা করতে থাকে। শক্তির এই পরিক্রমা বা নৃত্য শেষ হ'লে আবার তা কেন্দ্রে এসে স্থির হয়। কেন্দ্রস্থ সত্য আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাঁর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিক্রিয়া সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরম কেন্দ্র দুই অবস্থাতেই নিষ্ক্রিয়, সগুণেও নিষ্ক্রিয়, নির্গুণেও নিষ্ক্রিয়। সগুণে তাঁর সুপ্ত ক্রিয়া-শক্তির প্রকাশ। সেই ক্রিয়াশক্তি বিচ্ছুরিত হলে মুলে তিনি শূন্য-রূপেই থাকেন। ক্রিয়াশক্তি নির্গুণ স্বভাব প্রাপ্ত হলে আবার সুপ্ত আকারে স্থির হয়ে যায়। স্বভাবজ কারণে তাঁর অহংবোধ জাগ্রত হলেই তাঁর সুপ্ত শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। 'অহং' এই বোধ চৈতন্য স্বরূপ। চৈতন্যের প্রতীক শ্বেতবর্ণ। সেই জন্য শক্তির পায়ের নিচের পুরুষ বা কেন্দ্র শ্বেতবর্ণের। তাঁর অভ্যন্তরে অন্ধকাররূপ শূন্যতা রয়েছে, তন্ত্রে যাকে কৃষ্ণশিব হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এই প্রকৃতি যে-ভাবে সাম্য রক্ষা করেন অর্থাৎ প্রকৃতিতে সাম্য রক্ষা করে সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখেন তারই প্রতীক হল কালীর বিলম্বিত রসনা। এই রসনা হল খেচরী মুদ্রার প্রতীক। যোগী সাধকরা যখন সাধনা করতে করতে ভূমি ত্যাগ করেন, অর্থাৎ আসন ছেড়ে উঠে যান, তখন জিহ্বা বিলম্বিত আকারে বাইরে চলে আসে। সেই জিহ্বাই ঘুরে গিয়ে কণ্ঠমূলে প্রবেশ করে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে কুম্ভক তৈরী করে। এই খেচরী মুদ্রা না হলে শূন্যে ভাসমান যোগী তাঁর দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন

না। সেই সাম্য অর্থাৎ প্রকৃতির ভারসাম্য বোঝাবার জন্য ৺কালীর বিলম্বিত জিহ্বা তৈরী করা হয়েছে, অর্থাৎ এই প্রকৃতি তাঁর থেকেই যেমন সৃষ্ট, ৺তাতেই লয়ীকৃত, তেমনই তাঁর দ্বারাই ভারসাম্য রক্ষিত। এই উচ্চকোটির একটি ভাব বোঝানোর জন্যই ৺কালী মূর্তির কল্পনা। এই ভাবের বাইরে দেবী হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব আছে বলে আমার ধারণা নয়। সেই জন্য মূর্তি পুজোয় আমার তেমন আগ্রহ নেই। এই মূর্তি হল সাধারণকে অধ্যাত্ম পথে আকৃষ্ট ক'রে রাখার একটি উপায় মাত্র। যাঁরা পুজো করেন, তাঁরাও এর অর্থ জানেন না বলে আমার বিশ্বাস। সেইজন্য পুরোহিত শ্রেণী সম্পর্কে আমার তেমন আগ্রহ নেই। মূর্তি পুজো সম্পর্কে তো নয়ই। তবু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু যখন আমন্ত্রণ করেছে, সে আমন্ত্রণ অস্বীকার করতে পারলুম না। গেলুম। বন্ধুর অনুরোধ মত সকাল সকালই গেলুম। কারণ পুজো তো একটি সামাজিক উৎসবও বটে। তাতে কিছু পালনীয় কর্তব্যও আছে। সেই কর্তব্যে অংশ গ্রহণ করার জন্যই বন্ধুটি আমাকে একটু আগেই সেখানে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। আমি স্বভাবতই একটু ভিড় এড়িয়ে চলতে পছন্দ করি। তবু অনেক সময়ই এমন পরিবেশ ও প্রয়োজন দেখা দেয় যে, ভিড় এড়িয়ে চলা সম্ভব হয় না। ফলে আমাকে যেতে হল। বেলা এগারোটা নাগাদ বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তখনও আত্মীয় স্বজন কেউ এসে উপস্থিত হয়নি। বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি এক অপরিচিত ভদ্রলোক বসে আছেন। নগ্ন গাত্র। গলায় মোটা পৈতে। আমায় দেখেই সাদর অভ্যর্থনা জানালেন: এই যে আসুন বাবা, আসুন।' যেন আমি ভদ্রলোকের কত পরিচিত, এমন ভাব। তন্ন তন্ন ক'রে নিজের স্মৃতি হাতড়ে বেড়াতে লাগলুম। এঁকে তো কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তবে এমন পরিচিতের মতন ব্যবহার করছেন কেন

—'বসুন, বাবা, বসুন, দাঁড়িয়ে কেন?' ভদ্রলোক আমায় বসতে বললেন।

বসলুম। বসে বসে স্মৃতি হাতড়াতে লাগলুম। এমন সময় দেখি আমার বন্ধুটি এসে হাজির—আরে তুই এসে গেছিস! তোকে পরিচয় করিয়ে দিই। আমাদের পুরোহিত মশাই, সাধক লোক।

পুরোহিত ভদ্রলোক বিনয়ের ভঙ্গী করে বললেন, কি যে বলেন বাবা। আমার বন্ধুটি বলল: জানেন, আমার এই বন্ধুটিও ধর্মের উপর বইটই লেখে। ঐ যে, কি যেন তোর বইয়ের নাম?

লজ্জা পেলুম। সে কথা বললুম না।

পুরোহিতমশাই আমার বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার এই বন্ধুটি খুব উচ্চকোটির সাধক, বাবা।

আমার বন্ধুটি বলল: আপনারাই ভাল চিনবেন, আমাদের আর সে চোখ কোথায়?

পুরোহিতমশাই তাকে বললেন: আপনার এই বন্ধুটির সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক রাখবেন।

বন্ধুটির অভিযোগ শোনা গেল: আমরা তো রাখি, ওই তো রাখে না।

পুরোহিতমশাই বললেন: 'রাখবে, রাখবে। আপনাদের সঙ্গে যে জন্ম জন্মান্তরের পরিচয়।' তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন: হ্যাঁ, বাবা, তা চলুন ও ঘরে গিয়ে বসি।

—কোথায়?

'—মা যে-ঘরে আছেন, সে-ঘরে বসলেই ভাল হয় না?

আমি ভাবলুম, আমার বন্ধুটির মায়ের কথা বলছেন তিনি। বললুম, চলুন।

বন্ধুটি বলল: 'তুই পুরোহিতমশাইয়ের সঙ্গে কথা বল্, আমি বাজার থেকে আসছি।' সে বেরিয়ে গেল। পুরোহিতমশাই আমাকে নিয়ে ভেতরের দিকে গেলেন। বাড়ির সর্বশেষ উত্তর প্রান্তে একটি ঘর। ঈশ্বরের করুণায় বন্ধুটি বিরাট গৃহের মালিক। উত্তর প্রান্তে পূজা আরতির জন্য ছোট একটি মন্দির মতন। পুরোহিতমশাই আমাকে নিয়ে সেখানে বসালেন। দেখলুম, ইতিমধ্যেই ৺কালীমূর্তি

বেদীতে স্থাপিত হয়েছে। সেই ৺মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে পুরোহিতমশাই একবার হাসলেন। তারপর আমায় বললেন: বস্থন, বাবা, বস্থন। তিনি একটি আসন বিছিয়ে দিলেন।

আমি বসলুম,

এবার আমার মুখের দিকে অনাবিল দৃষ্টি মেলে তাকালেন পুরোহিত ভদ্রলোকটি: তা বাবা, মনের মধ্যে এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেন?

কিছু বুঝতে পারলুম না। বললুম, কিসের দ্বিধাদ্বন্দ্ব?

—বাবা, মহাপুরুষদের তো করুণা পেয়েছেন। কিছুদূর উঠেছেনও, তবুও ৺মায়ের উপর বিশ্বাস নেই কেন?

হেসে বললুম, ৺মা কি সত্যি সত্যিই আছেন বলে মনে করেন?

—আছেন তো নিশ্চয়ই। সেই ৺মাকে দেখবার জন্যেই তো এমন হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন।

—কই না তো!

পুরোহিতমশাই বললেন. ঐ যে সাপ খুঁজছেন, সেতো এই ৺মা-ই, মা কুলকুণ্ডলিনী।

অবাক হলুম, তাহলে! এতো সাধারণ ব্যক্তি নন! আমার মনের এই গোপন খবর যিনি জানতে পেরেছেন তাঁকে সাধারণ বলব কি ক'রে! ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড উৎফুল্ল বোধ করলুম।

পুরোহিতমশাই বললেন, কি বাবা, আমি ঠিক বলছি না?

অবাক হয়ে বললুম, আপনি একথা জানলেন কি ক'রে?

তিনি বললেন, আমি কি জানি বাবা, ৺মা জানালেন।

—৺মা!

—হ্যাঁ গো, এই মৃন্ময়ী ৺মা' আসলে উনি তো আর মৃন্ময়ী নন, চিন্ময়ী।

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি সত্যি সত্যি ৺মায়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?

—করিই তো।

—কেন করেন?

—আছেন বলে করি।

—কিন্তু আমি তো……

আমাকে কথা শেষ না করতে দিয়েই তিনি বললেন, আপনি ভাবেন এসব একটা ভাবের মূর্তি, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—নাগো বাবা, না। সত্যি সত্যিই উনি আছেন। আপনিও একদিন জানবেন। আপনার ভেতরে সবই আছে। তবে কিনা কাদায় পড়া সোনা তো, বোঝা যাচ্ছে না। আর একটু ঘষুন চক্-চক্ করবে। সবে তো শুরু করলেন গো।

আশ্চর্য ! লোকটি কে ! দেখতে সরল সাদাসিধে গো-বেচারা গোছের লোক, কথাবার্তা অনেকটা রামকৃষ্ণ ধরনের। তবে যা বলেছেন, তা তো মিথ্যে নয় ! এ-সব উনি টের পেলেন কি ক'রে ! প্রচণ্ড কৌতূহল হল আমার। অনেকে আছেন ভাবাবেগে কৃষ্ণ-দর্শন করেন। ওঁর মাতৃদর্শনও হয়তো তেমন। পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করলুম : আচ্ছা, আপনি তো পুজো করবেন ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবা।

—পুজোর পর ৺মাকে ভোগ দেবেন ?

—হ্যাঁ, বাবা ?

—৺মা কি সে ভোগ গ্রহণ করবেন ?

—কেন নয় বাবা, নিশ্চয়ই করবেন।

—আমাকে আপনি দেখাতে পারবেন যে, ৺মা ভোগ গ্রহণ করেছেন ?

—এ-চোখ দিয়ে তো দেখা যাবে না বাবা।

—কেন ?

—এ যে সূক্ষ্ম ব্যাপার, সূক্ষ্ম চোখ চাই।

—এ তো এড়িয়ে যাবার কথা, ফাঁকি দেবার কথা ?

পুরোহিতমশাই বললেন, কেন বাবা, সূক্ষ্ম চোখ তো আছে। আপনিও তো তাতে বিশ্বাস করেন।

—কই, করি না তো।

—নিশ্চয়ই করেন, নইলে বইয়ের মধ্যে ষড়কোষের কথা লিখলেন কি করে ?

আশ্চর্য। আমি যে বই লিখেছি—সে বই উনি পড়েছেন—বলে তো মনে হয় না। তাহলে কি করে জানলেন।

উনি বললেন ঃ কেন বাবা, আপনি লেখেন নি এ-সব কথা ?

—হ্যাঁ লিখেছি।

—বিজ্ঞানীরা ফটোতে সে কোষের একটিকে ধরেছেন, লেখেননি ? আশ্চর্য। 'সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে' প্রথম খণ্ডে আমি যাদবপুর ইউনিভারসিটির কয়েক জন অধ্যাপকের এ সম্পর্কিত অনুসন্ধান ও প্রমাণের কথা খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ে লিখেছি। তাহলে উনি কি ·····।

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি আমার সে বই পড়েছেন ?

উনি হেসে বললেন, আমি মূর্খ মানুষ, আমি পড়ব কি। ৺মা বলে দিলেন।

বললুম, না হয় ৺মা-ই বলে দিলেন, কিন্তু ৺মায়ের ভোগের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি ?

পুরোহিতমশাই বললেন, যদি মানুষের দেহের উপর কয়েকটি সূক্ষ্মদেহ থাকতে পারে, তাহলে প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই অনুরূপ আকৃতির সূক্ষ্ম দেহ থাকতে পারে না ?

অভ্রান্ত লজিক। স্বীকার করতে বাধ্য হলুম যে, পারেন। পুরোহিত বললেন, বাবা দেবদেবীরা সূক্ষ্ম দেহের জীব। সূক্ষ্ম চোখ হলে তাঁদের দেখা যায়। যে নৈবেদ্য ভোগ হিসেবে আমরা তাঁদের উদ্দেশে নিবেদন করি, সেই খাদ্যেরও সূক্ষ্ম কোষ আছে। মানুষের স্থূলদেহের উপর যেমন পাঁচটি কোষ আছে, এইসব খাদ্যেরও স্থূল আকৃতির উপর পাঁচটি সূক্ষ্ম আকৃতি আছে। সূক্ষ্মদেহী দেবতারা সেই সূক্ষ্ম খাদ্য গ্রহণ করেন।

এমন ক'রে কথাটাকে আগে কখনও বিচার করিনি। সত্যি যেন

প্রশ্নটা ভাবান্তর উপস্থিত করার মত। আমি ভাবতে লাগলুম। আমাদের স্থূল বিচারবুদ্ধি যে সত্যের সত্যতা বিচারে নিতান্তই ভোঁতা অস্ত্র, সে রকম মনে হল। ভেতরে ভেতরে একটা অদ্ভুত আনন্দ বোধ করলুম। ভাবলুম, ভাগ্যই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। ইনিই বোধহয় আমার জীবনে পঞ্চম মহাপুরুষ ব্যক্তি। প্রথম জনের দেখা পেয়েছিলুম হৃধচটিতে, দ্বিতীয় জনের সোকরিগোলিতে, তৃতীয় জনের ৺কালীঘাটে, চতুর্থ জনের এই সেদিন দেখা পেয়ে এলুম গুলমার্গের এলাপাথরে। আমার সমগ্র ভেতর জগতের দুয়ার উনিই খুলে দিয়েছেন। কিন্তু তারপর যে অব্যক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি সম্ভবতঃ সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যই এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে যেন পুরোহিতের কাছে সঁপে দিলুম ঃ—আপনি সব কিছুই জানেন, দয়া ক'রে এবার আমায় কিছু বলুন। আমি যাঁর খোঁজে বেরিয়েছি তাঁকে পাব তো?

পুরোহিতটি হেসে বললেন, পাবেন কি, তিনি যে আপনার ভেতরেই রয়েছেন। আপনাকে ধরা দেবার জন্য ভেতরে ভেতরে জেগেও উঠেছেন। বুঝতে পারেন নি তা?

মুহূর্তের মধ্যে আত্মসমর্পণ ক'রে আমার সমস্ত আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা পুরোহিতমশাইকে ভেঙে বললুম। উনি বললেন, সব জানি বাবা। সাধনার তিনটি স্তরে আপনি ঘোরাফেরা করছেন। একজন মহাপুরুষই আপনাকে সাহায্য করেছেন। তবে জানেন কি বাবা এ তিনটিই হল স্থূল জগতের সাধনার স্তর। তবে কিনা—ঐযে কালো আকাশের স্তর পার হয়েছেন, ঐটেই বড় কথা। ওটা পার হলে আর পড়ার তেমন ভয় থাকে না। আপনি তো বাবা এখন মণিপুর চক্রে ঘোরাফেরা করছেন। মাঝে মাঝে অনাহত চক্রের আকাশ উঁকি দিচ্ছে। দুটো চক্রের পরিচয় তো আগেই পেয়েছেন। কিন্তু পরের স্তরে ঘোরাঘুরি করলেও সে চক্রের পরিচয় পাননি।

বললুম, কে আমাকে সে চক্রের পরিচয় জানাবে?

হেসে পুরোহিতটি বললেন, ৺মা তো সেই জন্যেই আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন গো বাবা। বসুন। ভাল হয়ে বসুন।

পুরোহিতমশাই দেখি ঝোলা থেকে কি একটা বের করলেন। লক্ষ্য ক'রে দেখলুম খড়িমাটি। বাঁ হাত দিয়ে ঝেড়ে ফুঁ দিয়ে মেঝেটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিলেন। তারপর মেঝের উপর কি আঁকলেন। লক্ষ্য ক'রে দেখলুম আর একটি চক্র। প্রথম আঁকলেন একটি পদ্ম। পদ্মের দশটি দল। এই বিভিন্ন পাপড়িতে লিখলেন ডং, ঢং, ণং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং। এই পদ্মের মধ্যে যে বৃত্ত সেই বৃত্তে একটি ত্রিভুজ আঁকলেন। ত্রিভুজের তিনদিকে আঁকলেন স্বস্তিকা চিহ্ন যুক্ত বহ্নিমণ্ডল। ত্রিভুজের মধ্যে লিখলেন 'রং' এই শব্দটি। এই 'রং' শব্দের নিচে একটি মেষ আঁকলেন। এর কোণে আঁকলেন একটি রুদ্রমূর্তি। একটু যেন বৃদ্ধ বৃদ্ধ দেখতে। এর তিনটি চোখ। হাতে অভয় মুদ্রা।

পদ্মের কর্ণিকাতে আঁকলেন একটি শক্তিমূর্তি। চারটি বাহু। মুখের ভাব যেন একটু ভিন্ন। আঁকা শেষ হলে যজ্ঞপদ্মের দল রঞ্জিত করার জন্য যে গুঁড়ো রঙ ছিল তাই দিয়ে পদ্মটি রঙ করলেন। রুদ্রমূর্তির দেহ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করলেন। এর উপর ভস্মাকার গুঁড়ো ছড়িয়ে

দিলেন। দেবীমূর্তির দেহ শ্যামবর্ণে রঞ্জিত করলেন। শাড়ির রঙ করলেন হলুদ।

এই চক্রটি এঁকে পুরোহিতমশাই আমার দিকে তাকালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এটা কি?

তিনি বিনীত ভঙ্গীতে বললেন, আজ্ঞে বাবা, আপনি এখন যে চক্র অবধি উঠেছেন, এটি সেই চক্র।

—এ চক্রের নাম?

—'মণিপুর।' পুরোহিত নিজের নাভিতে হাত দিয়ে বললেন, এ চক্র এখানে থাকে, জানেন। এটি হল তেজের অঞ্চল। জঠরাগ্নির স্থান এখানেই। এই যে বাবা চোখ বুজতেই আপনি এখন কেমন খুব একটা উজ্জ্বল সাদা মেঘের মত দেখেন না?

অবাক হয়ে পুরোহিতের মুখের দিকে তাকালুম। চোখ বুজলে আমি কি দেখি এ বোধ একান্ত আমারই। দ্বিতীয় কারও কাছে এ অভিজ্ঞতার কথা অদ্যাবধি আমি বর্ণনা করিনি। আমার বিস্ময়ের অন্ত থাকল না।

পুরোহিতমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, এমন অবাক হয়ে দেখছেন কি?

বললুম, আমার এ অভিজ্ঞতার কথা আমি অদ্যাবধি অন্য কাউকে বলিনি। আপনি জানলেন কি ক'রে?

বিনীতভাবে পুরোহিত বললেন, আমি কি জানি! মা জানালেন। বললুম, এটা ঠিক যথার্থ কথা নয়। জানার অন্য একটি রহস্যময় উপায় আছে।

আবার সেই বিনয়ের ভঙ্গী করলেন পুরোহিতমশাই: একদিন আপনিও এটি জানতে পারবেন। যখন পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞাত হবেন, তখন দেখবেন সবই জানা যায়।

—পরমাত্মার স্বরূপ কি রকম?

—বাবা, এখন বললে তো তা ভাল ক'রে বুঝতে পারবেন না। পরমাত্মার স্বরূপ হল খুব স্বচ্ছ। এই যে এখন মাঝে মাঝেই খুব

পরিষ্কার একটা কাঁচের মত জিনিস ঝিলিক দেয় না ধ্যানের সময়? যার মধ্যে নানা জিনিস দেখেন? নানা লোক দেখেন? নিজেকে দেখেন?

সত্যি আমার বিস্ময়ের যেন কোন সীমা থাকল না। কি বলব আমি ভেবে পেলুম না। এমন অলৌকিক পুরোহিত আমার কল্পনার মধ্যে কখনও ছিল না।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে পুরোহিত বললেন, কি বাবা, দেখেন না?

বললুম, হ্যাঁ।

—ঐ স্বচ্ছ অবস্থাই আত্মার অবস্থা। এখন শুধু মাত্র ঝিলিক দেয়। পরে ঐ অবস্থার মধ্যে অনেকক্ষণ থাকতে পারবেন। ঐ অবস্থার মধ্যে যখন অনেকক্ষণ থাকতে পারবেন, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার কাছে জ্ঞাত হবে।

নিজের অজ্ঞাতেই হাত জোড় ক'রে পুরোহিতের দিকে তাকালুম, আপনার অপরিসীম করুণা। এবার এই চক্র সম্পর্কে বলুন।

পুরোহিতমশাই বলতে লাগলেন, ঐযে সাদা মেঘে ছাওয়া আকাশের মত দেখেন, আসলে তা মেঘ নয়, ধুঁয়া। অগ্নির তেজে ঐ ধুঁয়া সৃষ্টি হয়েছে। ঐ ধুঁয়াই হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর সমাহার। এই বাষ্প থেকেই হয়েছে জল—স্বাধিষ্ঠান চক্রে। আজ্ঞে কালীঘাটে আপনি যে চক্র দেখেছিলেন তা দেখেছিলেন স্বাধিষ্ঠানের। আর সেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সাধকের কল্যাণে আপনার অভিজ্ঞতা হয়েছিল মূলাধারের। আসলে ঘনবস্তুর ঠিক উপরের সূক্ষ্ম অবস্থার রঙ লাল। দেখতে অনেকটা মিহি লাভাস্রোতের মত। তার উপরের সূক্ষ্ম অবস্থা হল সবুজাকৃতি, অর্থাৎ মাটির পরে যে জল, তারই অবস্থা। আজ্ঞে বাবা আপনি জানেন তো যে, তত্ত্ব আছে এই রকম—ক্ষিতি, অব্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এই পঞ্চ তত্ত্ব। স্থূলের আগে ছিল জল, তার আগে তেজ বা অগ্নি, তার আগে বায়ু, তার আগে আকাশ। এই প্রত্যেকটিরই আবার পাঁচটি ক'রে সূক্ষ্মাবস্থা

আছে। যেমন একটা দেহের উপর আরো পাঁচটি কোষ আছে তেমনি। মুলাধারে অন্নময় কোষরূপ রয়েছে লাল রঙ। এই লাল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হতে হতে সেই পরমাত্মায় মিশে গেছে। স্বাধিষ্ঠানে সবুজ রঙ। এ রঙের সূক্ষ্মরূপ হল ছায়া ছায়া। ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হতে হতে পরমাত্মায় মিশে গেছে। মণিপুরে আছে সাদা রঙ। এর সূক্ষ্মরূপ পাতলা নীল। ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হতে হতে সেই বর্ণহীন পরমাত্মাতেই মিশেছে। অনুরূপ ভাবে অনাহত চক্রের নীলবর্ণ, সূক্ষ্মকোষে নীলজ্যোতিস্বরূপ হয়েছে, আরো সূক্ষ্মতর পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে পরমাত্মায় গিয়ে মিশেছে। বিশুদ্ধ চক্রের জ্যোতির্ময় নীল সূক্ষ্ম পর্যায়ে আরো সূক্ষ্মজ্যোতির আকার ধারণ ক'রে শেষপর্যন্ত সেই পরমাত্মাতেই বিলীন হয়েছে। আজ্ঞা চক্রে এই সমস্ত রঙই একত্রে মিশেছে। বিস্ফোরণের আকারে এই রঙগুলির স্বতন্ত্র রূপ দেখা যায়। এখানে যে রঙ দেখা যায় তা হল নির্ভেজাল তন্মাত্র। এই সব কিছুই ক্রম ঊর্ধ্বপথে গভীর নীল রঙের মধ্যে হারিয়ে গেছে। সেই গভীর নীল রঙও কাঁচের মত স্বচ্ছ। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লীলা সেখানেই প্রতিফলিত হয়। সত্যের স্বভাব ক্রিয়া ফুটে উঠে এখানেই সক্রিয় মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। একেই বলা হয় ঈশ্বর-পর্যায়। এর উপর বর্ণহীন অনন্তের প্রতি শক্তি ধাবমানা হন।

পুরোহিতমশাই তাঁর চোখ দুটোকে কোথায় সামনের দিকে নিবদ্ধ ক'রে যেন সব দেখে দেখে বলছেন এমন ভাবে বর্ণনা দিয়ে গেলেন। এর সব কিছুই যে আমার কাছে স্পষ্ট হল, তা নয়। তবে কালীঘাটে মূলাধার চক্রের যে বিশেষ জ্ঞান আমার হয়েছিল এবং একজন সাধক যে আমাকে স্বাধিষ্ঠান চক্র এঁকে দেখিয়েছিলেন, সে-সবও ওঁর জানা দেখে আমার বিস্ময়ের সীমানা যেন সত্যিই হারিয়ে গেল।

পুরোহিতমশাই বললেন, কিন্তু এখন তো সব আপনি বুঝবেন না বাবা। তবে একদিন সব এমনিই আপনার কাছে প্রকাশিত হবে। তখন সব বুঝবেন। এখন এই চক্রটি দেখুন। এই চক্রে

দেখুন দশটি দল। দলে দলে ডং, ঢং, ণং, তং, থং, দং, ধং নং, পং, ফং, লেখা।

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন?

তিনি বললেন, দেহের এক একটি অঞ্চলে শক্তির নানা তরঙ্গ আছে। অক্ষরগুলো হল এক একটি শক্তি-তরঙ্গের প্রতীক। এক একটি অক্ষর এক একটি তরঙ্গকে ধরে রেখেছে। সেই তরঙ্গ অনুযায়ী যদি অক্ষরগুলি উচ্চারণ করা যায়, তাহলে যে শক্তি তরঙ্গের তারা প্রতীক, সেই শক্তির ফল প্রদান করে। দেখুন এই পদ্মের কোলে রক্তবর্ণ রুদ্রের ছবি। এর বৃদ্ধ বেশ, তিনটি নয়ন। হাতে অভয় মুদ্রা। ইনি যে শক্তির অধিকারী সেই শক্তি দ্বারা জীবজগতের ইষ্ট সাধন করতে পারেন, অর্থাৎ মণিপুর চক্রের শক্তির অধিকারী হতে পারলে সাধক জগতের কল্যাণ সাধন করতে পারেন। তিনি যেমন ইষ্ট দান করতে পারেন, তেমনই এই সৃষ্টি ধ্বংসও করতে পারেন।

পদ্মের কর্ণিকাতে এই যে শক্তি মূর্তি দেখছেন, এর নাম লাকিনী শক্তি। এঁর রঙ উজ্জ্বল, তেজ ধারণ করেন কিনা, তাই রঙ উজ্জ্বল। চারটি বাহু। তার ফলে এঁর শক্তি চতুর্বিধ। ইনি মাংস প্রিয়া। অর্থাৎ ইনি জঠরাগ্নির দাহিকা শক্তির প্রতীক। তিনিই খাদ্য বস্তুকে দগ্ধ ক'রে দেহে পুষ্টি দান করেন। খাদ্যবস্তুকে দগ্ধ ক'রে ইনি প্রাণশক্তি দান করেন বলে সর্বদা আনন্দে মত্তচিত্তা। তিনিই প্রাণশক্তির উৎস বলে সকলের মঙ্গলকারিণীও। ধ্যানে অবশ্য এই দেবীর ভিন্ন মূর্তিরও কল্পনা আছে। যেমন, তার তিন মুখ, তিন চক্ষু, প্রচণ্ড দন্ত ও ভীষণা রূপ। এঁর দক্ষিণ দুই বাহু ও বাম দুই বাহুতে আছে বজ্র, শক্তি, বরদ ও অভয় মুদ্রা। ইনি এমন শক্তির প্রতীক যে-শক্তি জগৎ পালন ও সংহার করতে সমর্থ। এঁর মুখপদ্মে ভারতী দেবী ও বিবিধ জ্ঞান সমন্বিতা লক্ষ্মী বাস করেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, এই লাকিনী শক্তি কি বৌদ্ধদের কল্পনা? তিব্বতে নাকি এর অস্তিত্ব আছে? বৌদ্ধদের মতে ইনি নাকি জীর্ণা-শীর্ণা ক্ষুধাতুরা যোগিনী?

পুরোহিতমশাই বললেন, আসলে ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী ইত্যাদি হলেন যোগীদের নিজস্ব শক্তি। সাধনার যে পর্যায়ে তাঁরা থাকেন, সেই পর্যায়ের তরঙ্গ হিসেবে এই শক্তি অর্জন করেন। দেহ-বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শক্তি ধাতুর আকারে আছে। এক এক অঞ্চলে এক এক ধাতুর প্রাধান্য। সাধনবলে যোগী যে ধাতু-অঞ্চলে বিরাজ করেন, তিনি সেই ধাতু-অঞ্চলের শক্তি অর্জন করেন। তবে এক একটি অঞ্চলে যে বিশেষ একটি দেবীমূর্তিই সেই অঞ্চলের শক্তির প্রতীক, তা নয়। যত তরঙ্গ তত তরঙ্গের এক একটির প্রতিনিধি শক্তি মূর্তিও আছে। এই জন্য সাধকেরা ধ্যানে যে অঞ্চলে প্রবেশ করেন সেই অঞ্চলে অপরিচিত নানা মূর্তি দেখতে পান। আসলে কি বাবা, প্রত্যেকটি বস্তু এবং প্রত্যেকটি মূর্তিই এক একটি শক্তিতরঙ্গের প্রতীক। এই যে বাবা আপনার দেহ দেখতে একরকম, আমার দেহ দেখতে আর এক রকম, এর কারণও হল তাই। আমাদের এক একজনের মধ্যে এক একটি শক্তি-তরঙ্গ রয়েছে বলেই আমাদের এক একজনের আকৃতি এক এক রকম।

যোগীপুরুষরা মণিপুর চক্র ও অনাহত চক্রে এই জন্য নানা শক্তি মূর্তির কল্পনা করেছেন, যেমন, অষ্টবাসিনী ও দ্বাদশ যোগিনী। অষ্ট-বাসিনী হলেন এই রকম ঃ (১) বাসিনী, (২) কামেশ্বরী, (৩) মোদিনী, (৪) বিমলা, (৫) অরুণা, (৬) জয়িনী, (৭) সর্বেশ্বরী ও (৮) ৺কালী, বা কৌলিনী। আটটি বিভিন্ন অক্ষরমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই এক একজন বাসিনী। যেমন,

(১) অ—অঃ, এই ষোলটি অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী হলেন বাসিনী
(২) ক—ঙ, এই পাঁচটি অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী হলেন কামেশ্বরী
(৩) চ—ঞ, এই পাঁচটি অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী হলেন মোদিনী
(৪) ট—ণ, এই পাঁচটি অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী হলেন বিমলা
(৫) ত—ন, এই পাঁচটি অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী হলেন অরুণা
(৬) প—ম, এই পাঁচটি অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী হলেন জয়িনী

(৭) য—ব, এই চারটি অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী হলেন সর্বেশ্বরী

(৮) শ—ক্ষ, এই পাঁচটি অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী হলেন ৺কালী

দ্বাদশ যোগিনী হলেন এঁরা। যেমন, (১) বিদ্যাযোগিনী, (২) রোচিকা (৩) মোচিকা (৪) অমৃতা (৫) দীপিকা (৬) জ্ঞানা (৭) অন্যায়নী (৮) ব্যপিনী (৯) মেধা (১০) ব্যোমরূপা (১১) সিদ্ধিরূপা ও (১২) লক্ষ্মী যোগিনী।

বললুম, এত সব বুঝতে পারছি না।

হেসে পুরোহিতমশাই বললেন, দরকার নেই। শুধু বাবা এইটুকু জানবেন যে, এক একটি অক্ষর এক একটি শক্তিতরঙ্গের প্রতীক। আসলে এ দ্বারা কি বোঝাতে চাইছে, জানেন ?

—কি ?

—নিম্ন থেকে উর্ধ্বে দেহের এই যে সব পদ্ম, বা চক্র, জীবের ক্রিয়া এই সব চক্রের যে স্তরে বেশী ক্রিয়াশীল তার মানসিক বৃত্তি ও চালচলনও তেমনি। যেমন, সর্বনিম্ন চক্র হল মুলাধার। এই মুলাধার চক্রে যার চৈতন্য আবদ্ধ তাঁর মধ্যে স্থূল বৃত্তিই প্রবল। বস্তুকে কেন্দ্র ক'রেই তার সব কিছু। বস্তুর উর্ধ্বে তিনি ভাবতে পারেন না। ইংরেজীতে যাকে আপনারা বলেন Materialist. মুলাধার চক্রের তত্ত্ব হল ঘনীভূত পদার্থ। তত্ত্ব মানে বুঝলেন তো বাবা? ইংরেজীতে আপনারা যাকে বলেন, Element. এখানে পদার্থের তত্ত্বই ক্রিয়াশীল। যেমন, পৃথিবীর তন্মাত্র বা গুণ হল গন্ধ। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাই এখানে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই প্রবল। কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে পাদ এখানে বেশি সক্রিয়, কারণ পা পৃথিবীতে রেখেই আমরা চলাফেরা করি।

মুলাধারের উপরে রয়েছে স্বাধিষ্ঠান। তার ভৌত উপাদান হল আরও সুক্ষ্ম। মুলাধারের মাটি ঘন বস্তু, স্বাধিষ্ঠানের উপাদান হল জল। এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু দেখা যায় না। আধারে রাখলে তবেই দেখা যায়। সুতরাং জলকে বোঝার একমাত্র উপায় আস্বাদন বা অবগাহন। এই জন্য এর তন্মাত্র বা গুণ হল রস। জলে যে জ্ঞানেন্দ্রিয় কাজ করে তা রস, অর্থাৎ আস্বাদন। যে কর্মেন্দ্রিয়

কাজ করে তা পাণি, অর্থাৎ জলপান করতে হলে পাণি দ্বারা তুলে পান করতে হয়।

মণিপুর চক্রে যে ভৌত উপাদানের প্রাধান্য তা হল তেজ অর্থাৎ অগ্নি। এ চক্রের তত্ত্ব তাই তেজ। এর তন্মাত্র বা গুণ হল রূপ। যে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে জানা যায় তার নাম দর্শন। এই তেজ বা অগ্নির জন্য যে কর্মেন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে ওঠে তা হল পায়ু বা মলদ্বার। এর কারণ এই যে, দেহের জন্য যে খাদ্য তা জঠরে পচে অপ্রয়োজনীয় অংশ মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়। এতেই দেহ সুস্থ ও সতেজ থাকে। এই জন্য মণিপুর চক্রের সঙ্গে যুক্ত হল দর্শন ও পায়ু। বাবা, এখানে এসেই আপনার নানা দর্শন হচ্ছে। আর যোগক্রিয়ায় অশ্বিনী মুদ্রা হচ্ছে। অর্থাৎ মলদ্বার সঙ্কুচিত করছেন, তাই না?

অবাক হয়ে বললুম, হ্যাঁ।

পুরোহিত বললেন, মণিপুর চক্রের উপর আছে অনাহত চক্র। মাঝে মাঝে আপনি ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে যার ইঙ্গিত পাচ্ছেন। অনাহত চক্র হল দেহবিশ্বের বায়ুস্তর। এ চক্রের তত্ত্ব বা উপাদান হল বায়ু। বায়ুর গুণ একমাত্র স্পর্শেই অনুভবযোগ্য। এ জন্য এর তন্মাত্র বা গুণ হল স্পর্শ। সুতরাং এখানে যে জ্ঞানেন্দ্রিয় সক্রিয় তার নাম স্পর্শন। যে কর্মেন্দ্রিয় এখানে সক্রিয় নাম উপস্থ বা লিঙ্গ। কারণ কি জানেন বাবা, সৃষ্টির কারণে এই জননেন্দ্রিয় দিয়েই জীবাত্মা প্রাণবায়ু হিসেবে আধারের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করেন। এই জন্যই শ্রুতিতে বলা হয়েছেঃ আত্মাবৈ জায়তে পুত্র। অর্থাৎ আত্মাই পুত্রের মধ্যে জন্ম লাভ করে। এই জন্যই পুত্রকে বা কন্যাকে বলা হয় আত্মজ ও আত্মজা?

এই অনাহত চক্রের উপরে আছে বিশুদ্ধ চক্র। মানুষের দেহ বিশ্বে এ হল ব্যোমের অঞ্চল। এই জন্য বিশুদ্ধ চক্রের তত্ত্ব হল আকাশ। আকাশের গুণ হল শব্দ। যে কারণে এর তন্মাত্র হল শব্দ। যে জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দকে ধারণ করে, তার নাম শ্রবণ। যে কর্মেন্দ্রিয় এতে চঞ্চল হয়ে ওঠে তার নাম মুখ। মুখের সঙ্গে শব্দের

এই সম্পর্কের কারণ, মুখ দিয়েই শব্দ উচ্চারিত হয়। আকাশের মধ্যে এই গুণ রয়েছে। মাঝে মাঝেই তাই আপনি আকাশের স্পর্শ লাভ করেন বলে প্রাণায়ামে ওঁ ধ্বনি শুনতে পান।

সত্যি, আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পুরোহিতের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলুম। পুরোহিত বললেন, তবে সাধকদের সাধনকালে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতাও হয়, এই জন্য নানা জনের নানা বর্ণনা, যেমন অনেকে মনে করেন যে, আকাশের সঙ্গে যুক্ত কর্ণ, বায়ুর সঙ্গে চর্ম, অগ্নির সঙ্গে চক্ষু, রসনার সঙ্গে অপ এবং নাসিকার সঙ্গে পৃথ্বী। তবে সে-সব তর্ক থাক। এবার আজ্ঞা চক্রের কথা বলি।

দুই ভুরুর মাঝখানে আজ্ঞাচক্রের বর্ণ হল শুভ্র বা শুক্ল, দল দুটি। দলের মধ্যে লেখা আছে হং এবং ক্ষং। পদ্মের দুই দলের বর্ণ কর্বুরের মত। এই দুই অক্ষর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশটি অক্ষরের ব্যবহার শেষ। ছয়টি যে চক্র আছে বা পদ্ম আছে তার মোট দলের সংখ্যা পঞ্চাশ। এই পঞ্চাশটি দলেই আছে ভিন্ন ভিন্ন এক একটা অক্ষর। আজ্ঞাচক্রের কর্ণিকাতে আছে হাকিনী শক্তি, শুক্লবর্ণা, ষড়বদনা ও ত্রিনেত্রা। তিন নেত্রই রক্তবর্ণ চারহাতে ধরে আছেন জ্ঞান-মুদ্রা ও পুস্তক-মুদ্রা ও মানুষের ললাট-অস্থি কপাল, ডমরু ও জপমালা। কারো মতে এঁর হাত হল ছয়টি অর্থাৎ হাকিনী হলেন ষড়ভুজা। তাঁর হাতে রয়েছে বর, অভয়, জপমালা, কপাল, ডমরু ও পুস্তক। হাকিনীর ঊর্ধ্বে উল্টোবসানো ত্রিকোণের মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ আকারের শুক্লবর্ণ 'ইতর' শিবলিঙ্গ। তার উপর প্রদীপের মত উজ্জ্বল জ্যোতিঃসম্পন্ন প্রণবাকৃতি অন্তরাত্মা। এর চতুর্দিকে শূন্যস্থানে জ্যোতিঃ স্ফুলিঙ্গ। অন্তরাত্মার স্বকীয় তেজে মূলাধার চক্র থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত সকল স্থান-উদ্ভাসিত। এর ঊর্ধ্বে রয়েছে সূক্ষ্মরূপা মন। মনের ঊর্ধ্বে, চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে হংসের ক্রোড়ে শক্তির সঙ্গে রয়েছেন পরম শিব।

শুধুমাত্র তিনটি চক্রের মধ্যেই লিঙ্গ আছে, যেমন, মূলাধার, অনাহত ও আজ্ঞাচক্র। অন্য কোন চক্রে নেই। কারণ, এই

তিনচক্রেই রয়েছে গ্রন্থি, যার মধ্যে মায়াশক্তি অত্যন্ত প্রবল। এই গ্রন্থিগুলি হল বিভিন্ন তত্ত্বের নিজস্ব ভূমিতে মিলিত হবার শীর্ষস্থান। প্রত্যেকটি অঞ্চল এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামে পরিচিত। মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় অগ্নিখণ্ড। এর উপরে আছে ব্রহ্মগ্রন্থি। মণিপুর ও অনাহত চক্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় সূর্যখণ্ড। এর উপরে আছে বিষ্ণুগ্রন্থি। বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় চন্দ্রখণ্ড। এর উপরে আছে রুদ্রগ্রন্থি। এই তিনগ্রন্থি মোচন ক'রে তবেই যাওয়া যায় ব্রহ্মস্বরূপের কাছে।

আজ্ঞাচক্রেই আছে সূক্ষ্মতত্ত্ব মহৎ এবং প্রকৃতি। মহৎ-এর অর্থ অন্তঃকরণ, যার সঙ্গে রয়েছে বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এবং অন্তঃকরণ দ্বারা উৎপাদিত মন (সংকল্প বিকল্প)। এই মনের স্বরূপই ব্যাখ্যা করা হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বে। সাধারণতঃ মনকেই বলা হয় আজ্ঞাচক্রের তত্ত্ব। অবশ্য এ মন সূক্ষ্ম মন, স্থূলমন নয়। স্থূল মন একধরনের সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে গঠিত। বায়ু দ্বারা তা পরিচালিত। সুতরাং অনাহত চক্রে তার বাস। সূক্ষ্ম মনের বাস আজ্ঞাচক্রে। যেহেতু মনের যথার্থ অধিষ্ঠান আজ্ঞা চক্রে, সেইজন্য মনের সমস্ত গুণই এখানে রয়েছে। প্রকৃতি, যে-প্রকৃতি থেকে সব কিছুর উৎপত্তি তাঁর অধিষ্ঠানও এখানেই, এবং এরই মধ্যে রয়েছে 'ওঁ' বীজরূপে আত্মা। এখানে আত্মা জ্বলজ্বল করছেন আগুনের শিখার মত। আজ্ঞাচক্রে যে আলো জ্বলে সেই আলোই মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত সমস্ত দেহকে প্রদীপ্ত ক'রে রাখে। এই আজ্ঞাচক্রের ধ্যান ক'রে যোগীরা সিদ্ধি এবং অদ্বৈত অস্তিত্বের সন্ধান পান। তিনি অদ্বৈতাচারবাদী হন। যোনীমুদ্রা ক'রে এই পদ্মেই মনের দুয়ার বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে মনকে অন্তঃকরণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়। তখন বাহ্য জগৎ মিলিয়ে গিয়ে নিবিষ্ট হয় এক পরম অস্তিত্বে।

এই আজ্ঞাচক্রে মনের ক্রিয়া হল অন্তরস্থ। যখন দেহ ত্যাগের ইচ্ছা হয়, সাধক তখন এখানেই মনকে স্থাপন করেন। তারপর

পুরান-পুরুষ আদিদেবের মধ্যে প্রবেশ করেন অর্থাৎ সেই পরম উজ্জ্বল পরাবিন্দুতে মিশে যান।

এই শেষ কেন্দ্র বা কারণ-প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয় স্বতন্ত্রভাবে সূক্ষ্মদেহ যার নাম তৈজস। সমবেতভাবে তাই সৃষ্টি করে হিরণ্যগর্ভ (ঈশ্বররূপ)। মহামানসের অন্তঃকরণে যখন পরমাত্মার প্রকাশ ঘটে তখনই তা হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর। প্রাণের মধ্যে এলে সূত্রাত্মা। যখন অবিভক্তরূপে এর প্রকাশ তখন অন্তর্যামিন। দেহের মধ্যে চক্র হল অদ্বৈতের রূপ প্রকাশের বিভিন্ন স্তর মাত্র। সূক্ষ্ম থেকে স্থূল প্রকাশ। কারণ শরীর থেকে এ সব কিছুর উৎপত্তি। স্থূল জগৎ জাগ্রত। সূক্ষ্মজগৎ স্বপ্নময় নিদ্রার জগৎ। আর কারণ-জগৎ অর্থাৎ মূল অর্থাৎ পরাবিন্দু হল স্বপ্নবিহীন গভীর নিদ্রার জগৎ।

তবে ভিন্নমতে আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে আরও চক্র আছে। কিন্তু বাবা, সে সব আপনার এখন জানার প্রয়োজন নেই। আসলে জানেন বাবা, তাঁর জগৎ রূপে প্রকাশ একটা ক্রমবিকাশ। এই বিকাশের মধ্যে কোন ফাঁক নেই। তবে এই বিকাশ হয় এমনভাবে যে-তার কতকগুলো স্থান বিশেষভাবে স্পষ্ট মনে হয়, যেন একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির ধাপ আছে, সেই ধাপ বেয়ে উপরে উঠতে হয়। তার মানে এই নয় যে, দুই ধাপের মধ্যবর্তী অংশটুকু পার হতে হল না। পা সেখান দিয়েও গেল। এই ধাপগুলোর মধ্যে নানা তত্ত্ব থাকে। এই ধাপগুলোই আসলে তত্ত্ব। তবে যতগুলো ধাপের কথা বলা হয়েছে তার বাইরে যে নেই, তা নয়। অসংখ্য ধাপ আছে। যে সাধক যেমন সাধনা করেন তেমনই তাঁর অভিজ্ঞতা।

সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আণবিক বিস্ফোরণে ইলেকট্রন কণিকাগুলি এমনি ক'রেই এক একটি ধাপে থেকে ঘুরে। সর্বত্র বিশৃঙ্খল হয়ে ঘুরে বেড়ায় না। পুরোহিতমশাই হয়তো জানেন না যে, তিনি সেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথাই বলছেন। আত্মদর্শন হলে বুঝি সমস্ত বিজ্ঞান এমনি ক'রেই করায়ত্ত হয়।

পুরোহিতমশাই তখনও বলে চলেছেন, জানেন বাবা, আপনার এখন এ-সব খোঁজের দরকার নেই। যে চক্রে আছেন সে চক্রের কথা জানলেই ভাল। আমাদের শাস্ত্রে মণিপুর চক্র সম্পর্কে কি বলেছে তাই শুনুন।

প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা, এইসব চক্রের সঙ্গে মন্ত্রের সম্পর্ক আছে? তিনি বললেন, আছে তো নিশ্চয়ই বাবা। সৃষ্টির পাশাপাশি শব্দেরও সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির যে পর্যায়ের যে তরঙ্গ সেই তরঙ্গের অনুরূপ অক্ষর। সেই অক্ষরকে যথাযথ উচ্চারণ করলে তা সেই তরঙ্গে গিয়ে আঘাত করে। লোকে সেই তরঙ্গশক্তির ক্ষমতার অধিকারী হয়।

জিজ্ঞাসা করলুম আপনাদের ৺কালী পুজোতে যে কতকগুলি বিশেষ ধরনের মন্ত্র আছে। তাও কি এই তরঙ্গের ভিত্তিতে?

পুরোহিতমশাই বললেন, তাতো ঠিকই বাবা। তবে কালী পুজোর মন্ত্র হল বীজমন্ত্র, একাক্ষরা শব্দে বহু অর্থ আছে।

বললুম, আমিও ঠিক তাই জানতে চাইছি। অনেকে মনে করেন যে, ৺কালী পুজোর মন্ত্রগুলো-সংস্কৃতজাত নয়। যেমন, হ্রীং, ক্লীং, হৈং ক্রীং ইত্যাদি।

পুরোহিতমশাই হেসে বললেন, সংস্কৃত থেকেই এদের জন্ম, তবে এরা বীজমন্ত্র। এক অক্ষরে বিস্তৃত অর্থ, যেমন, কামনা (ক) প্রাণাগ্নি শক্তির (র) সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে অগ্রগতি (ঈ) করেছে, তাই সৃষ্টি করেছে ক্রীং। কামনা (ক) স্থূলত্বে (ল) পরিণত হয়ে যে অগ্রগতি (ঈ) করেছে তাই সৃষ্টি করেছে ক্লীং। এই রকম আর কি।

মনে মনে চমকিত হলুম। এ যেন আধুনিক কবিতার কম্প্রেশন ব্যবহার। বহু ভাবকে এক শব্দের মধ্যে জুড়ে দেবার চেষ্টা। এতে নাকি শিল্পসুষমা খোলে। হয়তো বীজমন্ত্রে তেমনই অধ্যাত্ম স্পন্দন আরও বেশী হয়। আর একটি প্রশ্ন করলুম পুরোহিতমশাইকে ঃ —আচ্ছা, ৺কালী পুজোতে একটি নাকি মন্ত্র আছে 'বিপরীত 'রতাতুরম' বলে?

হেসে পুরোহিতমশাই বললেন ঃ হ্যাঁ বাবা। সেটাই তো যথার্থ বর্ণনা।

—আমাকে একটু দয়া ক'রে ব্যাপারটা বোঝাবেন?

—বোঝাচ্ছি বাবা। তিনি বোঝাতে লাগলেন ঃ আচ্ছা বাবা, যদি একটি অণুতে বিস্ফোরণ হয় তাহলে কি হয়?

—বললুম, কেন্দ্রের চারদিকে শক্তি ঘুরতে থাকে।

—শক্তি যার চারদিকে ঘুরে সেই কেন্দ্রে কি থাকে?

—কিছুই না।

—এই কেন্দ্রই হলেন নির্গুণ পুরুষ। অব্যক্ত ইচ্ছায়, আমার মতে স্বভাবে তাঁর মধ্যে এই শক্তি জাগরিত হয়। শক্তি হলেন প্রকৃতি, স্ত্রীলিঙ্গ, স্ত্রীশক্তি। এই স্ত্রীশক্তি উপরে থাকেন, ভেতরে পুরুষ, অর্থাৎ নিচে পুরুষ। দুইয়ের অভিঘাতে সৃষ্টি-তরঙ্গ ফোটে। তাহলে এই যে রতিক্রিয়া, তাকি রতিক্রিয়া হল? বিপরীত নয়? জীবের রতিক্রিয়াতে তো পুরুষই উপরে থাকে স্ত্রী নিচে, তাই নয়?

আশ্চর্য! ঘটনাটা তো জানিই। আণবিক বিস্ফোরণের এ চরিত্রও জানি। কিন্তু কখনও তো এমন ক'রে ভাবিনি। সত্যিই তো তাই। এবার যেন মন্ত্রটির অর্থ স্পষ্ট হল। বুঝতে অসুবিধে হল না যে, এ পুরোহিত তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। আমি নিজেকে ধন্য মনে করলুম। সেই এলাপাথরের যোগীপুরুষটির কথা মনে পড়ল, বাইরে ছোটাছুটি ক'রে লাভ নেই। নিজের ভেতরে তাকালেই পথ পাওয়া যায়। প্রয়োজনের মুহূর্তে নির্দেশ দেবার মত মানুষও এসে জোটে। নইলে আমার বন্ধুটিই বা আমাকে আমন্ত্রণ জানাবে কেন। আর আমিই বা এত তাড়াতাড়ি আসব কেন? এই সিদ্ধ সাধক পুরোহিতটির সঙ্গে নীরবে আলোচনা করার সুযোগ পাব বলেই বোধহয় এমন হয়েছে। যেন এক অতীন্দ্রিয় শক্তি এই যোগাযোগ ক'রে দিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা চোখ বুজতেই আমি এমন বৃত্তরূপা জ্যোতি দর্শন করলুম কেন?

পুরোহিত বললেন, বাবা আপনার মধ্যে পূর্ব জন্মের সাধনা ছিল, তাই জেগে উঠেছে।

বললুম, সেই বিন্দুর দিকে তাকাতেই এত বিচিত্র ঘটনা ঘটছে কি ক'রে ?

তিনি বললেন, বিন্দুর প্রতি মন আকৃষ্ট হয়েছে বলে। আসলে যে কোন জিনিসে মন আকৃষ্ট হলেই যোগ হয়। নিবিড় মনোযোগই যোগ। তাতে আপনিই মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়। বাইরে থেকে বোঝা যায় না বটে, তবে সে প্রাণায়ামের শক্তি অত্যন্ত প্রবল। মনোযোগ হলেই প্রাণবায়ু ও অপ বায়ুর মধ্যে টানাপোড়েন চলে। এতে দুই বায়ুর ঘর্ষণে অদ্ভুত এক তাপ সৃষ্টি হয়। বাইরে তা বোঝা যায় না। মূলাধারের সুপ্ত শক্তিতে গিয়ে সেই তাপ আঘাত করে। শক্তি তখন উত্তেজিত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যেমন করে অণুতে তাপ-এর ফলে অণুর বিস্ফোরণ হয় সেইরকম আর কি। শক্তির মধ্যেই রয়েছে চেতনা। সেই চেতনা যখন ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয়, তখন স্থূল জগৎ অতিক্রম ক'রে সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম জগতের সকল অনুভূতি হতে থাকে। বাবা, আপনার মনোযোগ অপরিসীম। বিন্দুতে সেই মনোযোগ হয়েছে বলেই স্বাভাবিক প্রাণায়াম হয়েছে। ফলে আপনার কুণ্ডলিনী শক্তি জেগে উঠেছে। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই আপনার সর্প, যাঁর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সর্পকে ঊর্ধ্বে তোলা খুবই কঠিন কাজ। সবাই পারে না। এই জন্যই দুধচটির সাধক আপনাকে বলেছিলেন যে, অলকনন্দাকে উপরে ঠেলে তুলতে পারবি ?

আশ্চর্য! সবই যেন এই সাধক পুরোহিতটির নখদর্পণে। নইলে দুধচটির সাধকটির কথাই বা জানবেন কি ক'রে। জিজ্ঞাসা করলুম সোকরিগোলির পাহাড়ে যে সাধকটি আমাকে জ্যোতি আকৃতি ঋজু সর্প দেখিয়েছিলেন, তা কি ?

—তা হল কুণ্ডলিনী শক্তির ঊর্ধ্বগতি।

—এটা কি একটা ভাব-এর প্রতীক না সত্য ?

—ধ্যানের জগতে কুণ্ডলিনীকে এরকম নানাভাবে দেখা যায়। আপনিও দেখতে থাকবেন বাবা।

বললুম, আমাকে কি এপথে সাহায্য করছেন দুধচটির সেই সাধকটি ?

পুরোহিত বললেন, বাবা, আপনার কোন এক গুরু নেই। আপনি ধ্যানে যে-সব যোগীপুরুষকে দেখেন তাঁরা সবাই সুক্ষ্মদেহে আপনার গুরু। আপনি জন্ম জন্মান্তরে নানাভাবে সাধনা করেছিলেন। শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি সমস্ত সাধনার ধারাই আপনার অধিগত আছে। কাজেই নানাভাবে আপনার অভিজ্ঞতা। এ-জন্মে কালক্রমে সে-সব অভিজ্ঞতাই ফুটে উঠবে।

বহুবার বহু সাধকই আমাকে এ-সব বলেছেন। কিন্তু আমার কাছে এ-সব কেমন হেঁয়ালী মনে হয়। এবং সত্যি সত্যিই অধ্যাত্ম-জীবনে আমার বিরাট একটি সাফল্য আসবে এরকম মনে হয় না। কি জানি! নিজের কাছেই নিজে বা মানুষ কতটুকু পরিচিত! কিন্তু এ-সব কথা শুনলে আমার অত্যন্ত লজ্জা করে। লিখতে বা বলতে আরও লজ্জা করে। কারণ লোকে একে নিছক পাগলামি বা আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কিছু ভাবেন না, এবং সেরকম ভাবাটাই স্বাভাবিক।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে সাধক পুরোহিতটি বললেন, বাবা, মনের মধ্যে কোন সন্দেহ আনবেন না। একদিন আপনি নিজেই এ-সব বুঝতে পারবেন। জন্ম জন্মান্তরে কত সাধনা করেছিলেন তাও ধরতে পারবেন। নিজের পূর্বজন্মের চিত্র নিজেই দেখবেন। ভবিষ্যতে কি হবেন তাও দেখবেন।

আমি নির্বাক দৃষ্টিতে কিছুকাল সেই সাধক পুরোহিতটিকে তাকিয়ে দেখলুম, তারপর বললুম, আমি তাহলে মণিপুর চক্র অবধি আছি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাঝে মাঝে অনাহত চক্রের বায়ুতত্ত্ব নীল আকারে আপনার কাছে উঁকি দিচ্ছে।

—এই মণিপুর চক্রের গুরুত্ব কি ?

পুরোহিতটি বললেন, তন্ত্রে মণিপুর চক্র অবধি সাধনার নিম্ন পর্যায়। এই স্তর অতিক্রম করতে পারলে তবেই উন্নত অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করা যায়। মণিপুর চক্রে সাধক স্বর্লোক অতিক্রম ক'রে মহর্লোকে প্রবেশ করেন, তম গুণ ছাড়িয়ে রজোগুণের অধিকারী হন। সাধকের অধ্যাত্ম জগৎ তখন সূক্ষ্ম জগতে অর্থাৎ তৃতীয় স্তরে, প্রাণময় কোষে থাকে। অর্থাৎ স্থুলদেহের পরে অন্নময় কোষ, অন্নময় কোষের পরে প্রাণময় কোষ, এই প্রাণময় কোষে থাকে। এইসময় সাধক সাধনকালে সূক্ষ্মশরীর বা রহস্যময় শরীর লাভ করেন। এই অঞ্চলে মনকে বা চেতনাকে নিয়ে আসা গেলে আলো দর্শন হয়। আপনি মেঘের বুকে প্রতিফলিত সেই অধ্যাত্ম আলো অর্থাৎ আলোকিত আকাশ দেখতে পাচ্ছেন।

মণিপুর চক্র ও অনাহত চক্র উভয় চক্রেই রজোগুণ প্রবল। তবে দুইয়ের মধ্যে ভেদ আছে। মণিপুর চক্রের রজোগুণ যে-কোন মুহূর্তেই তমগুণের দিকে ধেয়ে যেতে পারে, কিন্তু অনাহত চক্রের রজোগুণের লক্ষ্য হল সত্ত্বগুণের দিকেই বেশি। বাবা আপনাকে যে করেই হোক অনাহত চক্রের বায়ুমণ্ডলীতে উঠতেই হবে। আপনি তা উঠবেনও।

চুপ ক'রে থাকলুম।

পুরোহিতটি বললেন, বাবা, এবার মণিপুর চক্রের শাস্ত্রীয় বর্ণনাটা শুনুন, সেটাও আপনার জানা দরকার। সাধকেরা ধ্যানে জাত হয়ে এ-সব রচনা করেছেন তো! ধ্যানে যত এগুবেন এ-সব বর্ণনা বা শ্লোকের অর্থও ততটা পরিষ্কার হবে।

—বলুন, আমি সাধক পুরোহিতের মুখের দিকে তাকালুম।

তিনি বলতে লাগলেন। সত্যি অদ্ভুত সংস্কৃত উচ্চারণের ভঙ্গী। বুঝি না বুঝি দেহ যেন আমার কেমন চমকিত হতে লাগল। উনি আবৃত্তি করলেন ঃ

"তস্যোর্দ্ধে নাভিমুলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে
নীলাম্ভোজপ্রকাশৈরুপহিত জঠরে ডাদি ফান্তৈঃ স চন্দ্রৈঃ।

ধ্যায়েদ বৈশ্বানরস্যারুণমিহিরসমং মণ্ডলং তৎ ত্রিকোণং
তদ্বাহ্যে স্বস্তিকাখ্যৈ স্ত্রিভিরভিলসিতং তত্র বহ্নেঃ স্ববীজম্ ॥"

শুনতে খুব ভাল লাগল, কিন্তু সংস্কৃতে আমার জ্ঞান কম থাকার জন্য বললুম, দয়া ক'রে যদি এর অর্থ একটু আমাকে বুঝিয়ে বলেন।

সাধক পুরোহিতটি বলতে লাগলেন ঃ স্বাধিষ্ঠান চক্রের উপরিভাগে নাভিমূলের সমদেশে দশদল মণিপুর নামক চক্র অবস্থিত। এ পদ্মের দলগুলি সজল মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ। এর মধ্যে নীল পদ্মের সমানবর্ণ ডকারাদি ফকার পর্যন্ত বিন্দুযুক্ত দশটি বর্ণ সন্নিবিষ্ট আছে। ঐ পদ্মমধ্যে বালসূর্যসদৃশবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল ধ্যান করতে হয়। এই মণ্ডলের বাইরের দিকে তিনকোণে তিনটি স্বস্তিক চিহ্ন শোভা সম্পাদন করে। বর্ণিত মণ্ডলের মধ্যভাগে বহ্নির বীজ অর্থাৎ নাদবিন্দুযুক্ত রেখা চিন্তা করতে হয়।

বাংলায় প্রথম শ্লোকের অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে পুরোহিতমশাই দ্বিতীয় শ্লোক বলতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আমি খড়িমাটি দিয়ে আঁকা তাঁর চক্রটি আর একবার দেখে নিলুম। পুরোহিতমশাই আবৃত্তি করলেন ঃ

"ধ্যায়ে মেষাধিরূঢ়ং নবতপননিভং বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গং
তৎ ক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তির্নিবসতি সততং শুদ্ধ সিন্দুররাগঃ।
ভস্মালিপ্তাঙ্গভূষাভরলসিতবপুর্ব্বৃদ্ধরূপী ত্রিনেত্রো
লোকানা মিষ্টদাতাহভয়লসিতকরঃ সৃষ্টিসংহারকারী ॥"

এই দ্বিতীয় শ্লোকটি আবৃত্তি ক'রেই পুরোহিতটি আমার প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা না ক'রে এর অর্থ বলে যেতে লাগলেন ঃ মণ্ডলস্থিত বহ্নিবীজ মেষাস্থিত, অভিনব সূর্যসদৃশ রক্তবর্ণ এবং এঁর অঙ্গ উজ্জ্বল ও চতুর্বাহু সমন্বিত। এঁর ক্রোড়দেশে বিশুদ্ধ সিন্দূরের মত রক্তবর্ণ রুদ্রমূর্তি সর্বদা বাস করছেন। ইনি বৃদ্ধরূপধারী ও তিননেত্র যুক্ত। এঁর শরীর ভস্মবিলেপনাভরণের দ্বারা শোভমান। মতান্তরে শুক্লীকৃত। ইনি লোকদিগকে ইষ্ট দান করেন এবং হস্তে অভয়মুদ্রা দ্বারা